ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জুলাই, ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা : দায় এড়ানো যায় না
সুমতি কুলকার্নি
স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ছত্রচ্ছায়ায় আনতে হবে সবাইকে
কে. সীতা প্রভু
প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন : সুরক্ষা কবচ জরুরি
সন্ধ্যা লিমায়ে
কৃষক-কল্যাণ : বাস্তব থেকে স্বপ্ন
নীলাব্জ ঘোষ

ভিন্নভাবে সক্ষম

কৃষক-কল্যাণ

অসংগঠিত শ্রমিক

শিক্ষা

বিমা

পেনসন

সামাজিক সুরক্ষা

ফোকাস
জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সুরক্ষায় জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা
বদ্রী সিং ভান্ডারী
বিশেষ নিবন্ধ
সামাজিক নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও ভারত
চন্দ্রকান্ত লহরিয়া

স্বাস্থ্য

খাদ্য

ভারতের দীর্ঘতম সেতু

গত ২৬ মে ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে ভারতের দীর্ঘতম সেতু, "ধলা-শদিয়া" উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আদতে ব্রহ্মপুত্রের উপনদী লোহিতের উপর ৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই তিন লেনের সেতুপথ ধলাকে জুড়েছে শদিয়ার সঙ্গে। উজান অসম থেকে অরুণাচল প্রদেশের পূর্বাংশে বছরের সব ঋতুতে যাতায়াত করা যাবে এই সেতুপথে। এত দিন এই অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে বিপুল প্রতিবন্ধকতা ছিল, এই সেতু সেই ঘাটতি পূরণ করল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, বিকাশের জন্য পরিকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। আর কেন্দ্রীয় সরকারের নিরন্তর চেষ্টা থাকে মানুষের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার। তার কথায় এই সেতু অসম ও অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে বৃহত্তর অর্থে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকে কেন্দ্র অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে কাজ চলেছে জোর কদমে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলির সঙ্গেও যুক্ত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অপরিমেয় পর্যটন সম্ভাবনারও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, কবি ও গীতিকার ভূপেন হাজারিকার নামে ধলা-শাদিয়া সেতুপথের নামকরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আগে এই এলাকায় ব্রহ্মপুত্র পারাপার করতে ফেরি ভিন্ন আর কোনও উপায়ান্তর ছিল না। তাও কেবল দিনমানেই। বন্যা হলে তো সে উপায়ও থাকত না। ব্রহ্মপুত্রের উপর এর আগের শেষ ব্রিজ হল তেজপুরে কালিয়াভোমরা সেতু।

এই সেতুর সুবাদে অসমে ৩৭নং জাতীয় সড়কের উপর রূপাই থেকে অরুণাচলে ৫২নং জাতীয় সড়কের উপর স্থিত মেকা/রোয়িং-এর দূরত্ব প্রায় ১৬৫ কিলোমিটার কমে গেল। এই দূরত্ব পাড়ি দিতে আগে লাগত ছ'ঘণ্টা। এখন থেকে পাঁচ ঘণ্টা কমে লাগবে মাত্র এক ঘণ্টা। দৈনিক ১০ লক্ষ টাকার পেট্রল-ডিজেলের সাশ্রয় হবে এর ফলে।

অরুণাচলের সীমান্তবর্তী এলাকায় দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত রণকৌশলের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই সেতুপথ। পাশাপাশি, এই অঞ্চলের অপরিমেয় জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনার দিকে নজর পড়েছে দেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাতাদের, ওই রাজ্যে আগামী দিনে যে সব প্রকল্প গড়ে উঠতে চলেছে সেক্ষেত্রেও খুব কাজে আসবে ধলা-শদিয়া সেতু।

নির্মাণ-পরিচালন-হস্তান্তর (BOT) বার্ষিক অনুদান ভিত্তিতে এই সেতুটি নির্মাণে খরচ পড়েছে ২,০৫৬ কোটি টাকা। এটি সড়ক ও রাজমার্গ মন্ত্রকের 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ ত্বরান্বিত সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি', 'SARDP-NE'-র আওতায় অরুণাচল প্রদেশকে দেওয়া প্যাকেজের অঙ্গ। ❑

জুলাই, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা : দায় এড়ানো যায় না — সুমতি কুলকার্নি ৫
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ছত্রচ্ছায়ায় আনতে হবে সবাইকে — কে. সীতা প্রভু ৯
- প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন : সুরক্ষা কবচ জরুরি — সন্ধ্যা লিমায়ে ১২
- কৃষক-কল্যাণ : বাস্তব থেকে স্বপ্ন — নীলাব্জ ঘোষ ১৬
- নারী সমাজের সুরক্ষা : আইনের আলোকে — মণীষা বিশ্বাস, অমিত ভৌমিক, এনামুল কবির পাশা ২২
- মধ্যাহ্নকালীন ভোজন : এক সফল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, কিন্তু..... — কিরণ ভাট্টি ২৯
- নীতি আয়োগের প্রথম প্রয়োগ পরিকল্পনার খসড়া : জোর সামাজিক সুরক্ষায় — অনিন্দ্য ভুক্ত ৩২
- অসংগঠিত শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা, কোন পথে? — রুমা ঘোষ ৩৫
- সামাজিক সুরক্ষা : কর্পোরেট জগতের দায়িত্ব — যতীন্দর সিং ৩৮
- সুন্দরবন : প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা — চন্দ্রিমা সিনহা ৪৩

বিশেষ নিবন্ধ

- সামাজিক নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও ভারত — চন্দ্রকান্ত লহরিয়া ৪৭

ফোকাস

- জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সুরক্ষায় জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা — বদ্রী সিং ভান্ডারী ৫২

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — সংকলক : যোজনা ব্যুরো ৫৭
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫৮
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫৯
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৬২
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

সামাজিক সুরক্ষা : এক দায়বদ্ধতা

আজকের দিনে ভারতের জনসংখ্যার বিন্যাসগত ফায়দার চর্চা হচ্ছে প্রায় সর্বত্রই। কীভাবে এ দেশের ক্রমশ বেড়ে চলা তরুণ বয়সি জনসংখ্যার দৌলতে ভারত আজ হোক বা কাল, বিশ্বের দরবারে সেরা অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে; বিচার বিমর্শ হচ্ছে তা নিয়ে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও। এই একই তরুণ বয়সি জনসংখ্যার জন্য যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ঘাটতির দরুন দেশের অর্থনীতির উপর তারা কেমন করে বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠছে।

ভারতের জনসংখ্যার বিন্যাসগত ফায়দা নিয়ে চর্চা তো চলতেই থাকবে। কিন্তু তার পাশাপাশি আমাদের পরিকল্পনা প্রণেতা, অর্থনীতিবিদ, সমাজ চিন্তকদের কিন্তু আরও একটা বিষয় বিশেষ করে মাথায় রাখতে হবে। মানুষের আয়ু বাড়ছে; কাজেই বাড়ছে বয়স্ক জনসংখ্যার আয়তনও। একটি হিসাবে দেখা গেছে, ২০২৬ সাল নাগাদ দেশের বয়স্ক জনসংখ্যার আয়তন বেড়ে দাঁড়াবে ১৭৩০ লক্ষে। এর মধ্যে এক বড়োসড়ো অংশই দরিদ্র, অভাবী, বঞ্চিত শ্রেণির ও মহিলা। এদের জন্য কোনও না কোনও রকম আর্থিক বা মানসিক সহায়তা নিতান্ত জরুরি। এছাড়াও রয়েছে সমাজের অন্যান্য অসহায় শ্রেণিও। যেমন কিনা মহিলা, প্রতিবন্ধী মানুষজন, প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ, অসংগঠিত শ্রমিক গোষ্ঠী। এদের সবারই জীবনধারণের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনও না কোনও রকম সহায়তার দরকার হয়। সামাজিক সুরক্ষা হল সমাজের এই অসুরক্ষিত অংশের মানুষজনের জন্য সহায়তার এক প্রতিশ্রুতি বিশেষ। কোনও গণতান্ত্রিক সরকারই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চায় না বা তা করতে পারে না। আমরা ভাগ্যবান। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের জন্য সংবিধানের ৪৩ নং ধারায় বিভিন্ন রকমের সামাজিক সুরক্ষার সংস্থান রেখেছেন। আর শাসন ক্ষমতায় যখন যে সরকারই এসেছে সংবিধানের এই ধারার মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে কসুর করেনি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নামাঙ্কিত 'Old Age Pension Scheme' ও 'National Pension Scheme' দেশের বয়স্ক মানুষদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর সমস্ত সরকারি কর্মচারীর জন্যই সুনিশ্চিত পেনশনের বন্দোবস্ত থাকে। সেটাই সরকারি চাকরির অন্যতম মূল আকর্ষণও বটে। বেসরকারি ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কোনও ব্যবস্থাপত্র নেই। চাকরিকালীন তারা যে অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন, মূলত তার উপরই নির্ভর করতে হয় অবসর জীবনে। এর মানেটা দাঁড়ায়, সে সময় যদি সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা মেয়ের বিয়ের খরচখরচা সামলাতে হয়, তবে সে সঞ্চয় স্বাভাবিকভাবেই তলানিতে গিয়ে ঠেকে। কাজেই তখন কায়ক্লেশে দিন কাটাতে হয়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মানুষের আরেকটি খরচও স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে, তা হল চিকিৎসার খরচখরচা। এসব বিষয় মাথায় রেখেই, বৃদ্ধ বয়সে মানুষের কিছু পরিমাণ সুনিশ্চিত আয়ের বন্দোবস্ত করতে সরকার National Pension Scheme, অটল পেনশন যোজনা, স্বাবলম্বন ইত্যাদির মতো প্রকল্প চালু করেছে।

পেশা হিসাবে দেখতে গেলে চাষবাসেও কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকি থাকে। কারণ, শস্যের ফলন আবহাওয়ার মেজাজ মর্জি, সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থাপত্র, কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কাজেই অর্থনৈতিক সুস্থিতির অন্যতম চাবিকাঠি হল কৃষক-কল্যাণ। বিষয়টি উপলব্ধি করে সরকার কৃষকদের কাজে আসবে এমন একগুচ্ছ প্রকল্প চালু করেছে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, কৃষি সিঁচাই যোজনা, কিষান ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি। এই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে চাষিরা শস্যবীজ, সার, গবাদি পশুখাদ্য ইত্যাদি কেনাকাটা করতে পারেন। কিষানের কাঁধে জাতির মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে, আশা করা যায় তা সফলভাবে পালন করতে সহায়ক হবে এই সব প্রকল্পগুলি। সংশ্লিষ্ট আরেকটি ক্ষেত্র হল খাদ্য সুরক্ষা। সোজা কথায় জনসংখ্যার সেই বিপুল অংশের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়াটা সুনিশ্চিত করা, যারা কিনা বাজার দরে চাল-ডাল-গম কিনতে অপারগ। গণবণ্টন ব্যবস্থা শুরুই করা হয়েছিল একথা মাথায় রেখে যে, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্যসামগ্রী যাতে ভরতুকি মূল্যে সহজলভ্য হয়। গণবণ্টন ব্যবস্থাকে এখন "সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর" (DBT)-এর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে প্রকৃতই যারা অভাবী, তাদের হাতেই পৌঁছায় এই ভরতুকি মূল্যের খাদ্যসামগ্রী।

সমাজের অন্যান্য অসুরক্ষিত শ্রেণি; যেমন কিনা মহিলা, প্রতিবন্ধী মানুষজন, প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক গোষ্ঠী; এদের সবার জন্যই সরকারের তরফে বিবিধ উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন, 'সববর্গীয় ভারত উদ্যোগ' (Inclusive India Initiatives)-এর মাধ্যমে দেশ গঠনে ভিন্নভাবে সক্ষম বা প্রতিবন্ধী মানুষজনের জন্য সমান সুযোগ দানের সংস্থান রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য, নয়ী মঞ্জিল, উস্তাদ (USTTAD), নয়ী রোশনি ইত্যাদি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি সরকার শ্রমিক-কল্যাণ ও তাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি সংহিতা (Code) আনার প্রস্তাব রেখেছে। আশা করা হচ্ছে এর ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার ছাতার তলায় আনা সম্ভব হবে। কন্যাশিশুদের স্কুল শিক্ষা তথা উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন হওয়াকে সুনিশ্চিত করতে সরকার চালু করে "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" এবং "সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা" নামের প্রকল্প দু'টি। গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'মাতৃত্ব সুবিধা কর্মসূচি'-কে অনুমোদন দিয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অসুরক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর নজর দিয়ে সরকার একগুচ্ছ স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প এনেছে।

যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ এক অলিখিত অলঙ্ঘনীয় দর্শন যে, সে তার জনসাধারণের সমস্যার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। সমাজের অসুরক্ষিত শ্রেণির মানুষজনের সমস্যার সমাধান করতে সরকার দায়বদ্ধ। কাজেই সুশাসনের এক অন্যতম পূর্বশর্ত হল সামাজিক সুরক্ষা। জন এফ. কেনেডি-র কথার সূত্র ধরে বলা যায়, কোনও স্বাধীন সমাজ যদি বহুসংখ্যক অভাবী মানুষকে সাহায্য করে উঠতে না পারে, তবে সে কখনই মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর স্বার্থরক্ষা করতেও সক্ষম হবে না। কোনও সরকার যদি বিশ্বাস করে যে প্রশাসনকে দরিদ্র মানুষের কাজে লাগানো উচিত, তবে সমাজের অসুরক্ষিত শ্রেণির সামাজিক সুরক্ষার জন্য নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা সঠিকভাবে রূপায়ণে উদ্যোগী হতে হবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা : দায় এড়ানো যায় না

সুমতি কুলকার্নি

বয়স্ক নাগরিকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের আর্থিক সহায়তা ভীষণভাবে জরুরি; কারণ তাদের অন্য কোনও নিরাপত্তার উৎস নেই। যুক্তিযুক্তভাবেই এটা বলা যেতে পারে যে, বয়স্ক নাগরিকদের চল্লিশ থেকে ৫০ শতাংশ আর্থিক দিক থেকে অসহায় (দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা শতাংশ অথবা সম্পূর্ণভাবে আর্থিক নির্ভরশীলতার মাপকাঠিতে এই হিসেব পাওয়া গেছে)। ২৫ শতাংশের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও ভয়াবহ। এরা রয়েছেন আর্থিক অস্বচ্ছলতার নিরিখে একেবারে চরম অবস্থায় এবং কোনও সহায়ও এদের নেই)। প্রবীণরা বিশেষত বিধবারা তুলনায় আরও খারাপ অবস্থায় রয়েছেন।

সাময়িক অথবা দীর্ঘস্থায়ী কারণে কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে যারা উপার্জন করতে অপারগ, তাদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানোই সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। উন্নত দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা জীবনযাপনের মানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ছবিটা আলাদা। কর্মসংস্থানের অভাব, বঞ্চনা ও শোষণ এই সব দেশের সামাজিক কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ব্যাধি। তাই সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির তুলনায়, স্বল্পোন্নত দেশগুলির সমস্যা অনেক বেশি জটিল। এখানে নির্দিষ্ট মানের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর্থিক দিক থেকেও মস্তবড়ো চ্যালেঞ্জ। এমনকি, উন্নত দেশগুলিতেও এখন সর্বসাধারণের জন্য পেনসন প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক ও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হল দীর্ঘদিন ধরে জন্মের হার কম থাকা। মোট জনসংখ্যায় এজন্য বেড়েছে বয়স্ক নাগরিকদের অনুপাত। ফলে বার্ধক্যভাতা বা পেনসনের দাবিদার এখন অনেক বেশি। অন্যদিকে আবার সম্পদ তৈরিতে সক্ষম, বা সোজা কথায় কর্মক্ষমদের অনুপাত বা শতাংশ গেছে কমে। একবিংশ শতকের মাঝামাঝি উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ হবেন ষাটোর্ধ্ব।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক বা প্রবীণদের যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তার ধরনধারণ একেবারেই আলাদা। কারণ দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য, বেকারির সমস্যা এখানে প্রকট। অনেক ব্যাপক অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিসর। সম্প্রতি অবশ্য, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলির সুফল কিছুটা হলেও চোখে পড়ছে। ভারত, চিন এবং এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে মৃত্যুর হার কমায়, বছর চল্লিশের মধ্যে মোট জনসংখ্যায় প্রবীণদের অনুপাত ৭ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে। এই পরিবর্তনের জন্য ফ্রান্স, সুইডেনের মতো ইউরোপীয় দেশগুলির সময় লেগেছে ১০০ থেকে ১২০ বছর।

ভারতে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার ধরনধারণ

বিশ্বের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বাস ভারতে। সারা পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রবীণদের এক-অষ্টমাংশ রয়েছেন এই দেশে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরিবার বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু গড় আয়ু বেড়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙ্গন, বৈধব্যের হার কমা, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের আরও বেশি সংখ্যায় প্রবেশের ফলে দেখভাল করার লোকের অভাব, কাজের খোঁজে তরুণ প্রজন্মের অন্যত্র পাড়ি

[লেখক মুম্বাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশান সায়েন্সেস-এর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত অধ্যয়ন বিভাগের প্রধান। ই-মেল : sumati2610@gmail.com]

দেওয়া এবং সর্বোপরি সন্তানদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব দানা বাঁধায় ছবিটা অনেক পালটে গেছে এখন। দুঃস্থ বয়স্ক নাগরিকদের অবস্থা ভয়াবহ। শরীর ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা কাজকর্ম করে উপার্জনে অক্ষম। সঞ্চয় বলতেও প্রায় কিছুই নেই। বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্ররা আরও প্রান্তিক হয়ে পড়ছেন (যে বিপদ আগে বোঝা যায়নি)। দরিদ্র মহিলার সংখ্যা বাড়ছে। এসব কারণে, প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, উন্নততর দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে অর্থের সংস্থান ভারত মতো বিকাশশীল দেশের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

BKPAI সমীক্ষা

UNFPA বা রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা তহবিল সংগঠনের নতুন দিল্লি শাখা, নতুন দিল্লির Institute of Economic Growth, বেঙ্গালুরুর Institute for Social and Economic Change এবং মুম্বাইয়ের Tata Institute of Social Sciences-এর যৌথ উদ্যোগে 'Building a Knowledge Base on Population Ageing in India (BKPAI)' বা বাংলায় বলা যেতে পারে, ভারতের জনসমষ্টির বয়োবৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যভাণ্ডার গঠন প্রকল্পের আওতায় ২০১১-র মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে 'The Status of the Elderly' বা ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণ নাগরিকদের অবস্থান বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সারা ভারতে জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রবীণদের অনুপাত বেশি এমন সাতটি নির্বাচিত রাজ্য—হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কেরালা ও তামিলনাড়ুর ৮৩২৯-টি পরিবারের ৯৮৫২ জন প্রবীণ নাগরিকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা। এতে যে বিষয়গুলি সামনে এসেছে তার মধ্যে কয়েকটি নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) ভারতে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা।

(খ) সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থানের জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ।

(গ) সরকারের প্রধান ২-টি বার্ধক্যভাতা প্রকল্পের বিষয়ে সচেতনতা এবং তার সুযোগ গ্রহণ।

(ঘ) কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণদের সীমিত উৎসাহ এবং উদ্যোগ।

(ঙ) বয়স্কদের জন্য সর্বজনীন পেনসন প্রকল্পের সম্পাদনযোগ্যতা।

সমস্যার ব্যাপকতা

২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ভারতে ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৪০ লক্ষ। ২০২৬ নাগাদ এই সংখ্যা ১৭ কোটি ৩০ লক্ষের মতো হবে বলে অনুমান। ২০২০ থেকে ২০৫০-এর মধ্যে ভারতে প্রবীণদের সংখ্যা ৩৬০ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। প্রবীণরা কতটা অসহায়, BKPAI সমীক্ষায় তার ছবিটা স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

প্রবীণদের প্রায় ৪৫ শতাংশ এমন পরিবারের যাদের অন্ত্যোদয় কার্ড আছে বা যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন। মাসে হাজার টাকার নিচে ব্যয় সীমিত রাখতে বাধ্য এমন পরিবারগুলিতেই রয়েছেন প্রবীণদের এক-তৃতীয়াংশ। প্রবীণদের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ ব্যক্তিগতভাবে কোনও আয় করেন না। তাদের মধ্যে অর্ধেক, আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। বয়স্ক নাগরিকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের আর্থিক সহায়তা ভীষণভাবে জরুরি; কারণ তাদের অন্য কোনও নিরাপত্তার উৎস নেই। যুক্তিযুক্তভাবেই এটা বলা যেতে পারে যে, বয়স্ক নাগরিকদের চল্লিশ থেকে ৫০ শতাংশ আর্থিক দিক থেকে অসহায় (দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা শতাংশ অথবা সম্পূর্ণভাবে আর্থিক নির্ভরশীলতার মাপকাঠিতে এই হিসেব পাওয়া গেছে)। ২৫ শতাংশের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও ভয়াবহ। এরা রয়েছেন আর্থিক অস্বচ্ছলতার নিরিখে একেবারে চরম অবস্থায় এবং কোনও সহায়ও এদের নেই)। প্রবীণরা বিশেষত বিধবারা তুলনায় আরও খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। দেখা যাচ্ছে,

(ক) আয়হীনদের মধ্যে, পুরুষ ২৬ শতাংশ, মহিলা ৫৯ শতাংশ।

(খ) সম্পদহীনদের মধ্যে পুরুষ ১১ শতাংশ, মহিলা ৩৪ শতাংশ, বিধবা ২৮ শতাংশ, বিপত্নীক ১৪ শতাংশ।

(গ) আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরদের মধ্যে পুরুষ ৩৩ শতাংশ, মহিলা ৬৬ শতাংশ।

কিছুটা আশার কথা এই যে প্রবীণদের ৭০ শতাংশই থাকেন তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সঙ্গে। ৬ শতাংশ একা থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে দরিদ্র প্রবীণদের এক-তৃতীয়াংশ হয় একা থাকেন, অথবা, শুধুমাত্র স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন। সামাজিক নিরাপত্তা এদেরই সবচেয়ে বেশি দরকার। প্রতি ৫ জন প্রবীণ অথবা প্রবীণার মধ্যে ১ জন মনে করেন যে সরকারের পক্ষ থেকে বয়স্কদের কাছে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া উচিত।

সরকারের উদ্যোগ

কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রবীণ নাগরিকদের নানাভাবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় নগদ টাকার মাধ্যমে। যেমন, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প বা Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme—IGNOAPS।

এ ধরনের আর একটি প্রকল্প হল ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বৈধব্যভাতা প্রকল্প বা Indira Gandhi National Widow Pension Scheme—IGNWPS। আবার অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হয় পণ্য বা পরিষেবা। এক্ষেত্রে খাদ্য সুরক্ষা, প্রবীণদের জন্য জাতীয় কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সংস্থান—এই বিষয়গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রকের তরফে প্রবীণদের জন্য নানা ক্ষেত্রে ছাড় বা বিশেষ সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

রাজ্যগুলিরও এমন অনেক প্রকল্প আছে। কেরালায় রয়েছে শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের পেনসন প্রকল্প। তামিলনাড়ুতে সহায়সম্বলহীন, স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলাদের জন্য বিশেষ পেনসন প্রকল্প আছে। আছে মধ্যাহ্নকালীন ভোজনের ব্যবস্থা। পশ্চিমবাংলায় চালু আছে বৃদ্ধাশ্রী, সাঁজবাতি-র মতো প্রকল্প। ওড়িশায় রয়েছে

মধুবাবু পেনসন প্রকল্প। মহারাষ্ট্র সরকার-এর এ ধরনের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে শ্রাবণবল পেনসন প্রকল্প, অসহায় মহিলাদের জন্য সঞ্জয় গান্ধীর নামাঙ্কিত বিশেষ প্রকল্প—Sanjay Gandhi Destitute Women Pension Scheme। পাঞ্জাবে চালু রয়েছে আটা ডাল প্রকল্প। বিভিন্ন রাজ্যের পেনসন প্রকল্পগুলির অনেকগুলিকেই অবশ্য এখন IGNOAPS অথবা IGNWPS-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সহায়সম্বলহীন প্রবীণদের কল্যাণে ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রের উদ্যোগে চালু হয় NOAPS। ২০০৯-এ এর নাম পালটে করা হয় IGNOAPS। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে জন প্রতি প্রদেয় পেনসনের পরিমাণ ৬০ থেকে ৭৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে করা হয় ২০০ টাকা এবং ৮০ বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা হয় ৫০০ টাকা। প্রকল্প বাবদ সমস্ত অর্থ কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হয় রাজ্যগুলিকে। এর আওতায় রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের ৫০ শতাংশ। এখন এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয় ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের)। রাজ্যে সরকারের নীতিনির্দেশিকা অনুযায়ী এই প্রকল্পে প্রাপকদের নির্বাচন করে গ্রাম পঞ্চায়েত। কোনও রাজ্যে সর্বাধিক কতজন এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন এবং সে জন্য কী কী শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি তা স্থির করতে একটি ফরমুলা ব্যবহার করা হয়।

তা হল, সর্বোচ্চ প্রাপক সংখ্যা = রাজ্যে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যার অর্ধেক × রাজ্যের দারিদ্র্য অনুপাত। ২০০৮ নাগাদ এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া প্রবীণ মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬৫ লক্ষ। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ২০১১-র নতুন জাতীয় নীতিতে IGNOAPS-এর আওতায় মাস প্রতি পেনসন ১০০০ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বৈধব্য পেনসন প্রকল্প বা Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) চালু হয় ২০০৯ সালে। এর আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা ৪০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে (বর্তমানে ৪০ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে) বিধবাদের মাসে ২০০ টাকা করে পেনসন দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। ৬০ বছর হয়ে গেলে প্রাপকরা IGNOAPS-এর আওতায় পেনসন পেতে পারেন।

প্রশ্ন হল, এই প্রকল্পগুলির সুবিধা সঠিক প্রাপকদের হাতে কতটা পৌঁছচ্ছে। BKPAI সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এই দু'টি প্রকল্প সম্পর্কে যথাক্রমে ৭৯ এবং ৭২ শতাংশ প্রবীণ অবহিত। কিন্তু IGNOAPS-এর সুবিধা পেয়েছেন মাত্র ১৩ শতাংশ। IGNWPS-এর ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ।

দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা ৮১ শতাংশ প্রবীণ এবং ৭১ শতাংশ প্রবীণা IGNOAPS সম্পর্কে অবহিত। এর সুবিধা পেয়েছেন কিন্তু মাত্র ২২ শতাংশ প্রবীণ এবং ১৫ শতাংশ প্রবীণা।

দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা ৭০ শতাংশ বিধবা IGNWPS প্রকল্পের কথা জানেন। কিন্তু তার আওতায় পেনসন পেয়েছেন ২০ শতাংশ মাত্র।

এক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক ছবি আলাদা আলাদা। তবে সামগ্রিকভাবে, পাঞ্জাব, ওড়িশা এবং হিমাচলপ্রদেশে IGNOAPS-এর আওতায় সুবিধা পেয়েছেন বেশি মানুষ। IGNWPS-এর আওতায় ওড়িশা, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গে এবং হিমাচলপ্রদেশে প্রাপকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

BKPAI-সহ আরও বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় বিভিন্ন রাজ্যে এই সব কল্যাণমূলক প্রকল্পের কম সদ্ব্যবহার হওয়ার যে কারণগুলি উঠে এসেছে, সেগুলিকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

- সুবিধা প্রাপক হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপ্রমাণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিরক্ষর দরিদ্র প্রবীণ-প্রবীণারা সমস্যায় পড়েন। দরকার পরিচয়জ্ঞাপক ও বয়স সংক্রান্ত প্রমাণ্য নথি। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান সংক্রান্ত প্রমাণপত্র। পঞ্চায়েত সদস্যদের সুপারিশ। এসব জোগাড় করতে গিয়ে যে অসুবিধায় পড়তে হয় তার সুযোগ নেয় দালালরা। এছাড়া, ঘুষ, দুর্নীতি এবং জাতপাতের নিরিখে বৈষম্যের শিকার হন অনেকেই।
- BPL তালিকা কতটা সঠিক তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। জালিয়াতি বা ভুয়ো প্রাপকের সমস্যা বেশ প্রকট।
- পেনসন পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা।
- পেনসনের পরিমাণ অত্যন্ত কম।
- যথার্থ প্রাপক খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দরুন রাজ্যগুলিকে দেওয়া অর্থের সঠিক ব্যবহার না হওয়া।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এই পেনসন প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা এবং প্রভাবের বিষয়ে আশাবাদী গবেষকদের অনেকেই। ওড়িশা, তামিলনাড়ুর মতো কয়েকটি রাজ্যে উন্নততর নজরদারির ব্যবস্থা এবং যথার্থ প্রাপকদের হাতে সুবিধা পৌঁছে দিতে চিন্তাপ্রসূত বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে ভারতে ৬০ লক্ষ মানুষ বার্ধক্যভাতা পেয়ে থাকেন। প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ পান বৈধব্যভাতা। দিল্লির NCAER এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা অনুযায়ী সার্বিকভাবে ভারতে ৭ শতাংশ মানুষ বার্ধক্যভাতা পেয়ে থাকেন (সংখ্যার বিচারে ৫০ লক্ষ)।

সর্বজনীন পেনসন প্রকল্পের দাবি

উল্লিখিত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় পেনসন পরিষদ ৫৫ বছরের ওপর সব পুরুষ এবং ৫০ বছরের ওপর সব মহিলার জন্য সর্বজনীন, অপ্রদায়ক (নন-কনট্রিবিউটরি) পেনসন বা বার্ধক্যভাতা প্রকল্প চালু করার দাবি তুলেছে। এতে, প্রতি মাসে ২০০০ টাকা অথবা ন্যূনতম মজুরির ৫০ শতাংশের মধ্যে—যা বেশি, সেই হারে ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। যে সব প্রবীণ-প্রবীণা আয়কর দেন বা অন্য কোনও উৎস থেকে আরও বেশি পেনসন পেয়ে থাকেন তাদের এই সর্বজনীন পেনসন প্রকল্পের বাইরে রাখার কথা প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

এখন সাধারণ হিসেব অনুযায়ী, ৬০ বছরের ওপর সকলকে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে দিতে গেলে, লাগবে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য সরকারের ব্যয়ভার অতটা হবে না। কারণ বর্তমানে চালু বার্ধক্যভাতা প্রকল্পগুলিবাবদ আর টাকা দিতে হবে না।

এখানে একটা বিষয় কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। জনমোহিনী নীতিতে সরকারি কোষাগারে টান পড়ে। ফলে করের হার বাড়তে পারে। বাড়তে পারে মুদ্রাস্ফীতির হারও। এর ফলে নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে বয়স্কদের ওপরেই। কাজেই প্রস্তাবিত সর্বজনীন বার্ধক্যভাতা প্রকল্প থেকে কাদের বাইরে রাখা হবে সে বিষয়টি নিয়ে যুক্তিযুক্ত এবং উপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে আয়করদাতাদের বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রবীণ নাগরিকদের বেশিরভাগই থাকেন গ্রামাঞ্চলে এবং তাদের ভরণপোষণ হয় কৃষিক্ষেত্রের মাধ্যমে—যেখানে আয়কর প্রযোজ্য নয়। কাজেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতা থেকে কাদের বাইরে রাখা যুক্তিযুক্ত তা ঠিক করা বেশ কঠিন কাজ। তাছাড়া, আয়ের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, প্রকৃত দরিদ্রদের কাছে সরাসরি বিনামূল্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য পৌঁছোনোর প্রকল্পগুলির বিকল্প তা হতে পারে না।

বর্তমান সরকারের সাম্প্রতিক কিছু উদ্যোগ

বর্তমান সরকারের অটল পেনসন যোজনা (APY), প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা-র মতো প্রকল্পগুলি, একটু আগেই যে সব প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হল, তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই প্রকল্পগুলি প্রদায়ক (কনট্রিবিউটারি) এবং শুধুমাত্র প্রবীণদের জন্যে নয়। তবে, একথা বলা যেতেই পারে, ভবিষ্যতের প্রবীণ-প্রবীণাদের সামগ্রিক কল্যাণে এই প্রকল্পগুলির ভূমিকা রয়েছে।

অটল পেনসন যোজনা বা (APY) হল বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য। এর আওতায়, গ্রাহকদের মাসে ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পেনসন পাওয়া নিশ্চিত। প্রকল্প বাবদ তহবিলে, গ্রাহকের প্রদেয় অর্থের ৫০ শতাংশ অথবা বছরে ১০০০ টাকার মধ্যে যেটা কম, সেটা দেবে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা চালু হয়েছে ২০১৫-য়। সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতায় এই প্রকল্পে দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা করা হয়। যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং বয়স ১৮ থেকে ৭০-এর মধ্যে, তারাই এতে যোগ দিতে পারেন। বছরে প্রিমিয়াম দিতে হবে ১২ টাকা। এই টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে বা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আংশিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে পাওয়া যাবে ১ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্প ২০১৪-য় হাতে নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার সঙ্গে সংযুক্ত।

জনধন যোজনার আওতায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললে প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ, বিমা, টাকাকড়ি পাঠানো, ওভারড্রাফট প্রভৃতি পরিষেবা মিলবে সহজে। এই যোজনার আওতায় ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনও টাকা জমা দিতে হবে না। অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়াটিও খুব সরল। এই প্রকল্পের গ্রাহকরা ১ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার সুযোগ পান। জীবন বিমার সুযোগও আছে। অ্যাকাউন্ট যার নামে, তার মৃত্যুর পর পরিজনরা পাবেন ৩০ হাজার টাকা। ২০১৭-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই প্রকল্পে ২৭ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এগুলিতে জমা পড়েছে ৬৬৫০০ কোটি টাকারও বেশি। তবে অভিযোগ উঠেছে এই বলে, যে ওভারড্রাফ্ট বা অন্যান্য সুযোগ পাওয়ার জন্য অনেক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। তাছাড়া, এই প্রকল্প রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ওপর অত্যধিক চাপ ফেলেছে, বলেও সমালোচনা হয়েছে।

২০১৫-তে চালু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা। এর আওতায়, গ্রাহকের মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা ২ লক্ষ টাকা পাবেন। ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে যে কেউ এই প্রকল্পের গ্রাহক হতে পারেন। প্রতি বছর ৩১ মে-র আগে প্রিমিয়াম বাবদ বিমা গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে ৩৩০ টাকা।

এই প্রকল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন এখনই সম্ভব নয়। অন্যদের সঙ্গে প্রবীণরাও এই প্রকল্পগুলিতে থেকে উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু প্রধান বিষয়টি হল দরিদ্র, সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভর, অসহায় প্রবীণ-প্রবীণাদের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। যাদের প্রয়োজন নেই তাদের বাদ দিয়ে সঠিক প্রাপক খোঁজা, আবেদন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা, এসব বড়ো চ্যালেঞ্জ। শেষে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার। কোনও প্রকল্প যতই সুপরিকল্পিত হোক না কেন, অর্থের লেনদেন থাকলে দুর্নীতি ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সঠিক নজরদারি না থাকলে মূল্যবান সম্পদের অপচয় অবশ্যম্ভাবী।❑

স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ছত্রচ্ছায়ায় আনতে হবে সবাইকে

কে. সীতা প্রভু

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছারও অভাব রয়েছে। নির্বাচনের ইস্যু হিসেবে 'সকলের জন্য শিক্ষা' যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' কখনই তা পায়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেরও ভোটের ইস্যু হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে তাকালেই এটা বোঝা যাবে। বাজেটে এই ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণই তার প্রমাণ দেয়। গত দশকে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ভালো। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য খরচ করা হয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বড় জোর ১.৫ শতাংশ। এর মানে দাঁড়ায়, যে চিকিৎসার খরচের ৭৫ শতাংশই মানুষকে দিতে হয় নিজের পকেট থেকে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সঙ্কটের সময়েই সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'অভাব থেকে মুক্তি'—১৯৪২ সালে বেভরিজ কমিটির বিখ্যাত প্রতিবেদনে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল এভাবেই। কিন্তু এতটা সার্বিক বা সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী চলা কার্যক্ষেত্রে সব সময়ে সম্ভব নয়। ১৯৫০-এ আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO) সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটির আরও কার্যকরী এবং ক্ষেত্রভিত্তিক ও প্রয়োজনভিত্তিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৮৯-এ, দ্রেঁজ এবং সেন-এর আলোচনায়, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার ধরনধারণ কেমন হওয়া দরকার তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়। প্রভু[১]-র মত অনুযায়ীও, ভারতের ক্ষেত্রে যেটা প্রাসঙ্গিক তা হল আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পাশাপাশি এখানে সামাজিক ক্ষমতায়নও সমানভাবে জরুরি। সামাজিক নিরাপত্তার এই ব্যাপকতর ধারণার অবিচ্ছেদ্য বিষয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা।

সকলের জন্য স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯৭৮-এর Alma Ata ঘোষণায় ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়। এই দিশা অনুযায়ী, ১৯৮১-র ICSSR-ICMR প্রতিবেদন[২]-এর ওপর ভিত্তি করে ভারত সরকার ১৯৮৩-তে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ঘোষণা করে। ২০০২-এ পরবর্তী জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ঘোষিত হয়। ২০০৫-এ সূচনা জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (National Rural Health Mission) বা NRHM-এর। দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করাই NRHM-এর লক্ষ্য। কিন্তু, এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও সকলের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন এখনও অধরা। সাধারণ স্বাস্থ্য সূচকগুলি বলে দিচ্ছে এখানে পরিস্থিতি বাংলাদেশের মতো কম আয়ের দেশের তুলনাতেও খারাপ।[৩] স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন সম্ভব হয়নি।[৪]

ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আয়ের অসাম্যের প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে।[৫] বিত্তশালী মানুষজন উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেলেও, দরিদ্ররা বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম সাহায্যটুকুও পান না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, ২০০৮-এ এ দেশে সংক্রামক নয় এমন ব্যাধিতে মৃত্যুর অনুপাত মোট মৃত্যুর সংখ্যার নিরিখে ৫৩ শতাংশ।[৬] সংখ্যার বিচারে তা ৫২ লক্ষ। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ছবি মোলানো যায় না। রাজ্য, গোষ্ঠী ও লিঙ্গের ভিত্তিতেও বিভেদ অত্যন্ত প্রকট।[৭] রাষ্ট্রসঙ্ঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)-র সংশোধিত মানব বিকাশ সূচকের নিরিখে ২০১৫-এ ভারতের স্বাস্থ্য সূচকের ২৪ শতাংশ অবমূল্যায়ন হয়েছে।[৪]

[লেখক মুম্বাইয়ের Tata Institute of Social Sciences-এর Tata Chair Professor। ই-মেল : seeta.prabhu@tiss.edu]

তা ছাড়া, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছারও অভাব রয়েছে। নির্বাচনের ইস্যু হিসেবে 'সকলের জন্য শিক্ষা' যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' কখনই তা পায়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেরও ভোটের ইস্যু হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে তাকালেই এটা বোঝা যাবে।[৯,১০] কিন্তু সাধারণভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রতি রাজনীতিকদের অবহেলা অনস্বীকার্য। বাজেটে এই ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণই তার প্রমাণ দেয়। গত দশকে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ভালো। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য খরচ করা হয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বড় জোর ১.৫ শতাংশ। এর মানে দাঁড়ায়, যে চিকিৎসার খরচের ৭৫ শতাংশই মানুষকে দিতে হয় নিজের পকেট থেকে। এবং চিকিৎসার খরচ মেটাতে মেটাতে বহু পরিবার চলে যান দারিদ্র্যসীমার নিচে।

ভারতে স্বাস্থ্য বিমা

ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডের মতো দেশে আগে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে অসাম্য অত্যন্ত প্রকট ছিল। কিন্তু এই দেশগুলি গত শতকের ৮০-র দশক থেকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

থাইল্যান্ডের 30 baht প্রকল্প, ইন্দোনেশিয়ায় সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা এবং বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে সংস্কার, ব্রাজিলে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনা—এসবই, প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় সাফল্যের উদাহরণ। তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সকলকে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা কতটা জরুরি।[১১,১২]

ভারতে স্বাস্থ্য বিমার সূচনা রাজ্য সরকারগুলির Employment State Insurance Scheme (ESIS) এবং কেন্দ্রের Central Government Health Scheme (CGHS)-এর হাত ধরে। সরকারি কর্মচারী এবং তাদের একেবারে নিকটাত্মীয়রা এই প্রকল্পগুলির সুবিধা পান। এর মাধ্যমে মেলে উচ্চস্তরের চিকিৎসা এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। কিন্তু এই সুযোগ দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও কম সংখ্যক মানুষের জন্য।[১৩,১৪]

২০০৫-এ চালু হয় শর্তাধীন নগদ হস্তান্তর প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা। গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মহিলাদের সন্তানপ্রসবের ক্ষেত্রে বাড়ির বদলে চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ানোই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এর ফলে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রসূতিদের আসা অনেকটাই বেড়েছে। দরিদ্র মানুষের বসবাস বেশি এমন রাজ্যগুলিতে তা বেড়েছে আরও বেশি হারে। কিন্তু এর ফলে প্রসূতি মৃত্যুর যে হার কমেছে—এমনটা বলা যাবে না।[১৫,১৬]

দুরারোগ্য ব্যাধির আকাশছোঁয়া চিকিৎসা ব্যয়ের ভয়াবহ পরিস্থিতি হেতু অর্থনৈতিক দিক থেকে অস্বচ্ছলদের পাশে দাঁড়াতে এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের কাছে গুণগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ২০০৮ সালে হাতে নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY)। একেবারে প্রথমে এই প্রকল্প ছিল শুধুমাত্র দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের জন্য। পরে, দারিদ্র্যসীমার নিচে নন, অথচ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে থাকা মানুষদেরও এই প্রকল্পে ঠাঁই হয়েছে। বার্ষিক ৩০ টাকার বিনিময়ে এই প্রকল্পে নাম নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রিশন) করলে, পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত (এখন ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) পেতে পারেন। ২০১৬-র মার্চ পর্যন্ত RSBY-এর আওতায় থাকা পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৩ লক্ষ। যদিও, ওই সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারত ৭ কোটি ২৮ লক্ষ পরিবার।[১৭] যারা এই প্রকল্পের আওতায় ওই সময় ছিলেনও, তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ নিয়েছেন মাত্র ১ কোটি ১৮ লক্ষ মানুষ। অর্থাৎ, এই প্রকল্পের সুযোগ খুব বেশি মানুষ নেননি। তাছাড়া, RSBY-এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম যেটি, অর্থাৎ দরিদ্রদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ভারের সমস্যা কমানো, তা কিন্তু আদতে পূরণ হয়নি। গরিবদের পকেট থেকে সরাসরি খরচও কমানো যায়নি।[১৮]

কারণ, ওষুধ, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত ব্যয় এবং আরও কয়েকটি পরিষেবার খরচ RSBY-এর মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এর ওপর যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ তো আছেই। কেরালার মতো যে সব রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভাল, সেখানে RSBY অনেক বেশি কার্যকর।

অন্তত ৮-টি রাজ্যে আলাদা আলাদা স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চালু আছে। কর্ণাটকে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের জন্য আছে বাজপেয়ী আরোগ্যশ্রী প্রকল্প (VAS) এবং যশস্বিনী কৃষক সমবায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প। অন্ধ্রপ্রদেশে রাজীব গান্ধী আরোগ্যত্রী প্রকল্প (RAS), তামিলনাড়ুতে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প, মহারাষ্ট্রে রাজীব গান্ধী জীবনদায়ী আরোগ্য যোজনা, গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী আমৃত্যুম্ যোজনা, ছত্তিশগড়ে সঞ্জীবনী কোষ প্রকল্পও উল্লেখের দাবি রাখে। অন্ধ্রপ্রদেশে RAS-এর আওতায় আছেন ৮৫ শতাংশ মানুষ। কাজেই তা সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার কাছাকাছি বলা যেতে পারে। কিন্তু, প্রধানত উচ্চতর চিকিৎসার জন্যই এই প্রকল্প কাজ করে। তাই এর আওতায় অর্ধেক টাকাই খরচ হয় হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং কিডনির চিকিৎসায়। অন্যদিকে, দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক বড় সমস্যা হল ফুসফুসে সংক্রমণ, ডায়ারিয়া, যক্ষা প্রভৃতি। এজন্য অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বহু মানুষ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন অনেকেই। এই সব সমস্যার মোকাবিলায় দরকার প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা।[১৯] সব মিলিয়ে, ২০১৫-এ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের CGHS, ESIS অথবা RSBY-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার আওতায় থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল ২৮ কোটির বেশি—যা দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনও বিমা প্রকল্পেই প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র মেঘালয়ে রাজ্য সরকারের তরফে কতকটা এ ধরনের পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা

আছে। বাকি, সব সরকারি প্রকল্পের অভিমুখই উচ্চতর চিকিৎসার দিকে।

ভবিষ্যতের দিশা

ভারত সরকারের ২০১৭-এর নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি সার্বিকভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ। আগেকার নীতির থেকে তা অনেকটাই আলাদা। ২-টি কারণে নতুন স্বাস্থ্য নীতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এই নীতিতে স্বাস্থ্যে-র সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে রোগের অনুপস্থিতির বদলে, মানুষের ভালো থাকার মাপকাঠিতে। দ্বিতীয়ত, এখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে নজর ফেরানো হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কথা হল, ২০২৫ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ২.৫ শতাংশ ব্যয় করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রত্যাশা কিন্তু আরও বেশি।

আর্থিক সংস্থানের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর বেশি নির্ভর করতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ পথে এগোলে কাজের কাজ কতটা হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। তথ্য প্রমাণ তাই বলে। সমস্ত বিষয়টিতে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে না এগোলে সরকারের দেওয়া ভরতুকির সুযোগ নিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলি ফুলেফেঁপে উঠতে পারে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও বলছে, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থাকলে তবেই স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পগুলি সঠিক দিশায় কাজ করতে পারে এবং এই কাজ শুধুমাত্র সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'-এর ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে সরকারকেই প্রথমে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাতে হবে। পরে, দক্ষতা ও উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য সংস্কারের পথে এগোনো যেতে পারে।

এক্ষেত্রে অর্থের সংস্থান কীভাবে এবং কতটা হওয়া উচিত সে বিষয়ে দিশা দেখিয়েছেন সুজাতা রাও।[২০] তার হিসেব অনুযায়ী, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে গেলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১ থেকে ১.৫ শতাংশ ব্যয় করতে হবে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে। আরও ১ শতাংশ প্রয়োজন প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবায় সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করতে এবং জনসমষ্ঠির ৬০ শতাংশের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে উচ্চতর চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য। এর অতিরিক্ত, ২ শতাংশ দরকার সাধারণের ব্যবহারযোগ্য শৌচালয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি এবং আবাসনের মতো সহায়ক পরিকাঠামো তৈরি করতে মূলধনী বিনিয়োগের জন্য।

২০৩০-এর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছনোর জন্য গৃহীত কর্মসূচির খসড়ায় সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলা রয়েছে ৩.৮ অনুচ্ছেদে। সারা বিশ্বের এই কার্যক্রমে ভারতের গুরুত্ব অনেকখানি। ২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্যগুলি বাস্তবে কতটা পূরণ করা সম্ভব হবে তা ভারতের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণে, অর্থাৎ সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) প্রভু, কে সীতা (২০০১) *Socio-Economic Survey in the Context of Pervasive Poverty : A Case Study of India,* Geneva International Labour Organisation.

(২) ICSR/ICMR. Health for All : An Alternative Strategy, Pune : Indian Institue of Education 1981.

(৩) ভারত মাঝারি আয়ের দেশের পর্যায়ে উঠেছে, কিন্তু দারিদ্র্য এবং রোগের বোঝা, অর্থনৈতিক সাফল্য এবং সামাজিক সূচকগুলির উন্নতিবিধানের ক্ষেত্রে ফারাক প্রকটভাবে বুঝিয়ে দেয়।

(৪) MoSPIs MDG Report, বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য এবং NFHS 3 বলছে যে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার ১৯৯২-'৯৩ থেকে ২০১৪-'১৫-র মধ্যে অর্ধেক হয়েছে। প্রতি হাজারে ১০৯ থেকে নেমে তা হয়েছে ৫০। কিন্তু এই হারে উন্নতিও ২৭-এর MDG-র পক্ষে যথেষ্ট নয়। একইভাবে, প্রতি লক্ষে MMR ১৯৯০-এর ৪৩৭ থেকে কমে ২০১৫-এ ১৭৪ হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য ছিল ১০৯-এ নামিয়ে আনা। ১৯৯০-এ দেশের অর্ধেকের বেশি শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম ছিল। যে হারে তা কমছে তাতে ২০১৫-এ ৩৩ শতাংশে নামার কথা। লক্ষ্য কিন্তু ২৬ শতাংশে নামানো।

(৫) ভোগ্যপণ্যের জন্য ব্যয়ের বদলে, আয়ের নিরিখেই আয়ের অসাম্য পরিমাপ করলে তা ভারতে হল ০.৫১। এটা কিন্তু লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মতোই, বা একটু বেশি। সম্পদের ক্ষেত্রে অসাম্য আরও বেশি। তার গিনি ভ্যালু ০.৭০।

(৬) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অ-সংক্রমক ব্যাধির বিষয়ে ২০১৪-র দেশভিত্তিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে http://www.who.int/nmh/countries/ind_en.pdf-এ।

(৭) আয় বেশি এমন জনগোষ্ঠীর তুলনায়, তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার যথাক্রমে ১৪ ও ৮ শতাংশ বেশি (NFHS 3)। কেরালার নবজাতকের আনুমানিক আয়ুষ্কাল ৭৪.৯ বছর, যেখানে একই সময়ে বিহারে তা ৬৭.৮ (SRS Abridged life tables 2010-14)। লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য, এমনকি ধনীদের মধ্যেও, অত্যন্ত প্রকট। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে লিঙ্গানুপাত যথাক্রমে ৮৮০ এবং ৯০৬।

(৮) http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI।

(৯) অন্ধ্রপ্রদেশের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আরোগ্যশ্রী প্রকল্পের জন্য ২০০৯ সালে শাসকদলের দিকে আরও ৫ শতাংশ ভোট চলে আসতে পারত।

(১০) রাও, সুজাতা, ২০১৭। *Do we care : India's Health System*। নতুন দিল্লি : Oxford India Press।

(১১) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০০৩, নতুন দিল্লিতে আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞদের বৈঠক নিয়ে *Social Health Insurance* শীর্ষক প্রতিবেদন।

(১২) ভারতের পরিকল্পনা কমিশন, ২০১১, *High Level Expert Group Report on Universal Health Coverage for India,* নতুন দিল্লি।

(১৩) কুমার ও অন্যান্য (২০১১), 'Financing Healthcare for All : Challenges and Opportunities', *The Lancet,* 377(9766) : 668-679।

(১৪) সেলভারাজ, এস. এবং করণ, এ. কে. ২০১২। Why Publicly Financed Health Insurance Schemes are Ineffective in Providing Financial Risk Protection.' *Economic and Political Weekly,* 47(11) : 60-68।

(১৫) লিম এস. এস., ডানদোনা এল., হোইসিংটন জে. এ., জেমস এস. এল., হোগান এম. সি. ও অন্যান্য (২০১০)। ভারতের জননী সুরক্ষা যোজনা 'A Conditional Cash Transfer Programme to Increase Births on Health Facilities : An Impact, Evaluation', The Lancet 375 (9730) : 2009-2023।

(১৬) রণদিভে বি., দিওয়ান ভি. এবং ডি. কস্টা এ. (২০১৩)। India's Conditional Cash Transfer Programme (the JSY) to Promote Institutional Birth : is there an Association between Institutional Birth Proportions and Maternal Mortality', PloS one, 8(6):e67452।

(১৭) http://www.rsby.gov.in/overview.aspx।

(১৮) করণ এ., য়িপ, ডাব্লু. এবং মাহাল, এ., ২০১৭। 'Extending Health Insurance to the Poor in India : An Impact Evaluation of Rashitriya Swasthya Bima Yojana on Out of Pocket Spending for Healthcare', *Social Science and Medicine* 181 : 83-92।

(১৯) রাও, সুজাতা, ২০১৭। *Do We Care : India's Health System,* নতুন দিল্লি : Oxford University Press।

(২০) রাও, সুজাতা, ২০১৭, ওই।

প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন : সুরক্ষা কবচ জরুরি

সন্ধ্যা লিমায়ে

সামাজিক ও বাস্তব নানা বাধা বিপত্তির জন্য ভারতে সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচিগুলি ভিন্নভাবে সক্ষমদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয় না। তাদের জন্য দেশে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাব নেই, কিন্তু ভিন্নভাবে সক্ষমদের সমস্যার সার্বিক মোকাবিলায় সেগুলি যথেষ্ট নয়। এগুলি নিয়ে যথাযথ প্রচার না হওয়ায় ভিন্নভাবে সক্ষমরা জানতেই পারেন না কী কী সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রাপ্য। নেই কোনও এক জানালা পদ্ধতিও।

ভারতে প্রথাগতভাবে পরিবারই হল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার একক। আগে একান্নবর্তী পরিবারে সবাই এক সঙ্গে বাস করতেন, কেউ সমস্যায় পড়লে পরিবারের সদস্যরাই এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াতেন। শিল্পবিপ্লব, আধুনিকীকরণ, নগরায়ন, কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি প্রভৃতি নানা কারণে যৌথ পরিবার প্রথা এক সময়ে ভেঙ্গে পড়ে, ব্যাহত হয় সামাজিক সুরক্ষার এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। ফলে নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে এগিয়ে আসতে হল রাষ্ট্রকে।

নাগরিকদের কল্যাণে সরকার সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সামাজিক সুরক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিশু, প্রবীণ নাগরিক, প্রতিবন্ধী বা ভিন্নভাবে সক্ষমদের মতো অসহায় মানুষজনের সহায়তায় এগিয়ে এসে তাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান দেওয়া। ভারতে সামাজিক সুরক্ষা বলতে বোঝায় সামাজিক বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সামাজিক সহায়তা, নিয়োগকর্তার দায় সংক্রান্ত প্রকল্প, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প প্রভৃতি (Maruthi and Mustiary Begum, 2011)।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৩ নং ধারায় দেশের নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিধানে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। আইনের চোখে যে সকলেই সমান, এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সপ্তম তপশিলের ১৪ নং ধারায়। যাদের কাজ করার সামর্থ্য নেই এবং যারা প্রতিবন্ধী, তাদের ত্রাণ ও সহায়তায় এগিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রকে। ৪১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী নাগরিকদের কাজের অধিকার ও শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে এবং বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে (Shankar, 2006)। এই আইনে (Person with Disabilities Act, 1995 এবং Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) শিশুর জন্মের আগে প্রসূতি এবং জন্মের পরে মা ও নবজাতকের পরিচর্যার মতো সামাজিক সুরক্ষার সংস্থান রয়েছে, বলা হয়েছে বেকার ভাতা প্রদান ও বিমার কথা, সমর্থন জানানো হয়েছে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজন, বিশেষত প্রতিবন্ধী মহিলা ও শিশুদের অধিকারকে। তারা যাতে স্বাধীনভাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার এবং যে কোনও রকম হিংসা থেকে তাদের রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রকে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

দরিদ্র অথবা ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই এমন ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রতিটি রাজ্যেই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধিনিয়ম ও আবেদনকারীর বার্ষিক আয়ের সাপেক্ষে সরকার তাদের মাসিক ভাতা দেয়। এছাড়া যেসব সামাজিক

[লেখক মুম্বাইয়ের Tata Institute of Social Sciences-এর School of Social Work-এর আওতাধীন Center for Disability Studies and Action-এ সহযোগী অধ্যাপক। ই-মেল : limaye.sandhya@gmail.com, slimaye@tiss.edu]

সুরক্ষামূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনসন প্রকল্প, ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পুরস্কার প্রদান কর্মসূচি, ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি, মুখ্যমন্ত্রী নিশক্তিকরণ শিক্ষা যোজনা, ভিন্নভাবে সক্ষমদের সহায়ক সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য, চাকরিতে সংরক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যে সব প্রকল্পে সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেগুলিকে বলে প্রতিরোধমূলক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাকরণ, প্রসূতির যত্ন, প্রসবের পর মা ও শিশুর পরিচর্যা প্রভৃতি এই ধরনের প্রকল্পের নিদর্শন।

উন্নয়নমূলক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও চাকরির সংরক্ষণে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে। ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজন যাতে সামাজিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করা এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য।

(১) **করছাড়** : ভিন্নভাবে সক্ষমদের বৃত্তি কর দিতে হয় না। আয়কর আইনের 80U ধারায় তাদের করছাড়ের সংস্থান রয়েছে। 80DD ধারায় ভিন্নভাবে সক্ষমদের আইনি অভিভাবকরা করছাড়ের সুবিধা পান। করছাড়ের পরিমাণ নির্ভর করে প্রতিবন্ধকতার মাত্রার ওপর।

(২) **শিক্ষা** :

● মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরে বা পেশাগত বা কারিগরি ক্ষেত্রে এক বছরের বেশি সময়ের পাঠক্রমে পাঠরত ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য জাতীয় বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অটিজম, সেরিব্রাল পল্‌সির মতো রোগে আক্রান্ত, বহুবিধ প্রতিবন্ধকতায় ভুগতে থাকা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ছাত্র-ছাত্রীরা নবম শ্রেণি থেকেই বৃত্তি পেতে পারে। এজন্য প্রতিবন্ধকতার হার ৪০ শতাংশের বেশি এবং পারিবারিক মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে।

● স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক সরঞ্জাম ও এডিটিং সফ্‌টওয়্যার-সহ কম্পিউটার কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। সেরিব্রাল পল্‌সিতে আক্রান্ত পড়ুয়াদের জন্য সহায়ক সফ্‌টওয়্যারের ব্যবস্থাও করা হয়।

● সরকারি এবং সরকার পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের তিন শতাংশ আসন সংরক্ষণের সংস্থান রয়েছে।

● **ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সার্বিক শিক্ষা প্রকল্প**—এই প্রকল্পের আওতায় সহজে নাগাল মেলে এমন নির্ঝঞ্ঝাট পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে পরিবহণ, বই, পোশাক-আশাক, কাগজপত্র, শিক্ষা সহায়ক বিশেষ সরঞ্জাম—সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়। দেওয়া হয় বৃত্তি। এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের যাতে অঙ্ক ও ছবি-নির্ভর প্রশ্ন থেকে রেহাই দেওয়া হয়, যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে রিডারের সুবিধা পান, পরীক্ষাকেন্দ্রে তাদের যাতে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়, তৃতীয় ভাষার বোঝা যাতে তাদের ওপর না চাপে, পাঠক্রম যাতে সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিবর্তিত হয়—এমন নানা খুঁটিনাটির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় এই প্রকল্পে।

● **ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য মাধ্যমিক স্তরে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা (IEDSS)**—১৪ বছর বা তার বেশি বয়সী ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় সরকারি, সরকার পোষিত এবং পুরসভার স্কুলগুলিতে তাদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক উত্তীর্ণ ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করে বইপত্র, শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি তাদের হস্টেল, রিডার, যাতায়াতের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, বৃত্তি—সবকিছুর সংস্থান রয়েছে এই প্রকল্পে।

● **রাজীব গান্ধী বৃত্তি প্রকল্প**—ভিন্নভাবে সক্ষমদের এম. ফিল, পি. এইচ. ডি.-র মতো উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করতে এই প্রকল্প। এর আওতায় প্রতি বছর ২০০-টি বৃত্তি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) স্বীকৃতি যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বৃত্তির সুবিধা পাওয়া যায়।

(৩) **কর্মসংস্থান** :

● সরকারি, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য A, B, C ও গ্রুপ D স্তরে ৫ শতাংশ পদ সংরক্ষিত।

● সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ভিন্নভাবে সক্ষমদের দশ বছর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। তাদের আবেদন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও মাশুল দিতে হয় না।

● ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের সামর্থ্য অনুযায়ী সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগে পদ সংরক্ষণ করে রাখে।

● গ্রুপ C ও D পদগুলিতে ভিন্নভাবে সক্ষমদের যাতে বাড়ির কাছাকাছি নিয়োগের চেষ্টা করা হয়, সে বিষয়ে সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। বাড়ির কাছাকাছি বদলির জন্য তাদের আবেদন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনার নির্দেশও রয়েছে।

● সরকার সব রাজ্যের রাজধানীতে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সরকারি সংরক্ষিত পদগুলিতে নিয়োগের জন্য সব জেলা সদরে গড়ে তোলা হয়েছে বিশেষ কর্মসংস্থান সেল। কোনও জায়গায় আলাদা কর্মসংস্থান কেন্দ্র গঠন করা সম্ভব না হলে সেখানে সাধারণ কর্মসংস্থান কেন্দ্রের অধীনেই ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ সেল গড়া হয়েছে। ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কেবল এই সব কেন্দ্র ও সেলে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য যে ১৭-টি বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলিতেও নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

● শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রেও ভিন্নভাবে সক্ষমদের যাতে নিয়োগ করা হয়, সেজন্যও সরকার সচেষ্ট। এজন্য নিয়োগকর্তাদের নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। ন্যূনতম ২৫ হাজার টাকা মাসিক বেতনে কোনও ভিন্নভাবে সক্ষমকে নিয়োগ করা হলে সরকার প্রথম তিন বছর কর্মচারী বিমা প্রকল্প এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার দেয় অর্থ দিয়ে দেয়।

● পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের উদ্যোগে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির সমস্ত রকম ডিলারশিপের সাড়ে সাত শতাংশ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য।

● ভিন্নভাবে সক্ষমদের স্বনির্ভর করে তুলতে জাতীয় প্রতিবন্ধী অর্থ ও উন্নয়ন নিগম ঋণ দেয়। ছোটো ব্যবসা স্থাপন, উচ্চশিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম নির্মাণ, কৃষিকাজ—সব কিছুর জন্যই ঋণ মেলে। প্রকল্পের আওতায় মানসিক ভারসাম্যহীন এবং সেরিব্রাল পল্‌সি ও অটিজমে আক্রান্তদের স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

● **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক**—'অনাথ আশ্রম, মহিলাদের হোম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক' প্রকল্পের আওতায় ভিন্নভাবে সক্ষম এবং তাদের জন্য কাজ করেন এমন সংস্থাকে কম সুদে ঋণ দেওয়া হয়। সুদের হার মাত্র চার শতাংশ। ভিন্নভাবে সক্ষমরা ছোটো ব্যবসা স্থাপনের জন্য ঋণ নিলে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ওপর সুদে ০.৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়।

(৪) **সহায়ক সরঞ্জাম কেনা ও লাগানোর জন্য ভিন্নভাবে সক্ষমদের সহায়তা (ADIP প্রকল্প)** : এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সহায়ক সরঞ্জাম কিনতে ভিন্নভাবে সক্ষমদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া, যাতে তাদের শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের পথ সুগম হয়।

(৫) **ইন্দিরা আবাস যোজনা** : কেন্দ্রীয় সরকারি এই আবাসন প্রকল্পে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা গ্রামীণ মানুষকে বিনামূল্যে বাসস্থান দেওয়া হয়। এক একটি বাড়ি নির্মাণে সমতলে খরচ পড়ে কুড়ি হাজার টাকা, পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকায় বাইশ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের মোট তহবিলের তিন শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সংরক্ষিত।

(৬) **ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নে জাতীয় পুরস্কার প্রকল্প** : কৃতী ভিন্নভাবে সক্ষমদের স্বীকৃতি দিতে এবং তাদের নিদর্শন তুলে ধরে অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে অসাধারণ কর্মী, অসাধারণ নিয়োগকর্তা, শ্রেষ্ঠ

নিযুক্তি সংস্থা/আধিকারিক, অসাধারণ ব্যক্তি, অসাধারণ প্রতিষ্ঠান, রোল মডেল, অসাধারণ সৃজনশীল ব্যক্তি, অসাধারণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং তার ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য বাধাবিঘ্নহীন পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদানের স্বীকৃতিতে পুরস্কার দেওয়া হয় সরকারি, সরকার অধিগৃহীত এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়া ভিন্নভাবে সক্ষমদের পুনর্বাসনে কৃতিত্বের জন্য সেরা জেলা, ন্যাশনাল ট্রাস্টের স্থানীয় স্তরের সেরা কমিটি এবং NHFDC-র রাজ্য স্তরের সেরা সংস্থাকেও সম্মান জানানো হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ভিন্নভাবে সক্ষম গ্রামীণ মহিলাদের পুনর্বাসন এবং মহিলাদের স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে করা কাজকে।

(৭) **ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নে ট্রাস্ট তহবিল** : বিভিন্ন ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুদ ও করের রাউন্ডিং অফ বাবদ বার্ষিক ৭২৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় করেছে। সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সালের ১৬ এপ্রিল এক রায়ে (Civil Appeals No. 4655 and 5218 of 2000) এই অর্থ দিয়ে ভিন্নভাবে সক্ষমদের কল্যাণে একটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশ দেয়। অটিজম, সেরিব্রাল পল্‌সি, মানসিক ভারসাম্যহীন এবং একাধিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য এই অর্থ ন্যাশনাল ট্রাস্টে পাঠাবার আর্জি জানিয়েছে মন্ত্রক। শীর্ষ আদালত এ বিষয়ে এখনও মতামত না জানালেও ইতোমধ্যেই একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ওই ট্রাস্টে অর্থ পাঠিয়ে দিতে বলেছে ব্যাংকগুলিকে।

(৮) **প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প** : আধুনিক প্রযুক্তির যথাযত প্রয়োগ ঘটিয়ে ভিন্নভাবে সক্ষমদের কাছে ব্যয়সাশ্রয়ী উপকরণ ও সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া, তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সমাজের মূলস্রোতে আরও বেশি করে তাদের সামিল করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছিল ১৯৯০-'৯১ সালে। এই প্রকল্পের আওতায় ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য উপকরণ ও সরঞ্জাম নির্মাণের বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রকল্পকে চিহ্নিত করে অর্থ সাহায্য করা হয়।

প্রতিরোধমূলক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সংজ্ঞায়িত দারিদ্র্যের ভাবনার ওপর ভিত্তি করে চালিত। এগুলির মাধ্যমে প্রবীণদের পেনসন, চিকিৎসা বিমা, ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নজর রাখা হয়।

(৯) **ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনসন প্রকল্প** : এটি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ২০০৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি চালু হয়। এর আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন, এমন বহুমুখী প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন, ১৭ থেকে ৭৯ বছর বয়ঃসীমায় থাকা ব্যক্তিদের প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

(১০) **কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়লে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা** : Employee's Compensation Act, 1923 (যা আগে Workmen's Compensation Act,

1923 নামে পরিচিত ছিল) অনুসারে কাজের সময়ে দুর্ঘটনায় কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে, বা তিনি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়লে, নিয়োগকর্তা ওই কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে আইনত বাধ্য। পেশাগত কারণে কোনও কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনিও একই নিয়মের আওতায় আসবেন এবং নিয়োগকর্তাকে সেক্ষেত্রেও অর্থ সাহায্য করতে হবে। কোন ধরনের চোটকে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে চিহ্নিত করা হবে তার সমগ্র তালিকা আইনের প্রথম তপশিলের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে। পেশাগত রোগের তালিকা রয়েছে আইনের তৃতীয় তপশিলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে। তবে এগুলি কেবলমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সমস্যা ও সম্ভাবনা

সামাজিক ও বাস্তব নানা বাধা বিপত্তির জন্য ভারতে সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচিগুলি ভিন্নভাবে সক্ষমদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয় না। তাদের জন্য দেশে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাব নেই, কিন্তু ভিন্নভাবে সক্ষমদের সমস্যার সার্বিক মোকাবিলায় সেগুলি যথেষ্ট নয়। এগুলি নিয়ে যথাযথ প্রচার না হওয়ায় ভিন্নভাবে সক্ষমরা জানতেই পারেন না কী কী সুযোগসুবিধা তাদের প্রাপ্য। নেই কোনও এক জানালা পদ্ধতিও। সুবিধা ও পরিষেবা পৌঁছে দেবার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ছড়ানোছেটানো এবং এলোমেলো। ভিন্নভাবে সক্ষমদের সুযোগসুবিধা সম্পর্কিত সর্বজনীন কোনও নীতি নেই, নেই এমন কোনও সংস্থা, যারা সমগ্র বিষয়টির সমন্বয়সাধন করবে। যেসব সংস্থা বর্তমানে

ভিন্নভাবে সক্ষমদের কল্যাণে কাজ করছে, তাদের সংযুক্ত করে এক ছাতার তলায় একজন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে একটি সুসংহত কর্মসূচি ও রূপায়ণ নীতি গড়ে তোলা দরকার।

ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়নে অর্থের জোগান সুনিশ্চিত করতে দশম পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রকের বাজেটে নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সমীক্ষায় স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কোনও উদ্যোগ নেয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মঞ্জুর হওয়া প্রকল্পগুলির বরাদ্দ করা অর্থের মাত্র ৩১ শতাংশ খরচ হয়েছে। ভিন্নভাবে সক্ষমদের কল্যাণে সরকার কতটা নির্লিপ্ত, এই পরিসংখ্যান তার প্রমাণ (Shankar, 2006)।

ভিন্নভাবে সক্ষমদের সমস্যা বুঝে তাদের কল্যাণে সুসংহত সার্বিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করা দরকার। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা। ভিন্নভাবে সক্ষমদের মোট সংখ্যা, বাবা-মা-সহ ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুর সংখ্যা, ভিন্নভাবে সক্ষমদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার কত, গুরুতর প্রতিবন্ধকতার শিকার কতজনের সর্বক্ষণ সহায়তা প্রয়োজন, ৬০ বছরের বেশি বয়সী ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা, ভিন্নভাবে সক্ষম মহিলা কতজন রয়েছেন, কতজন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন— এই সব তথ্যই জানা দরকার।

সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের সংস্থান, পেশাদারি নিয়ন্ত্রণ ও পরিষেবা বণ্টনের ওপর নজরদারির মতো পদক্ষেপগুলি অবিলম্বে নেওয়া আবশ্যক। এছাড়া জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও রাজ্য স্তরের সংস্থাগুলি থেকে আরও সম্পদ সংগ্রহ এবং সরকার ও অ-সরকারি সংগঠনগুলিকে আরও সক্রিয় করে তুলতে পারলে তবেই ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের কাছে তাদের প্রাপ্য অধিকার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

পণ্য ও পরিষেবা কর

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

কৃষক-কল্যাণ : বাস্তব থেকে স্বপ্ন

নীলাব্জ ঘোষ

কৃষকদের দুর্দশা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট এবং ২০২২-এর মধ্যে তাদের আয় দ্বিগুণ করতে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ভাষণে অঙ্গীকারের সৌজন্যে কৃষকদের আয়ের বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাটির জেরে কৃষকেরা আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। কৃষিজ আয় বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনশীলতা, বিশেষত জমির উৎপাদনশীলতাই কৃষিতে উচ্চ আয়ের মূল চাবিকাঠি। জল কিংবা সারের মতো উপাদানের জোগান অপ্রতুল এবং যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ হওয়ায় সার্বিকভাবে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দিকগুলিতে উন্নতির নজর দেওয়া আবিশ্যক।

যখনই কোনও মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন[১] করা হয়, সরকারি মহলে প্রায়শই তার পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি সাজানো হয়। তবে, ২০১৫ সালে কৃষিমন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক (MoA&FW—Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) করার বিষয়টি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কর্মকাণ্ডের খোলনলচে বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সার্বিকভাবে তার মধ্যে দিয়ে কৃষি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কৃষি মানেই কেবলমাত্র আরও বেশি বেশি পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন নয়। যারা এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে জড়িত; তারাও যেন সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষের মতো স্বচ্ছল সাবলীল জীবনযাপন করতে পারেন, এই উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নতুন করে নামকরণের মাধ্যমে।

ধন্যবাদ জানাতে হয় সবুজ বিপ্লব এবং কৃষি নীতিগুলির মাধ্যমে গৃহীত উদ্যোগকে; এসবের সৌজন্যেই, প্রাথমিক খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের খাদ্য সংকটের দিনগুলোকে পিছনে ফেলে বর্তমানে ভারত গোটা বিশ্বে চাল ও দুধ উৎপাদনে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে, খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। পরবর্তীকালের কৃষি নীতিগুলিতে ডাল, ফলমূল এবং শাকসবজির মতো উপভোক্তাদের পছন্দসই শস্যের ফলন বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়।

তবু কৃষির এই বৃদ্ধির কাহিনীতে প্রাথমিক শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের সিংহভাগ কিন্তু উপেক্ষিত, বঞ্চিতই থেকে যায়। কৃষিকাজের মাধ্যমে উপার্জনের পরিমাণ দিন দিন কমছে; শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার নিদারুণ শিকার হন যারা, তাদের অন্যতম কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ২০০৩-'০৪ সালের এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ৪০ শতাংশই সুযোগ পেলে বিকল্প কোনও জীবিকা বেছে নিতে আগ্রহী (NSSO, 2005)। ওই একই সংস্থার সমীক্ষায় পরবর্তীতে দেখা গেছে যে, জীবনধারণের জন্য ভোগ্যপণ্যের অতি সামান্য চাহিদা মেটাতেও কৃষিজীবী পরিবারগুলিকে কৃষিজ উপার্জনের পাশাপাশি আয়ের অন্যান্য উপায়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে (NSSO, 2014)। উৎপাদনের হার যথেষ্ট উঁচুতে; তা সত্ত্বেও কৃষকরা কেন দারিদ্র্য কবলিত, অসহায়তা এবং নিম্নমানের জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন, প্রবন্ধটিতে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। পাশাপাশি, সাবেক এবং উদ্ভাবনামূলক, এই উভয় পথে হেঁটে কীভাবে পরিস্থিতি বদলানো যেতে পারে তার সুলুকসন্ধান দেওয়া হয়েছে।

১ মন্ত্রকটির নাম ছিল (ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২০১৫) : খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রক (১৯৫১-১৯৬৬), খাদ্য, কৃষি, গোষ্ঠী উন্নয়ন ও সহযোগিতা মন্ত্রক (১৯৬৬-১৯৭১), কৃষিমন্ত্রক (১৯৪৭-'৫১, ১৯৭১-'৭৪, ১৯৮০-'৮৫, ১৯৯১-২০১৬), কৃষি ও সেচ মন্ত্রক (১৯৭৪-'৮০), কৃষি ও গ্রামীণ পুনর্গঠন মন্ত্রক (১৯৮৫), কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক (১৯৮৫-'৯১)।

[লেখক দিল্লিস্থিত প্রতিষ্ঠান, 'Institute of Economic Growth'-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : nila@iegindiaorg]

কৃষকদের আয় এবং অসহায়তা

কৃষকদের দুর্দশা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট এবং ২০২২-এর মধ্যে তাদের আয় দ্বিগুণ করতে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ভাষণে অঙ্গীকারের সৌজন্যে কৃষকদের আয়ের বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাটির জেরে কৃষকেরা আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। কৃষিজ আয় বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনশীলতা, বিশেষত জমির উৎপাদনশীলতাই কৃষিতে উচ্চ আয়ের মূল চাবিকাঠি। জল কিংবা সারের মতো উপাদানের জোগান অপ্রতুল এবং যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ হওয়ায় সার্বিকভাবে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দিকগুলিতে উন্নতির অবকাশে নজর দেওয়া আবশ্যিক। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন বাড়ায়; তাছাড়াও তা উৎপাদন ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয় করে। বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল ও ফসলের অপচয়ের দরুন দামের খানিকটা হেরফের হয় বটে; কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের দাম ও চাষের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর (সার, জল, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি) মূল্যের উপরই কৃষিজ আয় বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

ভারতের কৃষি-জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দরুন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যও যথেষ্ট। ফলত, সারা দেশে শস্যের ফলন হার, পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও বিস্তর ফারাক চোখে পড়ে। কৃষিজোতের আয়তন ছোটো বলেও ব্যয় বাড়ে। জনসংখ্যা বাড়ছে হু হু করে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না তেমন একটা। ফলত, কৃষিজমির ওপর চাপ বাড়িয়ে মাথাপিছু কৃষিজ আয় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কৃষির সঙ্গে জড়িত বিবিধ প্রাকৃতিক, জনসংখ্যাগত এবং প্রশাসনিক দিকগুলির রকমফের হেতু দেশের কোনও কোনও অংশে শস্যচাষ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় লাভজনক। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমশক্তির একাংশকে যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন, শিল্প, পরিষেবা ইত্যাদি) কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যায়, তবে পরিবারগুলির আয়ে বাড়ে, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতেও নতুন নতুন ধ্যানধারণা ও দক্ষতা যুক্ত হওয়ার রাস্তা খুলে যায়। এভাবেই কৃষি সূত্রে মোটা আয়ের অবকাশ তৈরি হয়, যা (বাজারের) চাহিদা বাড়িয়ে অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিকে সহায়তা করে থাকে।

কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত সংকটটি হল আবহাওয়া। অনাবৃষ্টি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বছরের ফলনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না; এর দরুন জলাধার, নদী, খাল, কূপ এবং মৃত্তিকার জলস্তর নেমে গিয়ে পরবর্তী ঋতু বা বছরগুলিতেও শস্যের উৎপাদনের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। পর পর একাধিক বছর সঠিক বৃষ্টিপাতের অভাবে, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে যেমনটা হয়েছিল, কৃষিতে সমস্ত বিনিয়োগ মাঠে মারা গিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকরা ঋণের জালে জড়িয়ে যেতে পারে। সমাজের মূলস্রোতের মানুষজন, যারা কৃষিকাজের সাথে জড়িত নন, বর্ষাকালে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। কিন্তু বছরের মাঝখানে যদি ফের খাপছাড়াভাবে বৃষ্টিপাত হয়, কৃষকদের মাথায় হাত পড়ে। আবার একই বছরে দেশের কোনও অঞ্চলে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত আর কোথাও কোথাও অনাবৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। অতিরিক্ত অথবা অসময়ে বৃষ্টিপাতও উদ্বেগের কারণ। তার ফলে বন্যার দরুন চাষের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ২০১৬ সালে স্বাভাবিক বর্ষা সত্ত্বেও ভারতের ন'টি রাজ্য বন্যা কবলিত হয়। বিহারে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে পাঁচ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হন এবং তিন লক্ষ হেক্টরেরও বেশি ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফসলের দামের ওঠাপড়ার কারণেও কৃষকদের দুর্দশা বাড়ে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফসল ওঠার পর দু'চার মাস জোগান বেশি থাকায় বাজারে দাম কম থাকে, তার পর সেই দাম বাড়ে, এমনকি পরে তা বেশ চড়া দামেই বিকোয়। কিন্তু কৃষকরা ফসল মজুত করে রাখতে পারেন না বলে, মূল্যবৃদ্ধির এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি উপার্জন অধরা থেকে যায় তাদের কাছে। এমনকি পরবর্তী সময়ে তারা বেশি দাম দিয়ে বাজার থেকে খাদ্যপণ্য কিনতে বাধ্য হন। সরকার যদি বিভিন্ন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price) বাড়ায়, তবে কৃষকরা দেশের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন এবং খাদ্যসামগ্রীর দাম লাভজনক ও স্থিতিশীল হবে। তবে তার জন্য খালি MSP বাড়ালেই হবে না, সরকারকে সেই দামে উদ্বৃত্ত ফসল কিনে নেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। জোগান অতিরিক্ত থাকলে স্বাভাবিকভাবেই দাম পড়তির দিকে থাকে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানো সত্ত্বেও ২০১৬-'১৭ সালে বিপুল উৎপাদনের কারণে ডালের দাম ব্যাপক পড়ে যায়। উন্মুক্ত বাজারের দৌলতে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি এবং বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতা দামের অনিশ্চয়তাকে আরও ঘনীভূত করতে পারে।

গ্রামীণ সুবন্দোবস্ত

শুধুমাত্র ফসলের উৎপাদন ও তার মূল্যের নিরিখে কৃষকদের কল্যাণের বিষয়টি বিচার করলে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিষেবা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনযাপন সহজসাধ্য হয়, নতুন সুযোগসুবিধার দরজা খুলে যায় এবং তাদের সামর্থ্যের ও কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটে (Sen, 2005)। এর ফলে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফলের নাগাল পায় তারা। এর মধ্যে অনেকগুলিই নাগরিকদের অধিকার হিসেবে গণ্য হয় এবং রাষ্ট্র তার জন্য দায়বদ্ধ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'urban bias' বা শহরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব (Lipton, 1977) আপাতভাবে এখনও ভারতের বিকাশ কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা।

বহু বছর ধরে গরিব জনসংখ্যার মধ্যে মানবসম্পদের বিকাশের বিষয়টির দিকে তেমনভাবে নজর দেওয়া হয়নি। অধিকাংশ গরিব মানুষের বাস গ্রামে। আর গ্রাম ভারতই সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার হয়েছে এত দিন। এমনকি স্কুলে নাম নথিভুক্ত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার পরও (গ্রামে) শিক্ষার গুণমান খুব একটা বাড়েনি বা কাজকর্ম জোটানোর মতো যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনে ঘাটতি রয়েই গেছে। এর জন্য দায়ি বাজেট সংকোচন, নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং দুর্নীতির মতো নানা ঐতিহাসিক

কারণ। জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাও এই সব কারণে বেশ নড়বড়ে, যার উপর দেশের কৃষকদের এক বড়োসড়ো অংশ নির্ভরশীল। দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেলে পুষ্টিগত এবং পরিবেশগত ক্ষেত্রে উন্নতির অবকাশ আছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুফল পেতে এই দু'টি দিকের উন্নতিতে নজর দিতে হবে। গণবণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System) চালু করার সময় ছিল সর্বজনীন। পরবর্তীকালে মূলত গরিব পরিবারগুলিকে খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করা হয় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে। খাদ্য উৎপাদনে কখনও ঘাটতি রয়ে গেলে ক্ষুদ্র চাষিদের গ্রাসাচ্ছাদনের চাহিদা মেটাতে গণবণ্টন ব্যবস্থা কাজে আসে। কিন্তু ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রভূত সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারের তরফেও অবশ্য সেই সব ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার আন্তরিক চেষ্টা চালনো হয়ে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ।

বিগত কয়েক দশক ধরে দেশে যোগাযোগের ভৌত পরিকাঠামোর (সড়ক, রেল এবং পাতালরেল) উন্নতির জন্য সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও ভারতের ১৬ শতাংশ গ্রাম সব ঋতুতে চলাচলের সড়কপথে যুক্ত নয় (Asher and Novosad, 2017)। বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার জীবনযাপনকে আরও অনায়াস করে তোলে; অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসর বাড়ে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, জল সরবরাহ এবং বর্জ্য নিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। জনগণনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, গ্রামে ৪৫ থেকে ৭০ শতাংশ বাড়িতেই বৈদ্যুতিক সংযোগ, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে জলের সরবরাহ অথবা শৌচালয়ের সুবিধা নেই। এর মধ্যে আবার ১৮ শতাংশের ক্ষেত্রে এই সব সুবিধার কোনওটাই নেই (Mishra and Shukla, 2013)। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং মহাকাশ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত তথ্য প্রেরণ সম্ভব বটে, তবে তার জন্য কিছু প্রাথমিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। এভাবেই ভৌত পরিকাঠামো কৃষক জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে অগ্রগতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে

তথা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করতে, উৎপন্ন দ্রব্যের অপচয় হ্রাস করতে, মূল্য সংযোজনের প্রসার ঘটাতে এবং সামাজিক পরিকাঠামোকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারে।

মহিলাদের কিছু বিশেষ চাহিদা থাকে। কৃষিজীবী পরিবারের মহিলাদের অধিকাংশই বিনা বেতনের কৃষিমজুর হিসাবে কাজ করেন। ক্ষুদ্র কৃষিজোতে এদের সামান্য মজুরিতে ধান বোনার মতো অস্বাচ্ছন্দ্যকর কাজ করতে হয় (Ghosh, 2010)। তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, নতুন প্রযুক্তির অগ্রগতি ও উচ্চ আয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা শ্রমশক্তি থেকে সরে যাচ্ছেন (Boserup, 1970), সুযোগ পেলে পুরুষরা সংশায়তীতভাবে চাষবাস ভিন্ন অন্যান্য কাজকেই পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছেন। ফলত, কৃষিকাজে মেয়েদের একরকম বাধ্য হয়েই যুক্ত হতে হচ্ছে (Jiggins, 1998)। হতদরিদ্র মহিলাদের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতাটা আরও বেশি। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা, মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা, শিশুর পরিচর্যার সহায়ক ব্যবস্থা, মেয়েদের শরীরের গঠন অনুযায়ী হাল্কা ও ছোটো যন্ত্রপাতি ব্যবহার (যাতে তারা অনায়াসে তা নাড়াচাড়া করতে ও চালাতে পারে), তথ্যের নাগাল পাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি কৃষিজীবী মেয়েদের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

কৃষক-কল্যাণের নবদিগন্ত

বহু বছর ধরে ভারতে কৃষি বিকাশের মূল হাতিয়ার ছিল উন্নত মানের বীজ সরবরাহ, সারে ভরতুকি প্রদান, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সেচের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ তথা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারের তরফে খাদ্যশস্য ক্রয় প্রভৃতি। এই সব সুযোগসুবিধার দৌলতে কৃষিকাজ লাভজনক হয়ে ওঠার পাশাপাশি দেশের মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা প্রদান সুনিশ্চিত করা গিয়েছিল। পরে দেখা গেল, এসব অধিকাংশ সুযোগসুবিধাই মূলত এমন অঞ্চলগুলি পেয়ে চলেছে যেখানে বিভিন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন হচ্ছে। তখন 'পূর্ব ভারতে সবুজ বিপ্লব আনয়ন' বা BGREI (Bringing Green Revolution to Eastern India); 'তৈলবীজ, ডালশস্য, ভুট্টা ও পামতেলের জন্য সংহত প্রকল্প' বা ISOPOM (Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Maize and Oil palm); 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন' বা NFSM (National Food Security Mission); 'রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা' বা RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana); WDRA (Warehousing Development and Regulatory Authority) প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যান্য শস্য উৎপাদন, শস্য মজুতের সুবন্দোবস্ত, বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলসমূহ এবং স্থানীয় চাহিদার

প্রতি, বিশেষত পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া হয়। সুস্থায়ী চাষাবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে শামিল হয় এবং উচ্চ বৃদ্ধি-সহ সুস্থায়ী বিকাশের লক্ষ্য পূরণে এক সংহত নীতিনির্দেশিকা, 'জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' (National Action Plan on Climate Change) তৈরি করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সব চেয়ে বেশি অনিশ্চয়তার শিকার/ক্ষতিগ্রস্ত হন কৃষকরা। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার হেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি তৈরি করা হয়।

ঝুঁকির হাত থেকে বাঁচতে বিমাই হল স্বাভাবিক সমাধান। কিন্তু এদেশে শস্যবিমা চালু করতে কয়েক দশক ধরে টালবাহানা করা হয় (Mishra, 1996, Hazell et. al., 1986)। সবে মাত্র ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতে জাতীয় কৃষি বিমা প্রকল্প (National Agriculture Insurance Scheme) চালু হয়। সেখানেও কেবল শস্যের ফলনের মতো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিমার সংস্থান রাখা হয়। যে কোনও অঞ্চলের কৃষকরা একই ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন ধরে নিয়ে এক্ষেত্রে তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়েছেন যারা, বাধ্যতামূলকভাবে তাদের এর আওতাভুক্ত করা হয়। যাই হোক না কেন, সঠিক তথ্য পরিসংখ্যানে ঘাটতি থাকার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র জোতের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করতে জাতীয় কৃষি বিমা প্রকল্প ব্যর্থ হয়। বাণিজ্যিকভাবে এই প্রকল্প লাভজনক হয়নি। এ জন্য শস্যবিমায় বিভিন্ন ধরনের রদবদল করা হয়। ২০১৬-র জানুয়ারিতে সরকার "প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা" নামে এমন এক সার্বিক বিমা প্রকল্পের সূচনা করে, যার ছত্রচ্ছায়ায় আবহাওয়া, পোকামাকড়, শস্যের রোগব্যাধির কারণে বীজবপণ থেকে শুরু ফসল ওঠা ও গুদামজাত করা এই সমস্ত পর্ব জুড়ে সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতিকেই আওতাভুক্ত করা হয়। এই বিমা যোজনাতেও সরকার কৃষকদের দেওয়া বিমার কিস্তির টাকার উপর ভরতুকি দেওয়া বজায় রেখেছে। প্রতিযোগিতামূলক দর ঘোষণা করার ফলে শস্যবিমার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলিও অংশগ্রহণ করছে। ফলন সংক্রান্ত তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। এর দরুন প্রজ্ঞাপিত 'অঞ্চল' ভবিষ্যতে প্রকৃতপক্ষেই সমপ্রকৃতির হয়ে ওঠার অবকাশ থাকছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় শস্যবিমা এক কার্যকর সুরক্ষা ঢাল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আবহাওয়ার বিপর্যয় এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং বিশাল সংখ্যক মানুষের উপর আঘাত হানতে পারে। সেজন্য নির্ভরযোগ্য অগ্রিম সতর্কতাবার্তা জারি করতে দেশের স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা ও আবহবিদ্যাগত কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করা হয়েছে। ২০০৫ সালের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইনের (Disaster Management Act) আওতায় একটি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দরকার মতো রাজ্যগুলিকে সাহায্য করতে নিয়োগ করা হয়। সরকার যদি খরা পরিস্থিতি ঘোষণা করে, তবে সে ক্ষেত্রে সেচের উপর বিশেষ ভরতুকির বন্দোবস্ত করা হয় এবং খরাকেও বিপর্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

সাবেক নিয়ন্ত্রণাবিধিগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ালে বিপণন ব্যবস্থার সংস্কারসাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাজারকে প্রতিযোগিতাক্ষম ও কর্মকুশল করে তুলতে APMC (Agricultural Produce Market Committee) আইনের সংশোধন করা হয়, যাতে কৃষকদের সামনে আরও বিকল্প সৃষ্টি হয়। শস্যের মজুত ও বণ্টন ব্যবস্থা বর্তমানে তত্ত্বাবধান ও বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় জেরবার। দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের দরুন কতটা কী সুফল মিলবে তা নির্ভর করে এই মজুত ও বণ্টন ব্যবস্থার উপরেই। ২০১৩ সালে প্রবর্তিত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন খাদ্যের স্বত্বাধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রী সরঞ্জাম, খাদ্যে ভরতুকি এবং ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন লাগু হওয়ার ফলে রাজকোষের উপর বাড়তি চাপ পড়ছে। তা সত্ত্বেও বিশ্ব বাজারের চালিকাশক্তির দ্বারা দাম উত্তরোত্তর কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের দরুন কৃষকদের বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে, এমনকি ঘাটতি সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে। ইতোমধ্যে ভারতের ভরতুকি ব্যবস্থাও এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। আধার (Unique Identifier) এবং 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'-র মতো ব্যাংকিং পরিষেবা দেশের প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগের দৌলতে দেশের সবচেয়ে অভাবী মানুষদেরকেও প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer) করা সম্ভব হচ্ছে। রান্নার গ্যাসে ভরতুকি প্রদানের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সুফল দিয়েছে। ২০১৬-'১৭-র অর্থনৈতিক সমীক্ষায় একটি গোটা অধ্যায় জুড়ে নতুন এক ধারণা, সর্বজনীন ন্যূনতম আয় (Universal Basic Income) সম্পর্কে বিচার বিমর্শ করা হয়েছে। এই UBI চলতি সব ধরনের ভরতুকির বিকল্প উঠতে পারে। নাগরিকদের ন্যূনতম আয়ের অধিকারের সপক্ষে এক জোরালো যুক্তি সাজানো হয়েছে এখানে।

বর্তমানে জাতীয় গ্রামীণ আজীবিকা মিশন (National Rural Livelihoods Mission), বৈদ্যুতিন জাতীয় কৃষি বাজার (Electronic National Agricultural Market), জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (National Social Assistance Programme), ইন্দিরা আবাস যোজনা (Indira Awaas Yojana), প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (National Health Mission)-এর মতো বহু গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের দৌলতে জীবিকা, কৃষিজ পণ্যের বিপণন, সামাজিক সহায়তা, বাসগৃহ, সড়ক উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভরতুকি প্রদান অথবা বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার

মানোন্নয়নে সাহায্য করা হচ্ছে। সেচের খরচ কমানো গেলে খরার মারের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো যাবে। তাই সেচ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছে। ২০০৫ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন, MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) বলে চালিয়ে আসা কর্মসূচিটি গ্রামের মানুষদের ন্যূনতম রোজগার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে। এটি কর্মসংস্থানের আইনি অধিকারের প্রতীক চিহ্নস্বরূপ। বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর্থিক সুফল মানুষের কাছে না পৌঁছানো এবং স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল না মেলায় এই কর্মসূচি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই প্রকল্প গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হয়ে উঠতে পারে। ২০১৫ সালে চালু 'National Policy on Skill Development and Entrepreneurship'-এর মাধ্যমে কর্মনিযুক্তির উপযুক্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, উৎপাদনশীলতার মান বৃদ্ধি ও শিল্পোদ্যোগে নিযুক্তির উপযুক্ত মানের দক্ষতার প্রসার ঘটানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

উপসংহার

বহু দিন যাবৎ মূলত উপভোক্তাদের কল্যাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমেই কৃষকদের আয়-উপার্জনের সুরক্ষার বিষয়টিও নিয়ন্ত্রিত হ'ত। বাজার সংস্কার এবং বাজেটে কাটছাঁটের দরুন এই সহায়ক ব্যবস্থাগুলি নিয়ে নানা রকম মতপার্থক্য সামনে উঠে আসছে। আজ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার এক পরিবর্তিত নতুন আদল দেখা দিয়েছে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম কল্যাণকে তাদের অধিকার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বাজারকে সুদক্ষভাবে চালনা করার সুযোগ সরকার করে দিতে পারে বটে; কিন্তু খোলা বাজারে দামের উপর রাশ টানা ও উপার্জনের নিশ্চয়তা দেওয়ার ক্ষমতা সরকারেরও সীমিত।

এতদ্‌সত্ত্বেও রাষ্ট্রই আমজনতার খাদ্য সুরক্ষার মতোই কৃষকের সামাজিক সুরক্ষারও স্বাভাবিক অভিভাবক। প্রাকৃতিক ঝুঁকির হাত থেকে তাদের রক্ষা করা, পরিকাঠামো এবং সামাজিক সুবন্দোবস্ত গড়ে তোলা, তথ্য ও জ্ঞানকে সকলের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়। কিন্তু খাদ্য সুরক্ষার সুবিধা নিয়ে থাকেন যেসব করদাতা নাগরিক এবং সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্র থেকে লাভবান বেসরকারি ক্ষেত্র, উভয়েরই সরকারের এই দায়িত্বভার লাঘব করতে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। অনেকটা পথ এখনও পাড়ি দেওয়া বাকি। আগামীতে অন্যান্য বর্ধনশীল ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে আরও সংহতভাবে কৃষি স্বয়ং এক ব্যবসায়িক উদ্যোগ হয়ে উঠবে। যার ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য জমির উপর চাপ কমবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের তত্ত্বাবধানজনিত জটিলতা দূর করতে প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক উদ্ভাবনগুলি কাজে আসবে। নাগরিক হিসেবে কৃষকদেরও এক সম্ভ্রান্ত জীবনযাপনের অধিকার আছে এবং বাজারে টিকে থাকার জন্য সেও কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।❑

তথ্যসূত্র :

- Asher and Novosad, (2017). Rural Roads and Structural Transformation. Dartmouth, htpps://www.dartmough.edu/~novosad/asher-novosad-roads.pdf
- Boserup Ester (1970). Women's Role in Economic Development. London : Earthscan
- Ghosh, Nilabja (2010). Economic Empowerment of Farm Women through Viable Entrepreneurial Trades. Report submitted to Ministry of Agriculture, Government of India
- Hazel, P., Pomareda C. and Valdes A. (1986) Crop Insurance for Agricultural Development : Issues and Experience, Johns Hopkins University Press, Baltimore MD
- Jiggins, Janice (1998). The Feminization of Agriculture. The Brown Journal of World Affairs. Vol. 5, No. pp. 251-262
- Lipton, Michael (1977). Why Poor People Stay Poor : Urban Bias in World Development. Cambridge, MA : Harvard University Press
- Mishra, Pramod K (1996). Agricultural risk, insurance and income : A study of the impact and design of India's comprehensive crop insurance scheme
- Mishra, Udaya S and Vachaspati Shukla (2013). Basic Household Amenities in India : A Progress Report. eSocialSciences Current Affaris, August 1
- National Sample Survey Office (NSSO) (2005). Situation Assessment Survey of Farmers, Some Aspects of Farming, Report No. 496 (59/33/3), NSS 59th Round, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India
- National Sample Survey Office (NSSO) (2014). Key Indicators of Land and Livestock Holdings in India. NSS KI (70/18.1), NSS 70th Round, (January-December 2013), Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India
- Sen, A. K. (2005), Human Rights and Capabilities, Journal of Human Development, 6(2), 151-66
- Pattanayak, Banikinkar (2015). What's in a name? Ask Ministry of Agriculture, August 16

ডব্লুবিসিএস মোটেই কঠিন পরীক্ষা নয়

রাজ্য সরকারের শীর্ষ পদগুলিতে নিয়োগ হয় ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত ডব্লুবিসিএস –ই হল একমাত্র পরীক্ষা যেটি প্রতি বছর নিয়মিত আয়োজিত হয়। শূন্যপদও প্রতি বছর প্রায় সমান থাকে। রাজ্য প্রশাসনের ব্যুরোক্র্যাট নিয়োগের পরীক্ষাটি নিয়ে সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীরা একটু হীনমণ্যতায় ভোগে। ভেবে নেয় এ পরীক্ষা তাদের জন্য নয়, তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। পরীক্ষাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পিছনে কাজ করে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটি কতটা সহজ, কেন সহজ এবং কিভাবে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন সামিম সরকার।

ডব্লুবিসিএস সম্পর্কে সকলের বিশেষত গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েদের মনে এক ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভীতি শুধুমাত্র অবাস্তব নয়, অলীকও বটে। অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাতে যদিও বা সামান্যতম সৌভাগ্যের প্রয়োজন হয়, ডব্লুবিসিএস-এ তার কোনো দরকার পড়ে না। সঠিক পন্থায় একনাগাড়ে ধৈর্য্যসহ পড়াশুনা করলে সাফল্য আসবেই আসবে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কেন বহু পরীক্ষার্থী বছর বছর পরীক্ষা দিয়েও সাফল্য পাচ্ছে না? তাদের ব্যর্থতার কারণ হল তারা ডব্লুবিসিএস-এর ধাঁচটাকে ধরতে পারেনি, পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে পিএসসি ঠিক কি চাইছে তা বুঝতে পারেনি। ডব্লুবিসিএস-কে ঠিকমতো জানতে পারলে, বুঝতে পারলে সাফল্য শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই তো দেখা যায় বহু পরীক্ষার্থী প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই গ্রুপ—'এ' বা 'বি' তে চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য ডব্লুবিসিএস-এর মেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে।

ডব্লুবিসিএস-এর প্রিলি, মেনস্ এবং ইন্টারভিউ তিনটি পর্যায় বা পর্বের জন্য আলাদা আলাদা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের প্রয়োজন হয়। এই পরিকল্পনাগুলি ফ্লেক্সিবল অর্থাৎ নমনীয় হওয়া দরকার। কিংবা এক-একটি পর্যায়ের জন্য একাধিক পরিকল্পনা তৈরি রাখতে হয় — একটি ব্যর্থ হলে যাতে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়টিকে অনুসরণ করা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এক পরীক্ষার্থীর পরিকল্পনা ছিল ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভূগোল এবং মেন্টাল এবিলিটি থেকে ১০০-এর মধ্যে ৯০ তুলবে। তার জন্য সে বছর খানেক ধরে প্রাণপাত করে ওই চারটি বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করল। কিন্তু প্রিলি পরীক্ষায় দেখা গেল তার টার্গেটের চারটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো তিনটি বিষয়ে ভীষণ কঠিন প্রশ্ন এলো—৯০ তো দূরঅস্ত, ৫০ তুলতেই নাজেহাল অবস্থা। এমতাবস্থায় যদি প্ল্যান-'বি' না থাকে তবে সেই বছরের জন্য ডব্লুবিসিএস-এর দৌড় শেষ। সুযোগের জন্য আরও এক বছরের অপেক্ষা। শুধু পরিকল্পনায় ব্যর্থতায় নয়, আরও অনেক কারণ রয়েছে ব্যর্থতার পিছনে। যারা পরীক্ষার ধাঁত না বুঝে গাঁতিয়ে নোট মুখস্থ করল, উপযুক্ত বইয়ের অভাবে যাদের প্রস্তুতি সঠিক মাত্রায় হল না, কিংবা যারা পরীক্ষাগৃহে যথাযথ প্রদর্শন করতে পারল না — ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটা তাদের কাছে কঠিন। আর যারা পরীক্ষার ধরনটিকে ভালো করে বুঝে প্রস্তুতি নিল, পরীক্ষা গৃহে আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে পরীক্ষা দিল — ডব্লুবিসিএস তাদের কাছে সহজ। আর তাই দেখা যায় এমন বেশ কিছু পরীক্ষার্থী আছে যাদের জন্য প্রতি বছর একটি করে পদ সংরক্ষিত আছে।

এই পরীক্ষার বিশেষত্ব হল প্রশ্নের ধাঁচ বা প্যাটার্ন বোঝা যায় আগেভাগেই। তারজন্য অবশ্য প্রার্থীকে বিগত বছরের প্রশ্নগুলিকে নিয়ে গভীরভাবে কাটাছেঁড়া করতে হবে, করতে হবে ট্রেন্ড অ্যানালিসিস। ২০১৪ সাল থেকে পরীক্ষার সিলেবাস, প্যাটার্ন এবং বিষয়ের নতুন করে বিন্যাস ঘটেছে। মেনস পরীক্ষাটি আগের মত আর পুরোপুরি ডেসক্রিপটিভ নয়। বাংলা, ইংরাজী এবং অপশনাল ছাড়া বাকি পরীক্ষাগুলি এম.সি.কিউ টাইপের। সুতরাং পাতার পর পাতা নোট মুখস্ত করা কিংবা পরীক্ষার খাতায় এক নাগাড়ে লিখে যাওয়ার ব্যাপারটি আর নেই। এখন শুধু দরকার সঠিক অপশনটিকে ডার্কেন করা। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলেছে। **সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের একনম্বর সংস্থা।**

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজী ফর্মুলেশন সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাসই নেন তারা এবং অন্য ফ্যাক্টরটি হল এখানকার নোটস্ উন্নত মানের, যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়। এবারের প্রিলি পরীক্ষায় এখানকার দুটি বই **'স্ক্যানার'** এবং **'প্র্যাকটিস সেট ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স'** থেকে ১৩০টির ও বেশী প্রশ্ন কমন ছিল। চাকরি নিশ্চিত করতে চাইলে আজই আমাদের WBCS-2018 ব্যাচে যোগদান করুন। আসন সংখ্যা সীমিত।

WBCS-2018 নতুন ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে। ক্লাস নেবেন WBCS অফিসাররা।

Academic Association
53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in ✸ Barasat-9073587432 ✸ Uluberia-9051392240
✸ Siliguri-9474764635 ✸ Birati-9674447451 ✸ Darjeeling-9832041123
9038786000
9674478600
9674478644

নারী সমাজের সুরক্ষা : আইনের আলোকে

মণীষা বিশ্বাস, অমিত ভৌমিক, এনামুল কবির পাশা

নারী নির্যাতন যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারপরেও নারী নির্যাতনের ঘটনা কমানো যাচ্ছে না। মহিলা কমিশন, মহিলাদের জন্য পৃথক সেলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মহিলারা কেন এত নির্যাতিত? এই প্রশ্নের উত্তর পুলিশ বা প্রশাসন কারও কাছেই নেই। অন্যদিকে নারী আন্দোলনকারী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা মনে করছেন, এর মূলে রয়েছে 'সদিচ্ছার অভাব'। কাজেই প্রশাসনিক হেলদোল না থাকলে, সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এগিয়ে না এলে, একই সঙ্গে মেয়েরা রুখে না দাঁড়ালে নারী নিগ্রহ বাড়বে বই কমবে না।

"You can tell the condition of a nation by looking at the status of its women"
—Jawaharlal Nehru

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারত যখন বিশ্বের দরবারে উন্নততর ভারতকে, প্রগতিশীল ভারতকে তুলে ধরতে চাইছে, সেখানে এদেশে নারীদের অবস্থানটা কোথায়? দেখা যাচ্ছে শিক্ষিতা নারী, স্বনির্ভর নারী এমনকি সমাজ সচেতন নারীর সংখ্যাও খুবই কম। কিন্তু লাঞ্ছিতা, সমাজ এবং পরিবার কর্তৃক অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা, নির্যাতিতা, সব ধরনের সামাজিক বঞ্চনার শিকার নারীর সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না। স্মরণাতীত যুগ থেকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর সাথে হয়ে আসা এই অমানবিক আচরণ, শক্তিসামর্থ্য ও মানসিক গঠনের দিক দিয়ে পুরুষের সঙ্গে তার তফাৎ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নারীর বিরুদ্ধে হিংসা, পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে নারীকে দমন করারই এক রাস্তা, যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই চলতে থাকে। কোন পথে এই দমন চলবে তা নির্ভর করে সেই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের উপর। সম্প্রতি আমাদের দেশে নারী নিগ্রহ, নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের ঘটনা ব্যাপক হারে বেড়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রী, গৃহবধূ, শিক্ষিকা, মূক-বধির, সরকারি কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ অফিসাররাও ধর্ষণ ও নিপীড়নের শিকার। শুধুমাত্র ধর্ষণ নয়, ধর্ষণের পরে চলে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও খুন।

'Crime in India'-র হিসাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৪৭৫-টি, মধ্যপ্রদেশের ঠিক পরেই আমাদের রাজ্য। মহিলাদের অপহরণের ঘটনা ঘটেছিল ১০১৮-টি। পণজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে ৩৯৬ জনের। শ্লীলতাহানির সংখ্যা ১৫৬৬-টি। আর যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে ৬৪-টি ক্ষেত্রে। ২০০৪ সালের পর আসা যাক ২০০৫-এ। ধর্ষণের ঘটনা ১৬৭৩-টি, অপহরণ ৯৭৩-টি, পণজনিত কারণে মৃত্যু ৪৪০-টি, শ্লীলতাহানি ১৪২৪-টি এবং যৌন নিগ্রহ ১৯-টি। রাজ্য মহিলা কমিশনের রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০০১ সালে এই রাজ্যে ধর্ষণের নথিবদ্ধ ঘটনা ৬৮৬-টি। ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭২৩-টিতে। ২০০৩ সালে ৯৬৯-টি। শ্লীলতাহানির ঘটনা ২০০১ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে ঘটে যথাক্রমে ৭৮৮, ৮০০ এবং ১০১৮-টি। অপহরণের ঘটনা যথাক্রমে ৬৪৪, ৬৪০ এবং ৭১৫-টি। শুধু তাই নয়, পরিবারের মধ্যেই স্বামী বা অন্যদের হাতে মেয়েদের নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা

[মণীষা বিশ্বাস অতিথি অধ্যাপিকা, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। অমিত ভৌমিক সহ-অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ধূলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। এনামুল কবির পাশা সহ-অধাপক, বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ধূলিয়ান, মুর্শিদাবাদ। ই-মেল : amit.socio@rediffmail]

২০০১-এ ছিল ৩৬৫৪-টি, ২০০২ সালে ৩৮২৩-টি এবং ২০০৩ সালে ৪৭২৭-টি। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারী পাচারের ঘটনাও। নারী নির্যাতন যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিধানসভায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারপরেও নারী নির্যাতনের ঘটনা কমানো যাচ্ছে না। মহিলা কমিশন, মহিলাদের জন্য পৃথক সেলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মহিলারা কেন এত নির্যাতিত? এই প্রশ্নের উত্তর পুলিশ বা প্রশাসন কারও কাছেই নেই। অন্যদিকে নারী আন্দোলনকারী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা মনে করছেন, এর মূলে রয়েছে 'সদিচ্ছার অভাব'। কাজেই প্রশাসনিক হেলদোল না থাকলে, সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এগিয়ে না এলে, একই সঙ্গে মেয়েরা রুখে না দাঁড়ালে নারী নিগ্রহ বাড়বে বই কমবে না।

১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "Gender violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coercion of human rights।" অর্থাৎ, নারী নির্যাতন বা লিঙ্গ সহিংসতা হল নারীর বিরুদ্ধে এমন এক হিংস্রতা যার ফলস্বরূপ শারীরিক, মানসিক, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। বেইজিং ঘোষণানুযায়ী (১৯৯৫), "নারী নির্যাতন হচ্ছে এমন ধরনের কাজ বা আচরণ যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিসাধন করে। এছাড়াও এ ধরনের ক্ষতিসাধনের হুমকি, জোরপূর্বক বা খামখেয়ালিভাবে সমাজ বা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণও নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।"

নির্যাতনের সংজ্ঞা (Definition of Violence)

● নির্যাতনের আভিধানিক অর্থ (Lexicon Meaning of Violence) :

অভিধানিকভাবে 'হিংসা'-র অর্থ কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর হানা, যে-কোনও বলপ্রয়োগ বা আঘাতকে বোঝায়, যা থেকে ব্যক্তি বা বস্তু চোটগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Merriam-Webstar's-এর Dictionary অনুযায়ী হিংসার অর্থ "exertion of any physical force for instance : (a) Violence treatment or procedure, (b) Profanation infringement, outrage, assault, (c) strength energy, activity displayed or exerted, vehement, forcible or destructive action or force, (d) Vehemence in feeling, passion, order, furry, fervor।" Chamber-এর বিশ শতকের অভিধান অনুসারে, হিংসা হল অসংগত ও অপ্রতিরোধ্য বলের চরম প্রয়োগ। আক্রোশ, চোট, আঘাত, ধর্ষণ বা অসম্মান প্রদর্শনও হিংসারই প্রকারভেদ। হিংসার প্রধানতম স্বরূপ হল যেনতেন প্রকারে অপরের ওপর আঘাত হানা। এই আঘাত শারীরিক বা মানসিক উভয়ই হতে পারে। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থে অবৈধভাবে বলপ্রয়োগের পন্থাই হল হিংসা। কাজেই পুলিশ কর্তৃক প্রযুক্ত হলে, তা ততক্ষণই বৈধতা পাবে যতক্ষণ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করবে না। কিন্তু তা যখন হবে, সেটি অস্ত্রহীন ও অসংগঠিত ব্যক্তিদের আক্রমণ অপেক্ষা আরও অনেকগুণ ভয়ঙ্কর। Encyclopedia of Crime and Justice-এর মতে, বৃহত্তর অর্থে, "Violence is a general term referring to all types of behavior either threatened or actual, that result in the damage of destruction of prosperity or the injury or death of an individual।" সংকীর্ণ অর্থে, হিংসা মানে, "all types of illegal behavior, either threatened or actual that results in damage or destruction of property, or in the injury of death of an individual।" সাধারণ অর্থে, সংজ্ঞানুযায়ী ধর্ষণ, শিশু, নিগ্রহ, চরম শারীরিক নিপীড়ন, হত্যাও বেশিরভাগ সম্মিলিত হিংসা (collective violence)-এর মধ্যে পড়ে।

● নির্যাতনের সমাজতান্ত্রিক সংজ্ঞা (Sociological Definition of Violence) :

Encylopedia of Social Sciences সম্পূর্ণ শারীরিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিংসাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করে যে, "the illegal employment of methods of physical coercion for personal or group ends.....which is distinct from force or power।" কিন্তু প্রকৃত অর্থে হিংসা বা 'violence'-এর মানে শুধুমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করাতে সীমাবদ্ধ নয়। নানা অবস্থা ও নানা সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক হিংসা (Social violence)-র "illegality" ও "illegitimacy" পালটে যায়। নারীদের ওপর প্রযুক্ত যাবতীয় বল যথা 'Force' ও 'Violence' বা 'Legitimate' ও 'illegal violence' ও অন্যদিকে "discrimination" "oppressions"-এর ধারণা পরস্পরকে অধিক্রমিত করেছে। এই কারণে 'সামাজিক হিংসা'-কে মোটামুটি এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, আমাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন ও বর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত সামাজিক, শারীরিক বা মানসিক বলের অবৈধ প্রয়োগ বা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে হুমকি দেওয়াই হল 'সামাজিক হিংসা'। এক্ষেত্রে 'coercive' নানা পদ্ধতি (শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক) বা ক্ষতি করার হুমকি (মারধর, হত্যা, অপমান, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ) এবং নানা ধরনের 'discrimination' ও 'oppressive' নানা দিক (শিশু প্রতিপালন-এর অধিকার নিয়ন্ত্রণ, কম মজুরি প্রদান, তথা কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-এর সুযোগ দিতে অস্বীকার করা) এর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ সামাজিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে নারীদের অধীনে রাখাই উদ্দেশ্য। পুরুষতন্ত্রের উপাদানসমূহের নারী জাতির উপর প্রযুক্ত অবৈধ বল বা বল প্রয়োগের হুমকির লাগাতার প্রয়োগই হল সামাজিক হিংসা। সমাজতত্ত্ববিদ Elise Boulding-এর 'structural violence'-এর ধারণায়, কে অত্যাচার করবে ও কে সহ্য করবে তার ওপর কোনও নির্দিষ্ট সমাজের পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, মূল্যবোধ সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কার্যকারণের প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অনেক মানুষকে সামাজিক সুযোগসুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের আরও দুর্বল করে দেওয়া হয়। নারী জাতিকে

'structural' ও 'behavioral' উভয় ধরনের হিংসার সম্মুখীন হতে হয়। সব সমাজেই যেখানে পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানে নারীদের অন্য পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক আঘাত থেকে বাঁচানো হলেও নিজের পরিবারে তারা এই ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হন। অনেক সমাজেই বিবাহ সম্পর্কিত খরচের ভয়ে কন্যা ভ্রূণ বা কন্যা শিশুদের হত্যা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি প্রদর্শিত অবজ্ঞা ও তাদের পুষ্টির অভাবে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে করুণ অবস্থা অবিবাহিত, পরিত্যক্ত, বিধবা ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের। এভাবেই সমাজতাত্ত্বিকরা হিংসা শব্দটিকে ব্যাখ্যা না করে তার বিভিন্ন দিককে ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে ভ্রূণহত্যা, শিশুকন্যা হত্যা, বধূহত্যা, স্ত্রী-কে মারধর, শিশুর লালন-পালনে বৈষম্য প্রভৃতির কারণ আমাদের সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত আছে।

● **নির্যাতনের সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা (Socio-Psychological Definition of Violence)** :

সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ Moyer হিংসাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, হিংসা হল মানবীয় আগ্রাসনের একটি প্রকাশ যা ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে আহত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে। মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে হিংসা ও আগ্রাসনের মধ্যে ফারাক থাকা সত্ত্বেও তারা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। Allen আগ্রাসনের ধারণাকে গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক, উভয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য হিংসা ধ্বংসাত্মক কার্য পদ্ধতিরই উদাহরণ। আগ্রাসনকে যেখানে খেলাধূলা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো গঠনমূলক ও উপকারী দিকে ব্যবহার করা যেতে পারে, হিংসার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। একে একেবারে বাদ দেওয়া বা অন্যদিকে চালিত করা সম্ভব। সমাজ মনস্তত্ত্ববিদরা আন্তঃব্যক্তিগত আচরণগত হিংসা নিয়েও কাজ করেছেন। তারা হিংসাকে শারীরিক আঘাত সৃষ্টিকারী মনুষ্য আগ্রাসন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নারী হিংসা, কন্যাশিশু হত্যা, বধূহত্যা, পণের কারণে হত্যা, ধর্ষণ, মারধর প্রভৃতি হল এমনই শারীরিক আঘাত সৃষ্টিকারী ঘটনা। Wrightsman ও Deaux-এর মতে, আগ্রাসন অর্থে শুধুমাত্র শারীরিক আগ্রাসনই বোঝায় না। মৌখিক অবমাননা বা কোনও ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় কোনও কিছু দিতে অসম্মত হওয়াও এক ধরনের আগ্রাসন। Niraj Sharma-এর মতে, 'Violence' অর্থে বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে, যে কোনও ধরনের শারীরিক হিংসা বা অন্য যে কোনও ধরনের অত্যাচারকে বোঝায়। কিন্তু তিনি এই সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট নন, তার মতে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তখনই 'victim' বলা যাবে, যখন নির্দিষ্ট কিছু চাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তির ইচ্ছা অমান্য করলেই সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অত্যাচার বা আঘাতের হুমকি দেওয়া হয়। এতে করে শুধুমাত্র মহিলাদের ওপর যে কোনও শারীরিক আঘাতই নয়, নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ও অবস্থায় 'threats of use of force'-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এই সংজ্ঞারও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন এক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত বা অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না, যেখানে বলপ্রয়োগ হিংসার রূপ নিতে পারে। বৃত্তি, বিয়ের ক্ষেত্রে সাথী নির্বাচন, যৌন ব্যবহার, আত্মোপলব্ধি প্রচেষ্টা, সামাজিক অংশগ্রহণ-এর মতো সামাজিক আচার, ঐতিহ্য বা আইনের ক্ষেত্রে "Illegitimate use of force"-কে হিংসা হিসাবে দেখা যেতে পারে। Gelles পারিবারিক হিংসাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) সাধারণ হিংসা (দৈনিক প্রয়োজনীয়, আদর্শ বা মাননির্ধারক)।

(২) গৌণ হিংসা (যখন পারিবারিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য হিংসা ব্যবহার করা হয়, যা তদুপরি হিংসার জন্ম দেয়)।

(৩) তীব্র হিংসা (Volcanic violence)। যখন অত্যাচারীর অত্যাচারের সীমা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের অবৈধ হিংসার জন্ম হয় মূলত মানসিক চাপ ও হতাশা থেকে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় দোষীকে হিংসার পথে চালিত করে।

সংকীর্ণ অর্থে, হিংসা মানে অবৈধ শারীরিক বলপ্রয়োগকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য, অত্যাচার, সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি, হুমকি দেওয়া, অসমতা প্রভৃতিকে বোঝায়।

● **নির্যাতনের কার্যগত সংজ্ঞা (Operational Definition of Violence)** :

এখনও পর্যন্ত এমন কোনও 'operational' সংজ্ঞা নেই, যা সব ধরনের নারী হিংসাকে আওতায় আনবে। শারীরিক আঘাত হানার ঘটনা ছাড়াও মৌখিক দুর্ব্যবহার, হুমকি, উত্যক্ত করা, বঞ্চিত করা, অসাম্যের আশ্রয় নেওয়া বা লক্ষ্যপূরণে বাধা সৃষ্টি করার মতো ঘটনা হল নারী হিংসারই অন্য রূপ। যদি কোনও শারীরিক আঘাত নাও থাকে তবুও এরূপ হিংসা মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের কারণ হতে পারে। তবে শারীরিক আঘাত মাত্রেই তার দরুন মানসিক আঘাত সৃষ্টি হবেই এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু প্রত্যেকটি আন্তঃব্যক্তিগত হিংসার ক্ষেত্রেই মানসিক আঘাতের সৃষ্টি হয়, একমাত্র খুন ছাড়া; যেহেতু এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি আঘাত সহ্যের জন্য জীবিত থাকে না। নারী হিংসার ক্ষেত্রে একটি 'operational' সংজ্ঞায় সকল অপরাধের অন্তর্ভুক্তিই সম্ভব "Any aggressive behavior of a person or persons hurting body or positive regard or both of another person or persons is human violence।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে নারী হিংসার ব্যাপারে কতকগুলো ভুল ধারণার অবসান হবে।

প্রথমত, মনে করা হয় যে, প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষেরাই অত্যাচারী এবং এটি লিঙ্গগত সংঘর্ষ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারী পুরুষ হতে পারে, আবার নারীও হতে পারে। লালন-পালনের ক্ষেত্রে মায়েদের জন্যই পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে অসাম্যের পরিমাণ বাড়ে। যৌন হিংসার ক্ষেত্রে পুরুষেরাই অত্যাচারকারী, কিন্তু পারিবারিক হিংসার ক্ষেত্রে প্রধানত পুরুষেরা অত্যাচারকারী হলেও মহিলারাও মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র শারীরিক নিগ্রহকেই হিংস্রতা হিসাবে ধরা হয়। সন্দেহ নেই যে, মারধোর, হত্যার মতো শারীরিক নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে আগ্রাসন প্রকাশ পায়; কিন্তু তিরস্কার করা, অপমান করা, মৌখিক দুর্ব্যবহার বা হুমকি দেওয়া কিংবা কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত করা, অসাম্য বা নারীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনাও হিংসার প্রকাশ। এই ধরনের সুপ্ত হিংসা মহিলাদের মানসিকভাবে আঘাত করে।

তৃতীয়ত, এরকম একটি ধারণা আছে যে, হিংসা মানেই শারীরিক আঘাত। কিন্তু আদতে অত্যাচারকারীর ব্যবহার শারীরিক বা মানসিক কিংবা উভয় ধরনের আঘাতেরই জন্ম দিতে পারে। যখন কোনও নারীকে মারধর করা হয়, অগ্নিদগ্ধ করা হয়, ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানি করা হয় তখন সে শুধুমাত্র শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও বিধ্বস্ত হয়।

সকল ধরনের অসাম্য; বাধাদান ও বঞ্চিত করার সূত্রে তার মনের ওপর আঘাত আসতে পারে, এমনকি সে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে পারে। কাজেই মানসিক আঘাতকে শারীরিক আঘাতের মতোই গুরুত্ব দিতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিংসাকে একটি মনুষ্যসৃষ্ট ধারণা হিসাবে দেখতে হবে, যেখানে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় Declaration on the Elimination of All forms of Violence Against Women গৃহীত হয়, যেখানে নারী হিংসাকে মহিলাদের ওপর পুরুষের ঐতিহাসিক আধিপত্যের ফল হিসাবে গণ্য করা হয়, যা নারীদের পূর্ণ বিকাশের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের ১ নং ধারায় নারী হিংসার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে, "Any act of gender-based violence that results in, or is likely to results in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.।"

নির্যাতনের প্রকারভেদ (Types of Violence)

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির দিক থেকে দেশে দেশে ভিন্নতা থাকলেও নারী নির্যাতনের দিক থেকে তেমন কোনও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতনের প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন।

● **ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং বিশেষ ও স্থানীয় আইন অনুযায়ী অপরাধের ধরন :**

(ক) ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধ (The Crimes under the Indian Penal Code—IPC)

(i) ধর্ষণ (Rape)—(Section 376 IPC)

(ii) অপহরণ (Kidnapping and Abduction)—(Sec. 363-373 IPC)

(iii) পণঘটিত মৃত্যু (Dowry Death)—(Sec. 302, 304B IPC)

(iv) স্বামী অথবা তার পরিজন কর্তৃক হিংসা (Cruelty by Husband & Relatives)—(Sec. 498-A IPC)

(v) শ্লীলতাহানি (Molestation)–(Sec. 354 IPC)

(vi) যৌন হয়রানি (Sexual Harassment)—(Sec. 509 IPC)

(vii) নারী পাচার (Importation of Girls)—(Sec. 366-B IPC)

(খ) বিশেষ ও স্থানীয় আইন অনুযায়ী অপরাধসমূহ (The Crimes under Special and Local Laws)

(i) সতী (নিষিদ্ধ) আইন—১৯৮৭ (Sati Prevention Act—1987)

(ii) পণ (নিষিদ্ধ) আইন—১৯৬১ (Dowry Prohibition Act—1961)

(iii) অবৈধ পাচার (নিবারণ) আইন—১৯৫৬ (Immoral Traffic Prevention Act, 1956)

(iv) নারীর অশোভন উপস্থাপন (নিষিদ্ধ) আইন—১৯৮৬ (Indecent Representation of Women Prohibition Act—1986)

(v) গার্হস্থ্য হিংসা সুরক্ষা আইন, ২০০৫ (Domestic Violence Bill—2005)

সমাজে নারী নির্যাতন মানে শুধুমাত্র নারী নিগ্রহ বা নারী ধর্ষণ নয়। বিভিন্নভাবে চলেছে নারীদের উপর অত্যাচার, যেমন পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে নারীদের উপর অত্যাচার, বধূহত্যা, তালাক প্রথায় অত্যাচার, নারী পাচার, কন্যা হত্যা, ইভটিজিং, গার্হস্থ্য নির্যাতন ইত্যাদি। পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে দেশে প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনে এমন কত নিষ্ঠুর নির্যাতন নেমে আসছে। এমনকি খুনও হচ্ছে। National Crime Record Bureau-র রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি ১০২ মিনিটে একজন নারী পণজনিত কারণে খুন হয়। ২০১০ সালে পণের কারণে দেশে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৮৩৯-টি। পণ প্রথার নিষিদ্ধকরণ আইন চালু হয়েছে ১৯৬১ সালে। পণ নেওয়া ও দেওয়া দুই-ই আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ।

নারীদের জন্য সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থাদি (Constitutional & Legal Provisional for Women)

● **সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি (Constitutional Provisions) :**

দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিতে, অর্থাৎ সংবিধানে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে মহিলাদের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ করা হল এখানে।

১৪ নং ধারা : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকার এবং তাদের জন্য সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা।

১৫ নং ধারা : লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৫(৩) নং ধারা : মহিলাদের জন্য ইতিবাচক বৈষম্য সৃষ্টি, অর্থাৎ তাদের জন্য আলাদা করে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে এই ধারা।

৩৯ নং ধারা : মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের সমান সুযোগের ব্যবস্থা ও সমান কাজের

জন্য পুরুষ ও মহিলাদের সমান পারিশ্রমিকের বিধান রয়েছে এই ধারায়।

৪২ নং ধারা : মহিলাদের জন্য কর্মস্থলে মানবিক পরিবেশ গড়ে তোলা, মাতৃত্বলাভের সময় তাদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা।

৫১ নং ধারা (এ) (ই) : মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, এমন সমস্ত রীতি, নীতি ও প্রথা বন্ধ করাকে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এই ধারায়।

২০০১ সালে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ঘোষিত জাতীয় নীতিতে বাজেট ব্যবস্থায় একটি লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা বা বাজেটে মহিলাদের কথা ভেবে আলাদা বন্দোবস্ত রাখার কথা বলা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে, মহিলাদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু আইনগত ব্যবস্থা। এগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

● **বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য প্রণীত কিছু আইন (Legal Provisions) :**

- অবৈধ পাচার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৬ বা Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
- ১৯৬১ সালে প্রসূতিদের সুবিধার্থে প্রণীত আইন বা Maternity Benefit Act, 1961
- পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১ বা Dowry Prohibition Act, 1961
- মহিলাদের অশ্লীল প্রদর্শন (নিষিদ্ধকরণ আইন), ১৯৮৬ বা Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
- সতী প্রথা (নিবারণ) আইন, ১৯৮৭ বা Commission of Sati Prevention Act, 1987
- ২০০৫ পারিবারিক হিংসার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য প্রণীত আইন বা Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

(ক) অর্থনৈতিক (Economical)

- ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন বা Factories Act, 1948
- ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন বা Minimum Wages Act, 1948
- ১৯৪৮ কর্মচারী রাজ্য বিমা আইন বা Employees State Insurance Act, 1948
- ১৯৫১ সালের বাগিচায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রণীত আইন Plantation Labour Act, 1951
- ১৯৭৬ সালের সমান পারিশ্রমিক আইন বা Equal Remuneration Act, 1976
- ১৯৭৬ সালের দাসপ্রথা (বিলোপ) আইন বা Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

(খ) সুরক্ষা সম্পর্কিত (Security Related)

- ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি বিচার বিধিতে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয় (Relevant Provision of Code of Criminal Procedure, 1973)
- ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) আওতায় মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
- ১৯২৩ সালে প্রণীত মহিলা আইনজীবী আইন বা Legal Practitioner (Women) Act, 1923
- ১৯৯৪ সালে প্রণীত জন্মের আগে শিশুদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা (নিয়ন্ত্রণ ও অপব্যবহার রোধ) আইন, Pre-natal Diagnostic Technic (Regulation, Prevention of Misuse), 1994

(গ) সামাজিক (Social)

- ১৯৮৪ সালের পারিবারিক আদালত আইন বা Family Courts Act, 1984

সারণি-১
অপরাধের প্রকারভেদ অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের খতিয়ান (২০০৭ থেকে ২০১১ সাল)

ক্রমিক সংখ্যা	অপরাধের প্রকারভেদ	বছর					২০১১ সালে ২০১০ সালের তুলনায় শতাংশের হেরফের
		২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	
১.	ধর্ষণ (Sec. 376 IPC)	২০,৭৩৭	২১,৪৬৭	২১,৩৯৭	২২,১৭২	২৪,২০৬	৯.২
২.	অপহরণ (Sec. 363 to 373 IPC)	২০,৪১৬	২২,৯৩৯	২৫,৭৪১	২৯,৭৯৫	৩৫,৫৬৫	১৯.৪
৩.	পণ্যজনিত মৃত্যুর ঘটনা (Sec. 302/304 IPC)	৮,০৯৩	৮,১৭২	৮,৩৮৩	৮,৩৯১	৮,৬১৮	২.৭
৪.	স্বামী ও তার পরিজন কর্তৃক হিংসার ঘটনা (Sec. 498-A IPC)	৭৫,৯৩০	৮১,৩৪৪	৮৯,৫৪৬	৯৪,০৪১	৯৯,১৩৫	৫.৪
৫.	শ্লীলতাহানি (Sec. 354 IPC)	৩৮,৭৩৪	৪০,৪১৩	৩৮,৭১১	৪০,৬৩১	৪২,৯৬৮	৫.৮
৬.	যৌন হয়রানি (Sec. 509 IPC)	১০,৯৫০	১২,২১৪	১১,০০৯	৯,৯৬১	৮,৫৭০	– ১৪.০
৭.	নারী পাচার (Sec. 366-B IPC)	৬১	৬৭	৪৮	৩৬	৮০	১২২.২
৮.	সতী নিষিদ্ধ আইন, ১৯৮৭	০	১	০	০	১	১০০.০
৯.	অবৈধ পাচার (নিবারণ) আইন, ১৯৫৬	৩,৫৬৮	২,৬৫৯	২,৪৭৪	২,৪৯৯	২,৪৩৫	– ২.৬
১০.	নারীর অশোভন উপস্থাপন (নিষিদ্ধ) আইন, ১৯৮৬	১,২০০	১,০২৫	৮৪৫	৮৯৫	৪৫৩	– ৪৯.৪
১১.	পণ (নিষিদ্ধ) আইন, ১৯৬১	৫,৬২৩	৫,৫৫৫	৫,৬৫০	৫,১৮২	৬,৬১৯	২৭.৭
	মোট	**১৮৫৩১২**	**১৯৫৮৫৬**	**২০৩৮০৪**	**২১৩৫৮৫**	**২২৮৬৫০**	**৭.১**

- ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন বা Indian Succession Act, 1925
- ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন বা Child Marriage Restraint Act, 1929
- ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন বা Hindu Marriage Act, 1955
- ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (২০০৫ সালে আইনটিকে সংশোধন করা হয়) বা Hindu Succession Act, 1956
- ১৯৬৯ সালের ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বা Indian Divorce Act, 1969
- ১৯৭১ সালে প্রণীত চিকিৎসার কারণে গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন বা Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
- পারিবারিক হিংসার হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আইন, ২০০৫ (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

পরিবারের মধ্যে যে-কোনও রকম নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে মহিলাদের রক্ষা করতেই এই আইনটির অবতারণা। পারিবারিক নির্যাতন, তা যে-কোনও বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত হোক বা কাকতালীয়, সবই এই আইনের আওতায় আসবে। পারিবারিক নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করতে এই আইন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শুধু বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, লিভ-ইন সম্পর্ককেও আনা হয়েছে এই আইনের আওতায়। আইনের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনও কাজ বা আচরণ করা বা না-করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলার ক্ষতি হলে বা আঘাত লাগলে কিংবা ক্ষতি হওয়া বা আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকলে তাকে 'পারিবারিক নির্যাতন' বলে ধরা হবে। এই আইনে শারীরিক, যৌন, আবেগগত, মৌখিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন বা এগুলির ভয় দেখানোকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় মহিলাদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা ক্রমেই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

- সপ্তম পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত ২৭-টি কর্মসূচির ওপর নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়। DCWD-র ওপর এই নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয় সপ্তম পরিকল্পনায়।
- অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-১৯৯৭) : সাধারণ উন্নয়নের ক্ষেত্র থেকে মহিলাদের জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়।
- নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) : এই পরিকল্পনাতেই গৃহীত হয় মহিলাদের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা বা 'Women Component Plan'। মহিলাদের উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বরাদ্দ অর্থসম্পদ বা সুযোগসুবিধা যাতে ৩০ শতাংশের কম না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই পরিকল্পনায়।
- দশম পরিকল্পনা : লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতিকে বাজেট বরাদ্দে প্রতিফলিত করতে জেন্ডার বাজেটিং ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করা হয় এই পরিকল্পনায়।

● জেন্ডার বাজেটিং (Gender Budgeting) :

'জেন্ডার বাজেটিং' কথাটির সঙ্গে আমরা খুব বেশি দিন পরিচিত হইনি। দেশের মহিলা ও শিশুকন্যাদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সরকারি তহবিলের একটি অংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করে লিঙ্গ সমতা আনাই জেন্ডার বাজেটিং-এর মূল লক্ষ্য। জেন্ডার বাজেটিং হল এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে সরকারের লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে বাজেট বরাদ্দে প্রতিফলিত করার জন্য বাজেটকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে তার বিচার বিবেচনা করা হয়, যাতে লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করা যায়।

● হিংসা নিরসনে জাতীয় উদ্যোগ (National Initiatives to Curb the Gender Violence) :

(i) জাতীয় মহিলা আয়োগ বা National Commission for Women

(ii) স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা বা Reservation for Women in Local Self-Government

(iii) কন্যাশিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯১-২০০০) বা The National Plan of Action for the Girl Child (1991-2000)

(iv) মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় নীতি, ২০০১ বা National Policy for the Empowerment of Women, 2001

(v) মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় মিশন, ২০১০ বা National Mission for Empowerment of Women, 2010

● ভার্মা কমিটির প্রতিবেদন (Verma Committee Report) :

The Criminal Law Amendment Bill, ২০১৩, গত ১৯ মার্চ, ২০১৩ লোকসভায় এবং ২১ মার্চ, ২০১৩ রাজ্যসভায় পাস হয়। ২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর আইনটি কার্যকর হয়। আইনটি এর আগে এক অর্ডিন্যান্সের আকারে ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ থেকেই কার্যকর হয়েছে বলে ধরা হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২ দিল্লির বাসে এক তরুণীর উপরে পাশবিক শারীরিক নিগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনকানুন আরও কঠোর করার দাবি ওঠে। সমগ্র দেশব্যাপী দাবির চাপে ২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বর ভারতের প্রাক্তন বিচারপতি জে. এস. ভার্মার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় যা এক মাসের মধ্যে তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি তার সুপারিশে মহিলাদের ওপর যৌন নিগ্রহের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির কিছু পরিবর্তন প্রস্তাব করে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি নিয়ে তৈরি হয় Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013। এই Ordinance-টির বদলে পরে Criminal Law Amendment Act কার্যকর হয়েছে।

নারী নির্যাতন রোধ ও নারী মুক্তি (Prevention & Emancipation)

নারী নির্যাতন রোধ করতে হলে, নারীকে অসম্মান ও অমর্যাদার হাত থেকে মর্যাদার আসন দিতে হলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজ প্রগতির সংগ্রামে নারীর অবদমনকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেখতে হবে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। নারীদের সম্মান জনমানসে একদিন তুলে ধরেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী। কাজী নজরুল ইসলাম নারীদের মূল্য দিয়ে বলেছিলেন, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। এক্ষেত্রে সাহিত্য ও শিল্প মাধ্যমের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে, বিকশিত করতে হলে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে শোষক-শাসক ও শোষিত-শাসিত শ্রেণির দ্বন্দ্বের মধ্যে জন্ম নেয় বিবেক ও মনুষ্যত্ব, যা যুগোপযোগী। তাই আজকের দিনে উন্নততর যুগের উপযুক্ত নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যা দিয়ে চলেছে, স্বাধীনোত্তর আধুনিক ভারতে, ভারত তথা বিশ্বের সর্বাত্মক সংকটকালে তা দিয়ে চলবে না। নারীদের মূল্য, মর্যাদা ও সম্মান দেবে এমন উপযুক্ত মানুষ গড়ে তুলতে হলে সমাজে চর্চা করতে হবে এ যুগের উপযোগী উন্নত নতুন আদর্শ ও মূল্যবোধের, যার ভিত্তি হবে বিজ্ঞান। কারণ বিজ্ঞানই একমাত্র ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য প্রকাশ করে। মিথ্যার সঙ্গে তার আপস নেই। আজকের দিনে নারী মুক্তি-সহ সমাজের সার্বিক বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক আধুনিক বিশ্বায়নের যুগের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থাই বাড়িয়ে দিয়েছে নারী নির্যাতন ও নারীর অবমূল্যায়ন। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে নারীদের ও সমাজ পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার। সঠিক আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে ব্যাপকতম বিবেকবান নরনারীকে সংঘবদ্ধ করে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠবে বিবেকবান ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের প্রবাহ। পরিবেশও পাল্টাবে। আবার একান্তভাবে নারী সমাজকেও নিজস্ব মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শোষিত শ্রেণির আন্দোলনের সঙ্গে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, হাত ধরাধরি করেই। আর এ পথেই নারী মুক্তির পথ হবে সম্প্রসারিত (বানু, সৃজনী, অক্টোবর, ২০১৩)।❑

সারণি-২
ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় মোট অপরাধের ঘটনার তুলনায় মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের (ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায়) অনুপাত

ক্রমিক সংখ্যা	বছর	ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় মোট অপরাধের ঘটনা	মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের (ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায়) ঘটনা	ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় মোট অপরাধের ঘটনার শতাংশের অনুপাত
১.	২০৭	১৯,৮৯,৬৭৩	১,৭৪,৯২১	৮.৮
২.	২০০৮	২০,৯৩,৩৭৯	১,৮৬,৬১৭	৮.৯
৩.	২০০৯	২১,২১,৩৪৫	২,০৩,৮০৪	৯.২
৪.	২০১০	২২,২৪,৮৩১	২,১৩,৫৮৫	৯.৬
৫.	২০১১	২৩,২৫,৫৭৫	২,১৯,১৪২	৯.৪

তথ্য সূত্র :

- Bhowmick, A. (2016) : Social Problem, rita Publication, Kolkata (In Bengali)
- Agrawal & Agrawal (2009) : "Women Empowerment in the Age of Globalization" in Meenu Agrawal (edt), "Women Empowerment and Globalization", Kanishka Publishers and Distributors, New Delhi.
- Goel, A. (2006) : Violence against Women : Theoretical framework and Practical Implications in Goel and Others (edt.) Violence against Women, Deep & Deep Publication, New Delhi.
- Hazra, Anupan (September 2011) : "Empowering Women in Rural India—Exploring the current Dynamics", Kurukshetra, September 2011, Vol. 59, No.-11, pp : 3-5.
- Kahol, Y. (2003) : Violence against Women, Reference Press, New Delhi
- Manab Mon (In Bengali)
- Moner Katha (In Bengali)
- *Ministry and Programme Implementation, Central Statistical Organisation (2002). Women and Men in India, 2001. New Delhi*
- Prabhudas, P. (2011) : Role of Law on Economic Empowerment of Women, Ph.D. Thesis
- Sharma, Arpita (September 2011) : "Women Empowerment—Milestones and Challenges", Kurukshetra, Vol. 59, No. 11, pp : 10-15.
- *Sharma, Yojana, September 2016, p : 67*
- Singh, D. and Ansari, N.A. (September 2008) : "The Empowerment of Indian Women and reference to Five Year Plans", Kurukshetra, Vol. 56, No. 11, pp : 13-16.
- Srijoni (In Bengali)

মধ্যাহ্নকালীন ভোজন : এক সফল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, কিন্তু.....

কিরণ ভাট্টি

শিক্ষার নাগাল পাওয়ার জন্য নিরাপত্তাহীন, অসহায় প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিশুদের কিছু সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন হয়ই। যদিও শিক্ষাই ভবিষ্যতের অসহায়তার বিরুদ্ধে স্বয়ং এক ধরনের সামাজিক সুরক্ষা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা এবং আগাগোড়া লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে বিশেষ কিছু সামাজিক সুরক্ষার সংস্থান জরুরি। এর মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন প্রকল্প বোধ হয় ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, সবচেয়ে সুপরিচালিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি।

সামাজিক সুরক্ষা বলতে সাধারণভাবে বোঝায় মানুষের কল্যাণসাধন। যে ব্যবস্থা সমস্ত নাগরিকের জন্য এই কল্যাণ সুনিশ্চিত করে তাও সামাজিক সুরক্ষার আরেকটা দিক। সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে ন্যূনতম কিছু সুযোগসুবিধা ও পরিষেবা প্রদানে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দেয় তা, দেশের নাগরিকরা যাতে এক মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। সামাজিক সুরক্ষার ধারণার উৎপত্তি হয়েছে সামাজিক চুক্তির ধারণাটির সূত্রে। সমাজ সংগঠনের জন্য প্রতিটি স্বাধীন এবং সমগোত্রীয় ব্যক্তির মধ্যে এমনভাবে এই সমঝোতা তথা চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাতে সকলের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণের সংস্থান করা যায়।[১] গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হিসাবে এই সামাজিক চুক্তি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। সামাজিক সুরক্ষার ইতিহাস খুঁজে বের করা বেশ দুষ্কর। তবে গরিবদের মধ্যে বিনামূল্যে শস্য বিতরণের ঘটনার তথ্যপ্রমাণ থেকে সাক্ষ্য মেলে সুদূর অতীতে, রোম সাম্রাজ্যের সময় থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানাভাবে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে লাগু করা ব্রিটিশ দরিদ্র আইন, ১৬০১ (English Poor Law, 1601) এবং মার্কিন সামাজিক সুরক্ষা আইন, ১৯৩৫ (US Social Security Act, 1935) সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের আরও পরিচিত উদাহরণ। সামাজিক সুরক্ষার সব থেকে সহজবোধ্য এবং স্বীকৃত ঘোষণাটি বোধ হয় ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights, 1948)-এর ২২ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক সুরক্ষা কবচের অধিকার রয়েছে। একজন নাগরিক আত্মমর্যাদা রক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের বাধাহীন বিকাশের জন্য জাতীয় উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সহায়সম্পদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অপরিহার্য আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি লাভ করার অধিকারী। নাগরিকদের যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তার ধরনধারণের উপর ভিত্তি করে সামাজিক সুরক্ষার ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ চোখে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়। হয় তারা কোনও কর্মসূচিতে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, যেমন, পেনসন, বেকার ভাতা ইত্যাদি (যেগুলি সাধারণত সামাজিক বিমা নামে পরিচিত)। অথবা স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ন্যূনতম পরিষেবা, যেগুলির জন্য অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হয় না, সেগুলিও সামাজিক সুরক্ষার স্বীকৃত ধরন। উভয় ক্ষেত্রেই এই সুযোগসুবিধা-গুলিকে গণতান্ত্রিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হয়। নাগরিকদের দারিদ্র্যের অসহায়তা ও সামাজিক বৈষম্যের অভিঘাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সুনিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবেই সাব্যস্ত করা হয়।

ভারতে খাতায়-কলমে পেনসন, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা (বেকারভাতা-সহ),

[লেখক 'Centre for Policy Research'-এ বরিষ্ঠ গবেষক। ই-মেল : kiran.bhatty@cprindia.org]

মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা, খাদ্যে ভরতুকি অথবা স্কুলে খাদ্য প্রদানের মতো একাধিক সামাজিক সুরক্ষার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সেগুলি সর্বত্র সমানভাবে সুফল দিচ্ছে না। এমনকি, বেশ কিছু ক্ষেত্রে তার ফলাফল যথেষ্টই অসন্তোষজনক। যাদের উদ্দেশ্যে এই সব সুযোগসুবিধা প্রদান করা হচ্ছে, সেগুলি যে তাদের কাছে আদৌ গিয়ে পৌঁছচ্ছে না, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। এই অব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন কারণ দেখানো হয়। এর মধ্যে রয়েছে আমলাতান্ত্রিক উদাসীনতা ও দুর্নীতি থেকে শুরু করে সহায়সম্পদের অভাব পর্যন্ত। যাই হোক না কেন, ব্যর্থতা কাটিয়ে এই ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করার আদৌ কোনও লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছেই না, বরং অনেক সময়ই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে। প্রশাসনিক স্তরে এই অক্ষমতা শুধুমাত্র নাগরিকদের মধ্যেই নয়, আমলাতন্ত্রের মধ্যেও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। ফলত, রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত আলোচনায় প্রকল্প রূপায়ণ পর্বের এই তথাকথিত ব্যর্থতাই হয়ে উঠেছে মূল আলোচ্য। এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণগুলিকে শনাক্ত করার জন্য ততটা জোর দেওয়া হচ্ছে না। (প্রশাসনিক) ব্যবস্থার ভিতরের ত্রুটিগুলি দূর করার পরিবর্তে চেষ্টা চলেছে বাইরে থেকে এর সমাধান খোঁজার (বেসরকারীকরণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ইত্যাদি), অথবা প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানোর। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দুর্নীতির হার কমিয়ে সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রকৃত প্রাপকের হাতে পৌঁছে দিতে বায়োমেট্রিক্সের বাধ্যতামূলক ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত সর্বশেষ উদ্যোগটি হল স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন ভোজনের সুবিধা পাওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বায়োমেট্রিক্স ভিত্তিক আধার কার্ডকে (UID) বাধ্যতামূলক করার সরকারি ঘোষণা।

সংশ্লিষ্ট নিবন্ধটি শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার রূপ হিসেবে স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন এবং সেই কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়ণে বায়োমেট্রিক্সের প্রয়োগের বিষয়টিতে আলোকপাত করেছে। প্রকৃতপক্ষে হয় তো এই ব্যবস্থা শিশুদের পুষ্টিগত ও শিক্ষাগত সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়ে যথাযথ উত্তর খোঁজার পরিবর্তে আর প্রশ্ন তুলে দেবে, এমনটাই এখানে সওয়াল করা হয়েছে।

মধ্যাহ্নকালীন ভোজন (Mid-day Meal) প্রকল্প

সামাজিক সুরক্ষা এবং শিক্ষার মধ্যে সংযোগের বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সংযোগের ধারাটি উভমুখী হওয়ায়, জটিলও বটে। শিক্ষার নাগাল পাওয়ার জন্য নিরাপত্তাহীন, অসহায় সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা শিশুদের কিছু সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন হয়ই। যদিও শিক্ষাই ভবিষ্যতের অসহায়তার বিরুদ্ধে স্বয়ং এক ধরনের সামাজিক সুরক্ষা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা এবং আগাগোড়া লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে বিশেষ কিছু সামাজিক সুরক্ষার সংস্থান জরুরি। বসতির যথাসম্ভব কাছাকাছি স্কুল, বৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক উৎসাহদানের সংস্থান, স্কুলেই ভোজনের বন্দোবস্ত, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য প্রকল্প এবং প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া পরিবারগুলি থেকে আসা শিশুদের সহায়তার জন্য অন্যান্য নানাবিধ কর্মসূচি; সবই এর আওতায় পড়ে। এর সব ক'টিই ভারত সরকারের শিক্ষা নীতি ও কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কিছু বেশ সফল হয়েছে, কয়েকটি ততখানি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। এর মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন ভোজন প্রকল্প বোধ হয় ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, সব চেয়ে সুপরিচালিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি।

খালি পেটে শিক্ষা হয় না, একথা সর্বজনবিদিত। ভারতে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে, ক্ষুধা ও অপুষ্টির পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করেই স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল বা মধ্যাহ্নকালীন ভোজন চালু করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়।[২] এভাবে একই সঙ্গে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যার মোকাবিলা এবং শিশুদের স্কুলে পড়তে আসা ও সেখানে গোটা দিন কাটানো; এই দুই উদ্দেশ্যই পূরণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, স্কুলে মিড-ডে মিল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে। সারা পৃথিবী জুড়ে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে মিড-ডে মিল অনাহার কমায়, বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ায় এবং পঠন-পাঠনের মানোন্নয়ন করে।[৩] অধিকাংশ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশেই স্কুলে ভোজনের কোনও না কোনও ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে। ভারতে স্কুলে বাচ্চাদের জন্য রান্না করা গরম খাবারের বন্দোবস্ত করার ইতিহাস বেশ পুরোনো। শুরু হয়েছিল তামিলনাড়ুতে; ১৯৮২ সালে সে রাজ্যে বিদ্যালয়গুলিতে মধ্যাহ্নভোজন সর্বজনীন করা হয়। ২০০১ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারা দেশের সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ে রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা চালু করাকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়।[৪]

এমনকি আজও, দেশের বহু অংশে বেশ কিছু শিশুর ক্ষেত্রে স্কুলে যে মিড-ডে মিল দেওয়া হয়, তাই সারা দিনের প্রথম খাবার। বর্তমানে সারা দেশের প্রায় ১১.৫ লক্ষ বিদ্যালয়ের ১০ কোটিরও বেশি শিশু এই মিড-ডে মিল কর্মসূচির আওতাভুক্ত। ২৫ লক্ষেরও বেশি মহিলা, মূলত তপশিলি জাতি, উপজাতি কিংবা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত, এই মিড-ডে মিল প্রকল্পে বিদ্যালয়গুলিতে রাঁধুনি, রান্নাবান্নায় সাহায্যকারীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়াও এর আরও কিছু সামাজিক উপযোগিতা আছে। সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর মধ্যে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করার অভ্যেস গড়ে ওঠা, মিড-ডে মিলের তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এভাবেই বাচ্চার স্কুলের সঙ্গে বাবা-মায়ের যোগাযোগ নিবিড় হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যও এই প্রকল্পের খাবারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকল্পটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে, একথা কখনওই জোর দিয়ে বলা যাবে না। সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি থেকেই গেছে। যেমন, অনিয়মিত জোগান, স্বাস্থ্যবিধির প্রতি উদাসীনতা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, খাদ্যে যথেষ্ট পুষ্টিগুণের অভাব, ঠিক কতজন শিশু মিড-ডে মিল খাচ্ছে সেই সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে

সমস্যা ইত্যাদি। সমালোচকরা একথাও বলছেন যে, মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাপত্র দেখতে গিয়েই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে। যার ফলে তাদের যেটি আসল কাজ, অর্থাৎ পঠনপাঠনের বিষয়ে খামতি থেকে যাচ্ছে। অনেক সময় শিশুরাও স্কুলে আসছে শুধুমাত্র খাবারের টানে। খাওয়া হয়ে গেলেই তাদের মধ্যে অনেকেই পরের ক্লাসের অপেক্ষায় না থেকে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ফলত, তাদের শিক্ষার চাহিদা আদৌ পূরণ হচ্ছে না। এছাড়া জাতপাতের ভিত্তিতে বৈষম্যেরও নজির রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দলিত শিশুদের আলাদা পঙক্তিতে খেতে বসানো হচ্ছে, বা তাদের সঠিক পরিমাণ খাবার-দাবার দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই যে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়, তা হল মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য আধার কার্ড (UID) বাধ্যতামূলক করা হলে এসব সমস্যার কীভাবে সমাধান হবে?

মিড-ডে মিলের কার্যকরিতা বাড়াতে বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার

মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আধার কার্ডের ব্যবহার চালু করতে উদ্যোগী হওয়ার পেছনে সরকারের তরফে এক স্পষ্ট যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। কোনও পরিষেবা, সুযোগসুবিধা অথবা ভরতুকি প্রদানের ক্ষেত্রে উপভোক্তার পরিচয় জ্ঞাপক নথি হিসেবে আধার কার্ডের ব্যবহার সরকারের সরবরাহ প্রক্রিয়াকে সরল করে, তাতে স্বচ্ছতা আনে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এখনও আধার কার্ড তৈরি হয়নি এমন বহু শিশুর মধ্যে UID বিলি করার ব্যবস্থাটিতে বেশ কিছু ফাঁকফোঁকর থেকে গেছে। ফলে এই পদ্ধতি চালু হলে তা বেশি সংখ্যক শিশুর কাছে মিড-ডে মিল পৌঁছে দেওয়ার কাজে সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে তাদের সংখ্যাকে বরং সীমিতই করবে। সেটি নিশ্চয়ই কোনও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হতে পারে না, বিশেষত, সেই কর্মসূচির লক্ষ্য যখন শিশুরা। তাছাড়া, এই ব্যবস্থা অনিয়মিত জোগান, স্বাস্থ্যবিধির প্রতি উদাসীনতা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, খাদ্যে যথেষ্ট পুষ্টিগুণের অভাব প্রভৃতি সমস্যার উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। তাই আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে কোন বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনা হচ্ছে বা কার কাছে কোন দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সে বিষয়টিও সুস্পষ্ট হচ্ছে না। সরকারি বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি স্কুলে পড়ছে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রভাব ফেলবে। কিন্তু স্কুলে মিল পেতে আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করলে তা এই প্রবণতায় কোনও হেরফের ঘটাবে কিনা জানা নেই, কিন্তু খাদ্যের অভাবে যে শিশুটি এখনও অপুষ্টিতে ভুগছে, তাকে অবশ্যই বঞ্চিত করা হবে।

তাছাড়াও, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, দিল্লি ও অন্যান্য যেসব জায়গায়, গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS), পেনসন, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT) প্রভৃতি প্রকল্পে আধারের ব্যবহার চালু হয়েছে, সেখানকার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। প্রকল্প উপভোক্তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ এই ধরনের পরিচয়পত্রের প্রামাণিকতা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানা গেছে। এসবই মোবাইল নেটওয়ার্ক কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার মতো দেশের বিরাটাংশের সাধারণ সমস্যা। এই আদেশের অর্থ কী এই যে, প্রতি দিন মিড-ডে মিল দেওয়ার আগে প্রতিটি শিশুর পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখা হবে? এবং প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার কারণে কিছু শিশুকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে? এই অকর্মণ্যতার জন্য কাকে দায়ি করা হবে?

মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাতে এবং দায়বদ্ধতা বাড়ানোর জন্য সমাজের নজরদারি, সোশ্যাল অডিট, বিকেন্দ্রীকৃত অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা, উপভোক্তাদের নামের তালিকা ও অন্যান্য তথ্যের জনসমক্ষে প্রদর্শন প্রভৃতি চলতি ও সুফলদায়ী পদ্ধতিগুলিকে কাজে লাগানো দরকার। এক অর্থে এই নির্দেশ আমাদের সমাজে শিশুদের প্রতি চলে আসা উপেক্ষাকেই তুলে ধরে। শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ভয়াবহ পরিসংখ্যান থেকে শুরু করে প্রতি নিয়ত যে পরিমাণ হিংসা ও অন্যান্য অন্যায় তাদের সহ্য করতে হচ্ছে সেখানে শিশু ও তার অধিকার উভয়ই ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়েই চলেছে। অন্তত একটা প্রকল্প সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করলেও আমরা সেখানে এমন এক ব্যবস্থা চালু করতে চলেছি, যার ফলে ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক প্রভাবই পড়বে বেশি। আমাদের দুর্নীতি, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বোঝা আমাদের ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে তাদের কাঠগড়ায় তোলার পরিবর্তে তারা যাতে বেড়ে ওঠার জন্য একটা সুস্থ, সুন্দর, সযত্নে লালিত পরিবেশ পায়, যেখানে তারা গরম গরম খাবার, সুশিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যদের সহমর্মিতা পাবে, সেদিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। এখন সময় এসেছে একটু থামার এবং ভেবে দেখার, এই সামাজিক চুক্তি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? সেই সামাজিক চুক্তি, যা কিনা আমরা এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের নাগরিকদের, বিশেষত আমাদের শিশুদের সঙ্গে সম্পাদন করেছি। ডিজিট্যাল স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার মোহে আমরা কি তাদের সামাজিক সুরক্ষাকেই বলির পাঁঠা করতে চলেছি?❑

---

১ সামাজিক চুক্তির ধারণাটি প্লেটোর সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, বিশেষত, হবস, লক ও রুশোর মতো রাজনৈতিক দার্শনিকদের লেখার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। এই ধারণাটি সম্যকভাবে গড়ে তোলার পিছনে এই তিন দার্শনিকের সামগ্রিক অবদান রয়েছে।

২ Gillespie, S., "Myths and Realities of Child Nutrition", Economic and Political Weekly, আগস্ট ২৪, ২০১৩ খণ্ড ৪৮, সংখ্যা ৩৪।

৩ Afridi, Farzana, Bidisha Barooah and Rohini Somanathan (2013), "School Meals and Classroom Effort : Evidence from India" Working paper, International Growth Centre।

৪ এই যুগান্তকারী রায়ে বলা হয়, প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে দুপুরে বাচ্চাদের রান্না করা খাবার দিতে হবে। যেসব রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু নেই, সেখানে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এর মধ্যে রাজ্যের অর্ধেক জেলায় এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ২৮ মে, ২০০২-এর মধ্যে বাকি জেলাগুলিতেও তা চালু করতে হবে।

নীতি আয়োগের প্রথম প্রয়োগ পরিকল্পনার খসড়া : জোর সামাজিক সুরক্ষায়

অনিন্দ্য ভুক্ত

মোটামুটিভাবে প্রয়োগ পরিকল্পনার খসড়াপত্র উন্নয়নের বিবিধ প্রসঙ্গকে ছুঁয়ে গেছে। অর্থনীতির যাবতীয় সমস্যারই সমাধান করতে চাওয়া হয়েছে। একথা সত্যি, উন্নয়নের পথে থাকে অজস্র সমস্যা। একথাও সত্যি, যখন দেশের হাতে অর্থের অভাব ছিল, পরিকল্পনার যুগের প্রথম দিকে, তখন কিছু সমস্যাকে বাছাই করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এখন ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ-সামর্থ্য অনেক বেড়েছে। তবুও, একই সঙ্গে এত সব সমস্যার সমাধান চাইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় না কি?

অবশেষে অবসান হল ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগের। দীর্ঘ ছেষট্টি বছর পর। ব্রিটিশ-পরিত্যক্ত ছন্নছাড়া অর্থনীতিকে সাজিয়ে গুছিয়ে উন্নয়নের রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ১৯৫১ সালের পয়লা এপ্রিল শুরু হয়েছিল যে যাত্রার, তার অবসান হল ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ।

প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠতেই পারে, তবে কি আর অর্থনীতিকে পরিকল্পনা করে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই? বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হতে পারে না। এক্ষেত্রে হয়ওনি। প্রথম বাক্যটিকে অতএব ঈষৎ পরিবর্তন করে লেখা উচিত : অবশেষে অবসান হল ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগের।

১৯৫০ সালে ভারতে পরিকল্পনা কমিশনের জন্ম। এই কমিশনের হাত ধরেই এ দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত ১৯৫১ সালে। দু' বছর আগে, ২০১৫ সালের পয়লা জানুয়ারি, পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্ত হিসেবে জন্ম নেয় নীতি (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমিং ইন্ডিয়া) আয়োগ। অবশ্য তার আগেই, ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লায়, তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী, পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করেন। তখন থেকেই পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল; অতঃপর কী? সেই প্রশ্নেরই জবাব মিলল সম্প্রতি।

জবাব মিলল, মানে জবাব হিসেবে পাওয়া গেল একই সঙ্গে তিন-তিনটি পরিকল্পনার খসড়া। একটি দিশা পরিকল্পনা (ভিশন প্ল্যান), দ্বিতীয়টি কৌশলগত পরিকল্পনা (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান) এবং তৃতীয়টি প্রয়োগ পরিকল্পনা (অ্যাকশন প্ল্যান)। অর্থাৎ পরিকল্পনা কমিশনকে বিদায় দিয়ে সেই পরিকল্পনার রাস্তাতেই পরিবর্তন। তাহলে তফাৎটা কোথায়? ঠিক তিনটি খসড়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গেছে কেবলমাত্র শেষেরটি। সেটি থেকে তফাৎ বিশেষ বোঝা যাচ্ছে না। তবে দিশা পরিকল্পনার সঙ্গে এযাবৎ প্রচলিত পরিকল্পনাপত্রের একটা তফাৎ তো থাকার কথা। প্রচলিত পরিকল্পনাপত্রে থাকত কিছু লক্ষ্যের কথা, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত কিছু কার্যক্রমের কথা, সেই কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ কত প্রয়োজন, সেই অর্থ কোত্থেকে আসবে সেই সব কথা। দিশাপত্রে কিন্তু থাকার কথা বৃহত্তর কোনও লক্ষ্যের কথা, সেই লক্ষ্যের অর্জন অর্থনীতিতে কী সমস্যা ডেকে আনতে পারে, তৈরি করতে পারে কী কী সম্ভাবনা, সেসব কথা।

দিশা পরিকল্পনাপত্রটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে এখনও পর্যন্ত সরকারি তরফে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য দিশারও সন্ধান মেলেনি। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'স্বচ্ছ ভারত' বা 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মতো যে সমস্ত সরকারি স্লোগান তোলা হয়েছে সেগুলির চরিত্র ক্ষেত্রগত (সেন, ২০১৭)।

[লেখক আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক।]

মোদী সরকারের স্লোগানগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল 'সবকা সাথ, সব কা বিকাশ'। বলাবাহুল্য, এই দিশার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। বিশেষ কোনও তফাৎ দুইয়ের মধ্যে নেই।

দিশাপত্রটির মেয়াদ হবে পনেরো বছরের। অর্থাৎ যিনি দিশার সন্ধান দেবেন তাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। আগামী দিনে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কী হতে পারে এই সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকলে এই দিশা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সাধারণভাবে কোনও আমলা শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই ধারণা ততটা থাকে না, যতটা থাকে রাজনীতিবিদদের মধ্যে। এর কারণ রাজনীতিবিদরা মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করেন। কিন্তু নীতি আয়োগে পরিকল্পনা রচনায় মুখ্য দায়িত্বটা তুলে দেওয়া হচ্ছে আমলা শ্রেণিরই হাতে। আমলা শ্রেণি কৌশলগত পরিকল্পনা বা প্রয়োগ পরিকল্পনা রচনায় দক্ষ হতে পারেন, দিশা পরিকল্পনা রচনায় নন। তাছাড়া শেষপর্যন্ত সরকার চলে তো রাজনীতিবিদদের মর্জিমাফিকই। তাই দিশা নির্ধারণ যদি সেই জায়গা থেকে হয় তাহলে পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণে তাগিদটা যতটা থাকে, ততটা থাকে না আমলা শ্রেণির হাত থেকে দিশা নির্ধারিত হয়ে বেরিয়ে এলে।

দিশাপত্র নিয়ে এতগুলি কথা বলার কারণ আছে। এমন তো নয় যে, এত দিন পরিকল্পনাপত্রগুলি দিশাহীন ছিল। দিশার কথা সেখানেও থাকত। একটু বিস্তারিতভাবে থাকত অ্যাপ্রোচ পেপারগুলিতে। কিন্তু এখন যখন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একটি দিশাপত্র প্রকাশের কথা হচ্ছে তখন তার গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে যায়। দিশাপত্রে যেমন একটি সুস্পষ্ট, সুবোধ্য দিশার উল্লেখ্যের প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন আছে এমন দিশার উল্লেখ্যের যা পরিমাপযোগ্য হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যদি দূষণমুক্ত উন্নয়নের কথা বলা হয় তাহলে কৌশলগত পরিকল্পনাপত্রে দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং দেশ যাতে সেই মাত্রার মধ্যে দূষণকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে তা সুনিশ্চিত করা হবে প্রয়োগ পরিকল্পনার কাছে। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। তবে এমন উদাহরণের নিদর্শনও আছে। ইন্দিরা গান্ধী যখন পঞ্চম পরিকল্পনার দিশা হিসেবে 'গরিবি হঠাও'-এর স্লোগান তুলেছিলেন তখন পরিকল্পনাকারেরা প্রথমে 'দারিদ্র্য'-এর পরিমাপযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন, তারপর সেই দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিলেন।

প্রয়োগ পরিকল্পনা

হিসেব মতো প্রথমে প্রকাশিত হওয়ার কথা দিশাপত্রের, তারপর কৌশলগত পরিকল্পনার এবং সব শেষে প্রয়োগ পরিকল্পনার। কিন্তু এক্ষেত্রে শুরু হয়েছে উল্টো দিক থেকে। প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে তিন বৎসর (২০১৭-'১৮ থেকে ২০১৯-'২০) মেয়াদি প্রয়োগ পরিকল্পনাটি এবং এক্ষেত্রেও ভূতপূর্ব পরিকল্পনা কমিশনের গয়ংগচ্ছ মনোভাবটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি নবীন নীতি আয়োগ। যুক্তিক্রম ভেঙে প্রয়োগ পরিকল্পনাটি প্রথমে প্রকাশ করার কারণ ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যাচ্ছিল দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদসীমা। তারপর সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত, উদ্দেশ্যহীনভাবে অর্থনীতিকে এগোতে না দেবার ভাবনা থেকেই তড়িঘড়ি প্রকাশ করে দেওয়া হল প্রয়োগ পরিকল্পনাটি। প্রকাশ করা হল অবশ্য ২৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের তৃতীয় গভর্নিং কাউন্সিলের মিটিংয়ে। ততদিনে অবশ্য শেষ হয়ে গেছে পুরোনো পরিকল্পনার মেয়াদসীমা। একথা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, বিষয়টি খেয়াল ছিল না নীতি আয়োগের। আসলে পরিকল্পনার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালই এই রকম। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ক্ষেত্রেও মেয়াদসীমা শুরু হয়ে যাবার পর পেশ হ'ত খসড়াগুলি।

কেবল দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য নয়, খসড়া প্রয়োগ পরিকল্পনার কাঠামোতেও বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে। মোট সাতটি পর্বে বিভক্ত এই খসড়াটি। প্রথম পর্বে আছে আগামী তিন বছরের প্রত্যাশিত আয়ের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ব্যয়-বণ্টনের হিসাব। এই হিসাবটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে ২০১৮-'১৯ সালে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণটি ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী ৩ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রস্তাবে উন্নয়ন-বহির্ভূত খরচকে কমিয়ে উন্নয়নমূলক খরচ বাড়ানোর লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে, এর ফলে ২০১৯-'২০ সাল নাগাদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, রেল, সড়ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত ব্যয় বৃদ্ধি করা যাবে।

খসড়ার দ্বিতীয় পর্বে আছে প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির আর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ। প্রথমেই আলোচিত হয়েছে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে তোলার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের প্রসঙ্গটি। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে হলে বাড়াতে হবে কৃষি উৎপাদনশীলতা। ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে অন্তরায়গুলি ছিল সেগুলিকে এখনও সম্পূর্ণ দূর করে ওঠা যায়নি। এর মধ্যে আছে স্বল্পায়তনের জোতের সমস্যা, অপ্রতুল সেচ সুবিধার সমস্যা, কৃষিপণ্য বিক্রয়জনিত সমস্যা ইত্যাদি। ২০১০-'১১ সালের কৃষি সেনসাস অনুযায়ী এখনও দেশের ৪৭ শতাংশ জোতের আয়তন আধ হেক্টরেরও কম। এই পরিমাণ জোতজমি নিয়ে পাঁচ জনের সংসার চালাতে হলে অন্য কাজ দেখতে হয়। আর তা দেখতে গিয়ে জমি থাকছে পতিত হয়ে। জমি লিজে দেবার যে আইন তার জটিলতায় জমি লিজ দিতেও ভরসা পাচ্ছে না চাষিরা। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নতুন আইনের কথা বলা হয়েছে।

কৃষিপণ্যের বিক্রয়জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেটিং কমিটি অ্যাক্ট-এর সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। জোর দিতে বলা হয়েছে চাষি যাতে সরাসরি ক্রেতার কাছে পৌঁছে যেতে পারে সেরকম পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর। চাষিদের বিক্রয়জনিত ক্ষতি সামাল দেবার জন্য বর্তমানে চালু আছে ন্যূনতম সহায়ক দাম ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থাটিও দেশের সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে না। এর জন্য নতুন একটি পদ্ধতি 'প্রাইস ডেফিশিয়েন্সি পেমেন্ট' চালু করার কথা বলা হয়েছে।

অর্থনীতির পরিবর্তনের জন্য আর যে সমস্যাটি জরুরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি কর্মহীনতা সংক্রান্ত। তবে ভারতের সমস্যা যত না কর্মহীনতার, তার চেয়ে বেশি প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার। এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির উৎপাদনশীলতা কমছে। যেটা একজনের কাজ সেটা দু'জনে করলে এমনটাই হওয়ার কথা। ২০১১-'১২ সালের এনএসএসও এমপ্লয়মেন্ট-আনএমপ্লয়মেন্ট সার্ভের তথ্য বলছে দেশের শ্রমবাহিনীর ৪৯ শতাংশ নিযুক্ত কৃষিক্ষেত্রে, কিন্তু ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ১৭ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। শিল্পক্ষেত্রেও ছবিটা অন্যরকম কিছু নয়। ছোটো সংস্থা, যাদের কর্মচারীর সংখ্যা কুড়ির বেশি নয়, যারা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তারা ওই ক্ষেত্রের ৭২ শতাংশ কর্মচারী ব্যবহার করে উৎপাদন করে মোট ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদনের ১২ শতাংশ মাত্র। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে সংগঠিত বৃহৎ শিল্প গঠনের মাধ্যমে।

খসড়ার তৃতীয় পর্বে আছে আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ। অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য গ্রাম এবং শহর, দুইয়ের উন্নতি সমানভাবে প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এটা করতে না পারলে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিক কাজ পাবে না। এর জন্য শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে, কর্মদক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে, পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে। পাশাপাশি নগরায়নের দিকেও নজর না দিলে অর্থনীতির আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে ওঠা যাবে না।

খসড়ার চতুর্থ পর্বের আলোচনার বিষয়বস্তু বিকাশ-সহায়ক বিষয়গুলি। অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত বিষয়ের উপর নজর দিতে বলা হয়েছে সেগুলি হল পরিকাঠামো, ডিজিটাল যোগাযোগ, শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এসব ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে।

খসড়া প্রয়োগ পরিকল্পনার পঞ্চম পর্বের শিরোনাম : সরকার। এই পর্বে অর্থনীতির উন্নয়নে সরকারের এযাবৎ ভূমিকাকে পালটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সরকারকে উৎপাদনের রাস্তা ছেড়ে গণপরিষেবা সরবরাহের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। নজর দিতে হবে দুর্নীতি প্রতিরোধে, কালো টাকার সৃষ্টি বন্ধ করতে। কালো টাকা সৃষ্টির রাস্তা বন্ধ করতে কর কাঠামো সংস্কার করতে হবে।

খসড়ার ষষ্ঠ পর্বে আছে সামাজিক ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পৃথক আলোচনা করব। সপ্তম পর্বের বিষয় : দীর্ঘস্থায়ীত্ব। পরিবেশের সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন সেগুলির দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা যাবে তেমনই পরিবেশের দূষণের মাত্রাকেও কমিয়ে রাখা যাবে।

মোটামুটিভাবে প্রয়োগ পরিকল্পনার খসড়াপত্র উন্নয়নের বিবিধ প্রসঙ্গকে ছুঁয়ে গেছে। অর্থনীতির যাবতীয় সমস্যারই সমাধান করতে চাওয়া হয়েছে। একথা সত্যি, উন্নয়নের পথে থাকে অজস্র সমস্যা। একথাও সত্যি, যখন দেশের হাতে অর্থের অভাব ছিল, পরিকল্পনার যুগের প্রথম দিকে, তখন কিছু সমস্যাকে বাছাই করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এখন ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ-সামর্থ্য অনেক বেড়েছে। তবুও, একই সঙ্গে এত সব সমস্যার সমাধান চাইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় না কি?

সামাজিক সুরক্ষা

প্রধানমন্ত্রীর যে স্লোগানের উল্লেখ আমরা ইতোপূর্বে করেছি সেই শ্লোগানের উল্লেখ আছে খসড়াপত্রের ষষ্ঠ পর্বে। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'। কিন্তু যে দেশে আয় বৈষম্যের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ের সেখানে বিকাশের সুফল সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে সামাজিক সুরক্ষার দিকে সরকারকে বিশেষ নজর দিতেই হবে। ঠিক এই কারণেই সরকারকে উৎপাদনমুখী কাজকর্ম থেকে সরে এসে পরিষেবামূলক কাজে বেশি মনোনিবেশের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কীভাবে দেওয়া যেতে পারে? ভাতা বা ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে, একশো দিনের কাজের মতো সাময়িক কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করে দরিদ্র্য মানুষকে সুরক্ষা দেবার একটা পদ্ধতি চালু আছে। কিন্তু এভাবে স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। খসড়া পরিকল্পনায় তাই জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষা, কর্মদক্ষতা বিকাশ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় মানুষের উপার্জন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, সেগুলির উপর। পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে মেয়েদের নানাবিধ সমস্যা দূর করার মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর উপর।

মেয়েদের নানাবিধ সমস্যা বলতে তাদের শিক্ষার অভাব, আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ, সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি। মেয়েদের আর্থনীতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা যাতে স্কুল কলেজে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বেশি পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। এনএসএসও-র ৬৮-তম সমীক্ষা অনুযায়ী, ছেলেদের মধ্যে এই শিক্ষার বিস্তার যেখানে ২৯ শতাংশ মেয়েদের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৬.৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে মেয়েদের অগ্রগতির হিসেবটুকু রাখার জন্য একটি "উইমেন'স ওয়েল-বিয়িং ইনডেক্স" তৈরি করার কথাও বলা হয়েছে।

মেয়েরা ছাড়া, অর্থনীতির এগিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষেরা, সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষেরা। শিক্ষার মাধ্যমে এদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর তারা যাতে অন্তত স্বনিযুক্তির বন্দোবস্ত করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

শেষের কথা

নীতি আয়োগের পুরো নাম থেকেই পরিষ্কার অর্থনীতির ভোল বদলে দেবার জন্যই জন্ম এই সংস্থাটির। কেমন সে বদল? ১৯৯১ সালে আর্থনীতিক সংস্কারের পর থেকেই সরকারের লক্ষ্য : 'মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স'। সে কথা স্পষ্ঠভাবে উচ্চারিতও হয়েছে খসড়াপত্রে। আর এই লক্ষ্য পূরণের অর্থই হল মানুষের জন্য সরকার তৈরি করা। কাজটা সহজ নয় কিন্তু। সময় বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। সেই বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। যদি পারা যায়, তবেই নীতি আয়োগ সার্থকনামা হয়ে উঠবে।❑

অসংগঠিত শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা, কোন পথে?

রুমা ঘোষ

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক, দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় আইনগুলির সরলীকরণ, সংযুক্তিকরণ ও বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, কর্মচারী বিমা আইন, প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন, গ্রাচ্যুইটি প্রদান আইন, কর্মচারী ক্ষতিপূরণ আইন, অসংগঠিত সামাজিক সুরক্ষা আইন এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেস/ফান্ড আইনের মতো ১৫-টি আইনকে সংযুক্ত করে এর পরিবর্তে একটি সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

যে কোনও যথাযথ, নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল সামাজিক সুরক্ষা। সেজন্যই সামাজিক সুরক্ষার অধিকার, মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২২ ও ২৫ নং ধারা অনুসারে সামাজিক সুরক্ষা এক মৌলিক অধিকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ১৯৫২ সালে সামাজিক সুরক্ষা (ন্যূনতম মান) সনদ ১০২ গ্রহণ করে। এতে সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম সুযোগসুবিধাগুলি সুনিশ্চিত করতে ন'টি সংস্থানের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে পড়ছে চিকিৎসার সুযোগ, অসুস্থতাকালীন সুযোগসুবিধা, কর্মহীন অবস্থায় প্রাপ্য সুযোগসুবিধা, বার্ধক্যকালীন সাহায্য, কর্মরত অবস্থায় আহত হলে প্রাপ্য সুযোগসুবিধা, পরিবার সংক্রান্ত সহায়তা, প্রসূতি ও মাতৃত্ব অবস্থাকালীন প্রাপ্য সুবিধা, প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগসুবিধা এবং বেঁচে থাকার জন্য সুযোগসুবিধা।

ভারত আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন, ILO-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ILO এবং রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি ভারত অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং সাম্প্রতিককালে গৃহীত সুস্থায়ী বিকাশ লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)-র অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সামাজিক সুরক্ষা (ন্যূনতম মান) সনদ, ১৯৫২-র ১০২ নং ধারা অনুসারে দেশে একটি সুসংগঠিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। এর আওতায় মূলত সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাই পড়েন। নির্দিষ্ট মাত্রার থেকে বড়ো মাপের বেসরকারি সংস্থা এবং আকার-আকৃতি নির্বিশেষে যে কোনও সরকারি সংস্থায় এই বিধিনিয়ম প্রযোজ্য। সংগঠিত ক্ষেত্রের ঠিকা শ্রমিকরা আংশিক ভাবে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কিছু সংস্থার শ্রমিকরাও এই নিয়মের আওতায় প্রাপ্য সুবিধা ভোগ করেন। তবে ভারতীয় অর্থনীতির ভরকেন্দ্র যে অসংগঠিত ক্ষেত্র, যেখানে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৪ শতাংশ শ্রমিকের কর্মনিযুক্তি ঘটে, তার সিংহভাগই এখনও সার্বিক সামাজিক সুরক্ষার সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত।

ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্র

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তর (NSSO)-এর ৬৮তম রাউন্ডের হিসাব অনুসারে, দেশের প্রায় ৮৪ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় পড়েন, ৯০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক লিখিতপড়িতভাবে কাজে নিযুক্ত নন (সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয়ক্ষেত্র মিলিয়ে)। NSS-এর 'অসংগঠিত ক্ষেত্র ও ভারতে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি ২০১১-১২' শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ এলাকায় স্বনির্ভর ব্যক্তিদের প্রায় ৯৮ শতাংশ, ঠিকা শ্রমিকদের ৭৮ শতাংশ এবং নিয়মিত মজুরি প্রাপক বা বেতনভুক কর্মীদের ৪২ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। শহুরে এলাকায় এই হিসেবটা যথাক্রমে ৯৮,

[লেখক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের অধীন 'ভি.ভি. গিরি জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান'-এর ফ্যাকাল্টি সদস্য। ই-মেল : rumaghosh.vvgnli@gov.in]

৮১ এবং ৪০ শতাংশ। তথ্যে আরও প্রকাশ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং শহুরে এলাকার ৭০ শতাংশই কাজ করেন ছোটো ছোটো সংস্থায়। কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্র মিলিয়ে ৭৯ শতাংশ শ্রমিকের সঙ্গে কাজের কোনও লিখিত চুক্তি করা হয় না, ৪২ শতাংশ শ্রমিক অস্থায়ী, ৬০ শতাংশ ঠিকা কর্মী এবং মাত্র ২৮ শতাংশ নিয়মিত মজুরি বা বেতনভুক কর্মী। সব মিলিয়ে ৭২ শতাংশ কর্মী কোনওরকম সামাজিক সুরক্ষায় সুবিধা পান না। ঠিকা শ্রমিকের ক্ষেত্রে এই হার ৯৩ শতাংশ এবং নিয়মিত বেতনভুকদের ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশ। মোটের ওপর বলতে গেলে, সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে যেভাবে কর্মী নিয়োগ করেন, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সেই সুবিধা আদৌ পান না। তারা প্রায় সবাই বাড়িতে বসে কাজ করেন, স্বনির্ভর অথবা দিনমজুর।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের একটা বিশাল অংশই অসংগঠিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। গত দু'দশক ধরে ভারতীয় অর্থনীতির উচ্চ বিকাশ হারের পাশাপাশি এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যাপ্তিও ক্রমশ বড়ো বেশি চোখে পড়ছে। সংগঠিত ও অসংগঠিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সংযোগের ইঙ্গিত ক্রমশই প্রকট হচ্ছে। উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও উপার্জনের নিরিখে অসংগঠিত অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত বেশ নজরে আসছে। দ্রুত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তাই অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। উচ্চ বিকাশ হার ধরে রাখতে গেলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে হবে এবং সেজন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের ঋণ, দক্ষতা, প্রযুক্তি, বিপণন ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত চাহিদা পূরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাছাড়া এই ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সিংহভাগেরই কোনও সামাজিক সুরক্ষা নেই। সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র, অর্থাৎ নিজেদের উপার্জনের কিছুটা অংশ মাশুল হিসেবে দিয়ে কোনও সামাজিক বিমা প্রকল্প অথবা কর বা

সেসের টাকা থেকে কোনও সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাও বিশেষ চোখে পড়ে না। বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সামনে গত এক শতাব্দী জুড়ে এই চ্যালেঞ্জটাই সবথেকে বড় হয়ে উঠেছে।

সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৭ শতাংশ অধিকার করে রয়েছেন। কর্মচারী রাজ্য বিমা আইন, ১৯৪৮, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি ও বিবিধ সংস্থান আইন, ১৯৫২-এর মতো বিভিন্ন আইনের আওতায় তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার নানা ব্যবস্থা রয়েছে। যে দু'টি আইনের উল্লেখ করা হল, তার একটিতে শ্রমিকদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিমা এবং অন্যটিতে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় ৪৭ কোটি ২৯ লক্ষ শ্রমিক কাজের নিরাপত্তা, মজুরি, কর্মস্থলের পরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অনিয়মিত মরসুমভিত্তিক কাজের সুযোগ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাজের জায়গা, কর্মস্থলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের আলগা বুনোট, অনিয়মিত এবং প্রায়শই অতিদীর্ঘ কাজের সময়, ঋণের সুবিধা না পাওয়া, আইনি সহায়তা ও সরকারি আনুকুল্যের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণ রয়েছে এর পিছনে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির জন্য গঠিত জাতীয় কমিশন (NCEUS) জানাচ্ছে, এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সামাজিক সুরক্ষার মূল তিনটি সুবিধাই পান না। এগুলি হল, চাকরির সুরক্ষা (মালিক চাইলেই যে কোনও সময়ে এদের ছাঁটাই করতে পারে), কাজের সময় সুরক্ষা (কর্মস্থলে দুর্ঘটনা বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হলে কোনও নিরাপত্তা নেই) এবং সামাজিক সুরক্ষা (চিকিৎসা, পেনসন, প্রসূতি ও মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা)। এই সমস্যা দূর করতে, আগামী দিনের জনবিন্যাসগত প্রবণতা ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে ক্রমশ বেড়ে চলা শ্রমিকের অংশভাকের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত সরকার ২০০৮ সালে ঐতিহাসিক "অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইন (UWSSA)" প্রণয়ন করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তির জন্য ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা; যাতে তারা আয় ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে পারেন, দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পান এবং সর্বোপরি, সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারেন। কিন্তু এই আইন অধিকারের সনদ হিসাবে থেকে গেলেও এর রূপায়ণ এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান নিয়ে তেমন কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। আইনে

কেবলমাত্র জাতীয় ও রাজ্য স্তরে সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই পর্ষদগুলির আইনি ক্ষমতাও নেই, চরিত্রগতভাবে এগুলি উপদেষ্টা পর্ষদ মাত্র।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা

বর্তমানে দেশে সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো দু'টি স্তরে কাজ করছে। প্রথম স্তরে সর্বজনীন কিছু কর্মসূচি ও প্রকল্প রয়েছে। সাক্ষরতা অভিযান, সর্বশিক্ষা অভিযান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল ও নিকাশি, কারিগরি প্রশিক্ষণের মতো মৌলিক সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন এর লক্ষ্য। দ্বিতীয় স্তরে আছে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প, গণবণ্টন ব্যবস্থা, NSAP, একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলি। এগুলি কাজের চরিত্র নির্বিশেষে অসহায়, প্রান্তিক নাগরিকদের দিকে সুরক্ষা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি ও প্রকল্প থাকলেও অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো এখানেও স্বাস্থ্যহানি, দুর্ঘটনা, মৃত্যু ও বয়োবৃদ্ধিজনিত সমস্যার মোকাবিলায় যথাযথ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নাগাল পর্যন্ত পৌঁছয় না। যাবতীয় সামাজিক সুরক্ষা তার আইনি পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে কেবল সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্যই। তাই বিপর্যয়ের সময়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা যাতে সামাজিক বিমার সুবিধা পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। দেশে দরিদ্র মানুষের অনুপাত কমতে থাকলেও অধিকাংশ গরিব মানুষ যে অসংগঠিত ক্ষেত্রেই কাজ করেন, এই তথ্য মাথায় রাখলে বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সামাজিক সুরক্ষার অভাব শ্রমিকদের উৎপাদন-শীলতাকেও ব্যাহত করে। অসুস্থ হলে শ্রমিক তো কাজ করতে পারেন না-ই, তার ওপর চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে তার পরিবারকে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। তাই অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কথাটার বিশেষ কোনও অর্থ থাকে না।

দেশের বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা যে সব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেগুলি হল : ১) নীতি, প্রকল্প ও ভারপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি বহুধাবিভক্ত, ২) এর আওতা ও প্রসারতার দুর্বলতা, ৩) অপ্রতুল সুযোগসুবিধা, ৪) বিচ্ছিন্নতা, ৫) রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঘাটতি (এবং নির্বাচনের), ৬) বিপুল ব্যয় এবং ৭) বিশাল সংখ্যক শ্রমিক, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এর বাইরে রাখা।

এইসব বিষয় মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক, দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় আইনগুলির সরলীকরণ, সংযুক্তিকরণ ও বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, কর্মচারী বিমা আইন, প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন, গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, কর্মচারী ক্ষতিপূরণ আইন, অসংগঠিত সামাজিক সুরক্ষা আইন এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেস/ফান্ড আইনের মতো ১৫-টি আইনকে সংযুক্ত করে এর পরিবর্তে একটি সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এই নির্দেশিকাতে একটি ত্রিস্তরীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপত্র কাঠামোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে তিনটি পক্ষ থাকবে। ১) প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা পরিষদ, ২) কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদ, ৩) রাজ্য স্তরে সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদ। তৃণমূল স্তরে সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা পৌঁছে দিতে এতে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকেও সামিল করা হয়েছে। এরা নথিভুক্তিকরণ-সহ নানা কাজ করতে পারে, এদেরকে চতুর্থ স্তর হিসাবেও গণ্য করা যায়। আধার কার্ডের ভিত্তিতে শ্রমিকদের নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করা হবে। নথিভুক্তির পরেই প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য বিশ্বকর্মা কর্মিক সুরক্ষা খাতায় খোলা হবে পৃথক অ্যাকাউন্ট। এর সঙ্গে আধারের সংযোগ থাকবে। এই অ্যাকাউন্টে শ্রমিকের জমা দেওয়া টাকা, তার প্রাপ্য সুযোগসুবিধার সব হিসাব থাকবে। শ্রমিক কাজের তাগিদে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলেও এই তথ্য বিনষ্ট হবে না। সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে এই নতুন যুগের সূচনা কেবল নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের শুভেচ্ছার নিদর্শন হয়েই থাকবে না, এটি দেশের প্রত্যেক শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার হয়ে উঠবে। ❑

সামাজিক সুরক্ষা : কর্পোরেট জগতের দায়িত্ব

যতীন্দর সিং

অতীতে এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে অনেক জনগোষ্ঠী, অনেক সম্প্রদায় বাদ পড়ে গেছে। বিকাশ প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বাদ দেওয়ার এই যে শতাব্দী প্রাচীন উত্তরাধিকার তা থেকে বেরিয়ে এসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত করতে এখনও সময় লাগবে। সকলকে শামিল করে উন্নয়নের যে মন্ত্র, 'সকলের সাথে সকলের বিকাশ' (সব কা সাথ, সব কা বিকাশ) তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মেলবন্ধন ঘটবে।

মানুষজন এই গ্রহ তথা আর্থিক মুনাফার ওপর বিভিন্ন সংস্থা যে প্রভাব সৃষ্টি করে তার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে। এটাই কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্বের ধারণার (Corporate Social Responsibility CSR) মূলকথা। কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের বিষয়ে বিশ্বে ভারতই প্রথম কোনও আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ২০০৯ সালে কর্পোরেট সংস্থাগুলির এই সামাজিক দায়িত্বের (CSR) বিষয়ে কিছু ঐচ্ছিক নির্দেশিকা জারি করেছিল। পরে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনে এই নির্দেশিকাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনের ১৩৫নং ধারার ১নং উপধারার আওতাভুক্ত সংস্থাগুলিকে কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেসব সংস্থাকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার মধ্যে পড়ছে :

১) যে সমস্ত সংস্থার মোট আর্থিক মূল্য ৫০০ কোটি টাকা বা তার বেশি, অথবা;

২) যে সমস্ত সংস্থার বার্ষিক টার্নওভার ১০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি, অথবা

৩) যে সমস্ত সংস্থার মোট মুনাফা ৫ কোটি টাকা বা তার বেশি।

হিসাবানুযায়ী, এই আইনের বেঁধে দেওয়া শর্ত সাপেক্ষে মোটামুটি ৮ হাজার সংস্থার ওপর এই দায়দায়িত্ব (CSR) পালনের বাধ্যবাধকতা বর্তাচ্ছে। এই আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় মুনাফার অন্তত পক্ষে ২ শতাংশ CSR কর্মকান্ডে ব্যয় করবে। এই পরিসংখ্যান মেনে নিলে এই কাজে বছরে ১০-১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GPP-র বৃদ্ধি এবং তার হাত ধরে সংস্থাগুলির মুনাফা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক ভিত্তিতে এই ধরনের বাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডের খাতে ব্যয় আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩৫ ধারা অনুযায়ী, একজন স্বাধীন পরিচালক-সহ অতিরিক্ত তিনজন পরিচালককে নিয়ে পরিচালন পর্ষদে একটি আলাদা CSR কমিটি গঠন করবে সংস্থাগুলি। সপ্তম তপশিলে বিবৃত CSR কর্মকান্ডগুলিকে নিয়ে একটি নীতি প্রণয়ন করবে এই কমিটি।

নিজস্ব সংস্থা বা ট্রাস্টের মাধ্যমে এই ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি। কিংবা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নিয়েও এই কাজ তারা করতে পারে। অথবা অন্য কোনও সংস্থার সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে দু'তরফের তহবিল একত্রিত করে CSR কর্মসূচি পালন করতে পারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি। তবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের এই কর্মসূচি সংস্থাগুলির কাছে যেন শুধু আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা হয়ে না দাঁড়ায়। সমাজের যারা অনগ্রসর, সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত এটা যেন তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত

[লেখক PHD Chamber of Commerce and Industry (নতুন দিল্লি)-র বরিষ্ঠ সচিব ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান। ই-মেল : jatinder@phdcci.in]

করার অঙ্গীকার হয়ে ওঠে, সে বিষয়টির ওপর কিন্তু বার বার জোর দেওয়া হয়েছে CSR বিষয়ক নীতিতে।

কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্ব : ক্ষমতায়নের এক নতুন পথ

সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি, তথা তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকেই বলা যেতে পারে ক্ষমতায়ন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের প্রধান দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে দ্রুত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া তথা অন্যদের কাছে একাজের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলিরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কোনও একটি বাণিজ্য সংস্থা যে জায়গায় গড়ে ওঠে, তার আশেপাশের জনগোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করেই তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলে। ফলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত নানা সমস্যা বা ইস্যুর কথা উক্ত সংস্থার পক্ষে জানাবোঝা অনেক সহজ। তাই বিভিন্ন CSR প্রকল্পের মাধ্যমে এই ধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কী কী সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, অনেক সহজেই তা ছকে উঠতে পারে সংস্থাগুলি। অতীতে এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে অনেক জনগোষ্ঠী, অনেক সম্প্রদায় বাদ পড়ে গেছে। বিকাশ প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বাদ দেওয়ার এই যে শতাব্দী প্রাচীন উত্তরাধিকার তা থেকে বেরিয়ে এসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে যুক্ত করতে এখনও সময় লাগবে। সকলকে শামিল করে উন্নয়নের যে মন্ত্র, 'সকলের সাথে সকলের বিকাশ' (সব কা সাথ, সব কা বিকাশ) তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মেলবন্ধন ঘটবে। জনকল্যাণ খাতে সরকারের যে বাজেট বরাদ্দ, তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সরকারের যা সামর্থ্য তা দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে ঠিকই, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে জনকল্যাণের প্রতিটি দিকের ওপর সমান নজর দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নতি সাধনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরি। দরিদ্র মানুষের উন্নতিকল্পে শিক্ষা, জীবিকার ব্যবস্থা বা স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme, UNDP) যে মানোন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে ১৮৮-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩১তম। কোনও একটি দেশে মানোন্নয়নের মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্যের মোটামুটি একটা গড় হিসাবকেই তুলে ধরে মানোন্নয়ন সূচক। শুধুমাত্র অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়ে এই পরিসংখ্যানকে উন্নত করা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সার্বিক অবদানেই এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব।

CSR প্রকল্পগুলির মাধ্যমে 'Make in India', 'Start up India', 'Skill India'-এর মতো সরকারের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বহু দিক থেকেই এই কর্মসূচিগুলির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কারণ এই ধরনের কর্মসূচি একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ করে দেয়, তেমনি এগুলিই আবার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও দক্ষতা সম্পন্ন হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

CSR কর্মসূচিতে কর্পোরেট সংস্থাগুলির ভূমিকা

CSR কর্মকাণ্ডগুলি জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থা সরবরাহ শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার মধ্যে (কোনও পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণ পর্যন্ত সমস্ত কর্মকাণ্ড) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়দায়িত্বের এক নতুন ধ্যানধারণা এমন চালু হয়েছে। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসংঘে যে ১৭-টি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal বা SDG) গৃহীত হয়েছিল CSR কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেগুলিকেই বাস্তব রূপ দেওয়া কর্পোরেট সংস্থাগুলির কাছে এখন অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণেই CSR কর্মসূচি ক্রমেই আরও জোরদার হয়ে উঠছে। সংস্থাগুলি একদিকে যেমন আইনের বিধান মেনে চলবে, তেমনই অন্যদিকে তাদের বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ঘটবে। তাহলেই সেটা হয়ে উঠবে যথার্থ এবং সবচেয়ে কার্যকর CSR কর্মকাণ্ড। ভারতে অতীতে যে কোনও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকত সাক্ষরতার প্রসার। কিন্তু আজকের যুগে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকা সংস্থানের বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। শিক্ষা এখন শুধু সাধারণ লেখা বা পড়ার ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এখন দক্ষতাই আসল কথা। জনসম্প্রদায়ের একেবারে নিচের স্তরে দক্ষতাসৃষ্টির ক্ষেত্রে কৌশলগত বিনিয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্যের একেবারে গোড়াতেও সরাসরি প্রভাব ফেলবে।

২০১৬ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'Global Risks Perception Survey' অনুযায়ী, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত দু'টি সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল— সামাজিক অস্থিরতা এবং বেকারত্ব বা আধাবেকারত্ব। এই দুই ঝুঁকিই সমস্ত রকমের পারস্পরিক সম্পর্কিত ইস্যুগুলির অন্তত ৫ শতাংশের জন্য দায়ি। এই পারস্পরিক যোগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে কাজের জন্য অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা বা আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা সহজ হবে নেতৃবৃন্দের পক্ষে। ভারতীয় শিল্পমহলের কর্তাব্যক্তিরা এই ধরনের ঝুঁকি সম্বন্ধে অবহিত এবং সেই অনুযায়ী নিজের CSR কর্মসূচিগুলিকে সাজিয়ে নিচ্ছেন তারা।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য CSR কর্মকাণ্ড

● **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের জন্য জীবিকার সংস্থান :**

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বাড়তি অনেক গুণ রয়েছে। এবং সাধারণভাবে যা ধারণা করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতা বর্তমান তাদের মধ্যে। 'প্রতিবন্ধী' নয়, এই ধরনের ব্যক্তিদের 'দিব্যাঙ্গ' নামে অভিহিত করার ডাক দিয়েছেন তিনি। বিশ্বের প্রতিবন্ধী মানুষজনের একটা বিপুল অংশই রয়েছে ভারতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, এদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হার ২.২১ শতাংশ এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠেরই বাস গ্রামাঞ্চলে। আর্থ-

সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে এদের বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ শিক্ষা, পরিকাঠামো, দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তাদের কাছে খুব কমই পৌঁছয়। অতীতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকাণ্ডের পরিধির ওপরই প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রকল্পগুলি নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমানে সংস্থাগুলি সামগ্রিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি মোকাবিলার চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে সাক্ষরতা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন স্থানে প্রবেশের জন্য সমস্ত বাধার অপসারণ বা এই ধরনের ব্যক্তিদের কর্মনিযুক্তির উপযোগী করে তোলার মতো বিষয়গুলিও CSR কর্মসূচিতে স্থান পেয়েছে।

● **স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ :**

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে বিভিন্ন CSR প্রকল্প; যাতে কাজের সন্ধানে গ্রামাঞ্চলের মানুষজনকে অন্যত্র পাড়ি দিতে না হয়। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার জন্য বাজারের দরজা খুলে দিচ্ছে এই CSR প্রকল্পগুলি। ই-কমার্স উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদক ও কারিগরদের পণ্য বা শিল্পসামগ্রী অনলাইনে বিক্রিরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরামর্শদান বা মেন্টরিং এবং শিল্পোদ্যোগে সহায়তার মাধ্যমে এই কাজে সাফল্য সম্ভব। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধিতে নতুন ধরনের যে সমস্ত CSR কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে, তা এই গোষ্ঠীগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সাফল্যে সহায়ক হবে।

● **প্রবীণ নাগরিক :**

এদেশে একদিকে যেমন যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, তেমনি অন্যদিকে বয়স্ক নাগরিকদের সংখ্যাও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যায় বয়স্ক নাগরিকদের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। বয়স্ক নাগরিকদের এই সংখ্যাটা বছরে ৩.৮ শতাংশ হারে বাড়ছে এবং বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ জুড়েই রয়েছেন এরা। ২০৫০ সালের মধ্যে এই বয়স্ক নাগরিকদের সংখ্যাটা ২৪ কোটিতে পৌঁছে যাবে। এই বয়স্ক মানুষজনকে যে কত রকমের বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে হয় সেকথা সর্বজনবিদিত। নানান শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে বাস্তবজীবনে নানান প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি অর্থকষ্টেও ভুগতে হয় তাদের। তার ওপর রয়েছে বেহাল পৌর পরিকাঠামো। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সার্বিক কল্যাণ এবং বসতবাড়ির প্রয়োজনগুলি মেটে না।

CSR বিধিতে নতুন যে সংশোধনী আনা হয়েছে তার মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য 'বৃদ্ধাশ্রম, ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন এবং সুযোগসুবিধার' বন্দোবস্ত করার পথটি খুলে দেওয়া হয়েছে। সপ্তম তপশিলে এই নতুন ধরনের CSR কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্তি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পরিপূরক হয়ে উঠবে।

● **বস্তি উন্নয়ন :**

শহরাঞ্চলে বস্তি অঞ্চলের বাড়বাড়ন্তের মূলে রয়েছে আদতে দু'টি কারণ—উপযুক্ত আবাসনের অভাব এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ। ২০১১ সালে এদেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা ছিল মোটামুটি ৯ কোটি ৩০ লক্ষ। CSR কর্মকাণ্ডে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি এদেশের শহরগুলিকে বস্তিমুক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। 'স্মার্টসিটি প্রকল্প' সূচনার আগে এদেশে বস্তি সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে হবে। এদেশে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বিকাশের স্বার্থে বস্তিবাসীদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বস্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত CSR প্রকল্পগুলি থেকে শিল্পমহল তথা শহরাঞ্চলের দরিদ্ররা আনুষঙ্গিক অনেক উপকার পাবে।

পরিশেষে

শিল্প সংস্থার একেবারে উঁচুতলা থেকে নিচুতলার ওপর মনোনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মাননোন্নয়নের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে শিল্পকর্তা তথা চিন্তাবিদদের। কারণ ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর এই বিষয়টির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। সংস্থার বাণিজ্যের লক্ষ্যের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বের লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটাতে হবে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে। আর দেশের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে শামিল হওয়ার জন্য এটাই তাদের পক্ষে আদর্শ সময়। সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়ন খাতে ভারত সরকারের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় CSR কর্মকাণ্ডে কর্পোরেট সংস্থাগুলির বছরে মোটামুটি ১০-১২ হাজার কোটি টাকার বাজেটে বরাদ্দ নেহাতই অল্প। এই কারণে উদ্ভাবনমূলক CSR প্রকল্পগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে সেগুলি অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হয় এবং সেগুলিতে প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা যায় এবং এদেশের জনবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির দৃষ্টান্ত অন্যত্রও অনুসরণ করা যায়। CSR তহবিলের কিছুটা অংশ এই CSR প্রকল্পেরই গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে পারে কর্পোরেটগুলি।

সামাজিক ক্ষেত্রে চিন্তার প্রধান বিষয়টাই হল সমস্যার বিশাল ব্যাপ্তি। CSR কর্মসূচির নতুন নতুন দৃষ্টান্তগুলি সরকারি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলে তার দীর্ঘস্থায়ী সুফল মিলবে। কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্বের পাশাপাশি কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক উদ্ভাবনের কাজও চলতে পারে। উদ্ভাবনমূলক এই প্রকল্পগুলির সাহায্যে সামাজিক ক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে যদি নতুন করে বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে শামিল করার ক্ষেত্রে এই কৌশল দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখবে। কর্পোরেটগুলি সম্পদ সৃষ্টি করে এবং তারই একটা অংশ CSR খাতে বরাদ্দ হয়। তাই লাভজনক এবং উদ্ভাবনমূলক CSR প্রকল্পের পরিকল্পনার জন্য কর্পোরেট ক্ষেত্রকে তার বিপুল সহায়সম্পদ এবং সাংগঠনিক দক্ষতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। সকলকে নিয়ে বিকাশের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে এমন এক পরিবেশ থাকবে যেখানে সকলে সুস্থ, সৃজনশীল জীবনযাপন করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার মতো করে অবদান রাখতে পারে, সর্বোপরি দেশের বিকাশ প্রক্রিয়ায় সকলেই শামিল হতে পারবে। সেখানে কেউ বাদ পড়বে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, মহিলা এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক উন্নয়নে কৌশলগত CSR প্রকল্পগুলি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ❑

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

Books on Rashtrapati Bhavan
WINGED WONDERS OF RASHTRAPATI BHAVAN
RIGHT OF THE LINE:
THE PRESIDENT'S BODYGUARD
ABODE UNDER THE DOME
State Guests at Raisina Hill (1947-1967)
INDRA DHANUSH

Employment News
WEEKLY
VOL. XLI NO. 14 PAGES 40
NEW DELHI 2 - 8 JULY 2016
₹ 12.00
NATIONAL CIVIL AVIATION POLICY WILL HELP CREATE JOBS
Jitender Bhargava
JOB HIGHLIGHTS
CAREER AS PILOT & CABIN CREW
Usha Albuquerque & Nidhi Prasad
Give Wings to Your Dreams
RESUME

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সুন্দরবন : প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা

চন্দ্রিমা সিনহা

*সুন্দরবনের বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ঝুঁকির মোকাবিলা করছেন। ৪.২ মিলিয়ন মানুষ একযোগে কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করছেন, কখনও বা জীবন-জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিপক্ষে লড়াই করছেন। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো সুন্দরবনের মানুষের সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে কিছুটা প্রাকৃতিক আর কিছুটা **'man made'** বা মনুষ্যসৃষ্ট, যা তারা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বা প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেরাই তৈরি করেছেন।*

সুন্দরবন প্রাকৃতিক দিক থেকে একটি সংবেদনশীল অঞ্চল। জল, জঙ্গল, বন্যপ্রাণ আর ৪.২ মিলিয়ন মানুষজন মিলেমিশে সুন্দরবনকে বিশ্বের দরবারে অনন্য সাধারণ উদাহরণ করে তুলছে; যেখানে বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ঝুঁকির (Environmental Risk) মুখোমুখি হচ্ছেন। এই প্রাকৃতিক ঝুঁকিই সেখানে উত্তরোত্তর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করে চলেছে। যদিও সামাজিক সুরক্ষার সংজ্ঞার নিরিখে পরিবেশ সংক্রান্ত নিরাপত্তার প্রসঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না কোনও দেশেই। এক-আধটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন—সুনামি কিংবা আয়লা, সিডার, নারগিস বা হুদহুদ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাকে লোকচক্ষু সমক্ষে নিয়ে আসলেও অল্পদিনেই আবার আমরা তা ভুলেও যাই। জনগণের স্মৃতিকে দোষারোপ করে লাভ নেই, নীতি নির্ধারকদের উদাসীনতাই সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে পরিবেশ প্রসঙ্গটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখেন। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত সামাজিক ঝুঁকিগুলির নিয়ন্ত্রণ বোধহয় তাদের হাতেও নেই।

সুন্দরবন অঞ্চলটি ম্যানগ্রোভ জাতীয় লবণাম্বু উদ্ভিদ সমন্বিত অরণ্য। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে উপকূলবর্তী অঞ্চল (উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) জুড়ে এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সুন্দরবনের মুখ্য নদী হল বিদ্যা, রায়মঙ্গল, মাতলা, ঠাকুরাণ, গোসাবা, সপ্তমুখী, হরিণভাঙ্গা ইত্যাদি। ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে১০৪-টি দ্বীপ আছে, যার মধ্যে ৪৮-টিতে মানুষজন বসবাস করে। সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য হল নদীর ধারে মাটির বাঁধ বা embarkment। এই অঞ্চলের জমি বেশ নিচু, কোনও কোনও জায়গায় জমি নদীর জলতলের থেকেও নিচে। তাই মাটির বাঁধ দিয়েই নিয়মিত প্লাবনের হাত থেকে সুন্দরবনবাসী নিস্তার পায়। সুন্দরবনের মাটিও বেশ লবণাক্ত, যেখানে ফসল ফলানো বেশ শক্ত। মিষ্টি জলের অভাবে সুন্দরবনের অনেক জমিই এক ফসলি। প্রায় ৪৪ শতাংশ মানুষ এখানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন। অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল তাই আজ সুন্দরবনবাসীদের রোজকার জীবন।

সামাজিক সুরক্ষার অর্থ স্থান, কাল, পাত্রের সাপেক্ষে বদলে যায়। সামাজিক সুরক্ষা বলতে মূলত অসুস্থতা, মাতৃত্ব সম্বন্ধীয় সুরক্ষা, উপার্জনের অপারগতা, বৃদ্ধাবস্থায় সামাজিক সুযোগসুবিধাকে নিশ্চিত করা ও অকাল মৃত্যুর হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা বা International Labour Organization (ILO) সামাজিক সুরক্ষাটির যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে সেটি হল : "সামাজিক সুরক্ষা হল এমন এক সুরক্ষা যা সমাজ কর্তৃক উপযুক্ত সংস্থা দ্বারা প্রদেয় সুরক্ষা যা সমাজের সদস্যদের কিছু সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে রক্ষা করে। এই সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা মূলত জীবনের

[লেখক Nature Environment & Wildlife Society (NEWS)-এর Program Manager (Planing and Monitoring)।
ই-মেল : sinha.chandrima@gmail.com]

কোনও আকস্মিক ঘটনা থেকে তৈরি হতে পারে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যা অনুধাবন করা বা সমাধান করা সম্ভব নয়, এমনকী ছোটো গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে সরকারি প্রচেষ্টাই মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারে। অর্থাৎ, ILO-র এই সংজ্ঞাটিতে যে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বা ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় মোকাবিলা করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতার উল্লেখ না থাকলেও নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা যায়, কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতার সাপেক্ষে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় সুরক্ষার ব্যবস্থা বোধহয় সম্ভব নয়।

সুন্দরবনের বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ঝুঁকির মোকাবিলা করছেন। ৪.২ মিলিয়ন মানুষ একযোগে কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করছেন, কখনও বা জীবন-জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিপক্ষে লড়াই করছেন। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো সুন্দরবনের মানুষের সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে কিছুটা প্রাকৃতিক আর কিছুটা 'man made' বা মনুষ্যসৃষ্ট, যা তারা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বা প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেরাই তৈরি করেছেন। একটু বিশদে বলা যাক।

প্রাকৃতিক নিরাপত্তাহীনতা

সুন্দরবনের মানুষ জলে জঙ্গলে বাস করে। সমুদ্র, খাঁড়ি, নদী, খাল সেখানকার মানুষের জীবনরেখা। সুতরাং, বন্যা, ঝড়, ভাঙ্গন, মাটি ও জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এছাড়াও আছে জঙ্গলের বিপদ। সুন্দরবনের বাঘ মানুষখেকো, যারা আবার লোকালয়ে চলে আসে মাঝে মধ্যেই। সুন্দরবনের মানুষ প্রকৃতিকে ভয় এবং ভক্তি দু'টোই করে। প্রাকৃতিক যে সব সমস্যা তাদের জীবনে বিশেষভাবে সংকট ডেকে আনছে এবার আসা যাক সে প্রসঙ্গে।

(১) **জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি :** সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তন ও পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ও হিমবাহের গলনের কারণে সমুদ্রের জলতল ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এটি অশনিসংকেত। কারণ গোটা সুন্দরবনে ভূমিস্তর সমুদ্রের জলস্তর অপেক্ষা নিচে অবস্থান করছে। একমাত্র নদীবাঁধই সুন্দরবনকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করে। মাটির নদীবাঁধ একটা মাত্রা পর্যন্ত জলস্তর বৃদ্ধি ঠেকিয়ে সুন্দরবনকে সুরক্ষা দিতে পারে। কিন্তু সেই সীমা ছাড়ালেই গোটা সুন্দরবন চলে যাবে জলের তলায়। অথচ কি আশ্চর্য ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি কিংবা সমুদ্রের জলস্তরের বৃদ্ধি, কোনও সুন্দরবনের মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই বা প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটাও তাদের আয়ত্তে নেই। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি বছর ৩ থেকে ৮ মিমি জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন প্রাকৃতিক ও অন্যান্য ব্যবহার জনিত কারণে ঘোড়ামারা দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফলে ৪.২ মিলিয়ন মানুষ কি অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না।

(২) **ঝড়ঝঞ্ঝা :** ভারতীয় পূর্ব উপকূল একটি ঝড়ঝঞ্ঝা প্রবণ অঞ্চল। প্রতি বছরই নানা ধরনের ঝড় সুন্দরবনের মানুষদের অল্প বিস্তর ক্ষতি করে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল ২০০৯ সালের ২৫শে মে। এই অঞ্চলে ধেয়ে এসেছিল আয়লা। ঝড় হয়েছিল ১০০-১২০ কিমি/ঘণ্টা বেগে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জোয়ারের উচ্চ জলস্তর। ফলস্বরূপ সমস্ত সুন্দরবন ওলটপালট হয়ে

সারণি-১
জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য

জমি রাখার ধরন	দ্বীপ-ব্লক (জঙ্গলের কাছাকাছি)	সুন্দরবনের অন্যান্য ব্লক
ভূমিহীন পরিবার (শতাংশ)	৩৫	৫৬
এক একরের চেয়ে কম সেচযুক্ত জমি বা দুই একরের চেয়ে কম সেচহীন জমি (শতাংশ)	৫১	৩৫

সূত্র : Rural Household Survey 2005, Office of District Magistrate, South 24 Parganas

সারণি-২
সুন্দরবনের পেশাগত বিভাগ

মূল পেশা (মোট শ্রমিকের শতকরা অংশভাক)	জঙ্গলের কাছাকাছি দ্বীপ অঞ্চল	সুন্দরবনের অন্যান্য ব্লক
কৃষক (নিজ জমি + বন্ধক জমি)	৩৪	২০
কৃষি জমিতে দিনমজুর	৪৮	৫৫
হকার, স্বনিযুক্ত ইত্যাদি	৫	৮
গ্রামীণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমজীবী	৫	৭
অন্যান্য পেশা	৮	১০

সুন্দরবনে নদী বাঁধের খতিয়ান

মাটির নদী বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য = ৩৫০০ কিমি বড় মোহনায় নদী বাঁধের দৈর্ঘ্য = ৭০০ কিমি মাঝারি মাপের নদী বাঁধের দৈর্ঘ্য = ২৭৫০ কিমি সমুদ্রকূলে sea dyke = ৫০ কিমি	২০০০ কিমি নদীবাঁধ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদবিহীন

নদীবাঁধ ভাঙ্গনের প্রভাব

- চাষের জমির ক্ষতি
- মিষ্টি জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পানীয় জলের সমস্যা
- বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি
- জীবনজীবিকার সঙ্কট
- দরিদ্রতা বৃদ্ধি

যায়। প্রায় ১০০-টি প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ৫০,০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার চেয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চাষবাস। সুন্দরবনের জীবনরেখা মিষ্টিজল লবণাক্ত হয়ে যায়। লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় এক বছর চাষবাস করা মোটেও সম্ভব হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে অসহায় মানুষ সামাজিক সুরক্ষা তো বহু দূর, পরিবারের দু'বেলা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থাও করে উঠতে পারেনি। বহু মানুষ এলাকায় চাষবাসের অভাবে কাজের সন্ধানে শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই Environmental Refugee বা পরিবেশ শরণার্থীদের সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নটি কিন্তু অবহেলিতই হয়েছে।

(৩) **নদী বাঁধের ভাঙ্গন :** প্রায় ৩৫০০ বর্গ কিমি নদী বাঁধ সুন্দরবনের জীবন নির্ধারণ করছে। দেড়শো বছরের পুরোনো মূলত মাটির দিয়ে তৈরি বাঁধ (earthen dyke) নিয়মিত জোয়ার-ভাটার জলের ধাক্কায় জীর্ণ। সমুদ্র উপকূলের ক্রমাগত ক্ষয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাইক্লোন এই মাটি বাঁধকে করে তুলেছে ভাঙ্গন প্রবণ। সুন্দরবনের মানুষ এই ভাঙ্গনের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে। কারণ নদী বাঁধের ভাঙ্গন মানেই চাষের জমিতে, মিষ্টিজলের পুকুরে নোনাজল ঢুকে পড়ার ও জমিকে চাষের অযোগ্য করে তোলার আশঙ্কা। এছাড়াও আছে জীবন জীবিকার অভাবে বাদাবন কেটে নোনাজলে (Brackish Water Aquaculture) মাছচাষ করার প্রবণতা যা নদীর বাঁধের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৩-টি ব্লকের মধ্যে ৯-টি ব্লক, বিশেষত বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর-২, নামখানা ও সাগর ব্লক ভাঙ্গন কবলিত। ২০০৯ সালের আয়লার পর প্রায় ৭৭৮ বর্গকিমি নদীবাঁধে ভাঙ্গন প্রকট হয়। বহু মানুষ গৃহহীন হন, নিরাশ্রয় ও বাঁধ ভেঙ্গে চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় সুন্দরবনবাসীরা জীবিকা হারায়। এই নদীবাঁধ ভাঙ্গন অবশ্য প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এবং ভাঙ্গনের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে অঞ্চলে মাটির নদীবাঁধ বাদাবন দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই অঞ্চলে এই ভাঙ্গন অপেক্ষাকৃত কম। নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী মৌজাগুলি বিশেষভাবে ভাঙ্গন কবলিত।

বিগত কয়েক দশকে সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমার বেশ কিছু অঞ্চল নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। শুধু সাগরদ্বীপেই বামনখালি, বেগনাখালি, ধবলাট, বিশাখালাখিমপুর এবং ঘোড়ামারার বেশ খানিকটা অঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। G Plot-এর গোবর্ধনপুর মৌজাও নদীবক্ষে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে। নদীভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে বহু গৃহহীন নিরাশ্রয় পরিবেশ শরণার্থীর, যাদের অন্য মৌজায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ধানচাষ, সবজি চাষ ও পান চাষের ক্ষতির জন্য দরিদ্রতার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লোকালয়ে বাঘ কিংবা ব্যাঘ্র সাম্রাজ্যে মানুষের প্রবেশ

ভারতীয় সুন্দরবন UNESCO-র ঘোষণা অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এই অঞ্চলেই আছে পৃথিবীর সর্ব বৃহত্তম Mangrove forest বা বাদাবন। এই বনাঞ্চলের খুব কাছেই Fringe area-তে ঘন জনবসতি। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে একশোর কাছাকাছি মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাস। স্বভাবতই মানুষ ও বাঘের একে অন্যের এলাকায় যাতায়াত অনিবার্য। সুন্দরবন বনাঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। মোহনা অঞ্চল মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ির আতুঁড় ঘর। ঘন জঙ্গলে চাকভরা মধু। অজস্র কাঠ। আরও কত কী? সামাজিক নিরাপত্তাহীন মানুষ একটু উপার্জনের জন্য ঝুঁকি নেয়, জীবিকার তাগিদে প্রবেশ করে বাফার এলাকায় মাছ বা কাঁকড়া ধরতে, বাগদা চিংড়ির মিন ধরতে কিংবা মধু সংগ্রহ করতে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সম্ভবত লবণাক্ত জলের প্রভাবে বা প্রতিকূল বাসস্থানের কারণে মানুষখেকো। অতএব মৌলি কিংবা মৎসজীবীরা বাঘের সহজ শিকার। মৎসজীবী ও মৌলিদের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বা কাজ ভাগাভাগির সময় পুরুষেরাই জঙ্গলে নামে এবং বাঘের শিকার হয়। সেক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের মৃত্যুতে পারিবারিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। সুন্দরবনেই তৈরি হয়েছে নতুন করুণ শব্দবন্ধ—'বাঘ বিধবা' বা 'tiger widow'। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুন্দরবনে প্রায় ১০০০ জন 'বাঘ বিধবা' আছেন।

আবার টাইগার রিজার্ভের নিকটবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে জনবসতি বেশ ঘন। এই অঞ্চলগুলিতে আদতে জনবসতি ছিল না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু বহু মানুষ বাদাবন কেটে বসতি গড়ে তোলে। এবং ক্রমশ জল-জঙ্গলের পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার বোধহয় নিজেদের বিচরণক্ষেত্রের পরিসীমা ছোটো করতে সহজে অভ্যস্ত হয়নি। হঠাৎ গড়ে ওঠা লোকালয়ে বাঘের হানাও স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। গবাদি পশু ও নিরীহ মানুষ তার শিকার। বাঘের ডেরায় ঘর বেঁধে

সুরক্ষা খোঁজা নিয়ে বিতর্ক করা যেতেই পারে, কিন্তু পরিস্থিতির পর্যালোচনা করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।

জীবিকার সুযোগের অভাব

সুন্দরবনের কিছু অংশ শহরাঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় জীবনজীবিকা রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতো। কিন্তু অরণ্যের কাছাকাছি অঞ্চলের জীবনজীবিকা কিন্তু বেশ অন্যরকম (সারণী ক ও খ দ্রষ্টব্য)। সুন্দরবনের বেশিরভাগ জমিই লবণাক্ত ও এক-ফসলি। সুন্দরবনের মোট চাষযোগ্য জমি ৩.০৬ হেক্টর, তার মধ্যে মাত্র ৬৫০০ হেক্টর জমি দো-ফসলা। বর্ষার সময় জল ঢুকে বেশিরভাগ জমি প্লাবিত হয়। জল দাঁড়ায় ৩ ফুট পর্যন্ত। আঁঠাল মাটি হওয়ায় জল সহজে সরে না। মাথাপিছু জমির পরিমাণও খুবই কম। প্রায় ৫০ শতাংশ। মানুষ জমিহীন কৃষক বা ভাগচাষি। যথাযথ সেচ ব্যবস্থার অভাবে চাষিরা চাষের জন্য বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল। অতএব জমির উৎপাদন ক্ষমতাও সীমিত। তার ওপর আছে বীজ, সার ও কীটনাশকের উচ্চ মূল্য। এর অর্থ হল, চাষাবাদ থেকে সুন্দরবনবাসীদের উপার্জনও সীমিত। অথচ বিকল্প উপার্জনের সুযোগও কম। নোনাজল বা মিষ্টিজলে মাছচাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষদের বিনিয়োগ ক্ষমতা সীমিত। তাই চাষ-আবাদ বা মাছচাষের অনেকটাই পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাজারে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। সুতরাং সঞ্চয়ও করে উঠতে পারে না।

বাজারে বাগদা চিংড়ি পোনা বা মিনের চাহিদা থাকায় সুন্দরবনের বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষত মহিলারা নদী থেকে মিন সংগ্রহ করার কাজে যুক্ত আছেন। ভাঁটার সময় নদীর ধারে জাল টেনে মিন ধরা হয়। যে মিন বিক্রি হয় ভেড়িতে বাগদা চাষের জন্য। এই কাজে মহিলারা দীর্ঘ সময় (৬-৭ ঘণ্টা) জলে জাল নিয়ে হেঁটে থাকেন। দীর্ঘ সময় জলে থাকার জন্য স্বাস্থ্যহানি হয়। এমনকী বিভিন্ন স্ত্রীরোগের শিকার হয়ে পড়েন। চিকিৎসার ব্যয়ভার এই গরিব মানুষগুলির পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়ে। মিন সংগ্রহের সময় কখনও কখনও কুমীর, কখনও বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হবার ঘটনাও ঘটে থাকে। উপার্জনের বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে সুন্দরবনবাসীদের বর্তমান যেমন অনিশ্চিত, ভবিষ্যতও যেন আরও অন্ধকারে ডুবে আছে।

পরিবেশগত নিরাপত্তাহীনতার পরিণাম

সুন্দরবনের মানুষজন নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদা ও জীবনজীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদের অনবরত জোগান অনিশ্চিত ও যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। তার ওপর সুন্দরবনের বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহারও কিন্তু পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন, সুন্দরবনের অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। LPG গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহার করার কথা মহিলারা ভাবতেও পারেন না। স্বভাবতই জ্বালানির জন্য জঙ্গলের কাঠের ওপর তারা নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে বাদাবনই একমাত্র ভরসা। অথবা চাষাবাদের বিকল্প উপার্জন ব্যবস্থার অভাব মানুষকে বাধ্য করছে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গভীর জঙ্গলে মধু ও মাছ সংগ্রহ করতে, কখনও চোরাপথে উপার্জনের দিকে নিরুপায় মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব বাদাবনের বন্যপ্রাণের সংরক্ষণের বিষয়টিও সুন্দরবনের মানুষের সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সামাজিক সুরক্ষার আরেকটি সূচক হল Migration বা নিজের গ্রাম ত্যাগ করে অন্য জায়গায় পাড়ি জমানো। সুন্দরবনের বহু মানুষ কাজের সন্ধানে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ভাঙ্গনের কারণে ঘরছাড়া, গৃহহীন। অথচ পরিবেশ সংরক্ষণের দায় ও দায়িত্ব আমরা তাদের ওপরই চাপিয়ে দিই। জীবনবিমা, বার্ধক্য ভাতা, কিংবা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিদার কিন্তু এরাই। একথা অনস্বীকার্য যে সুন্দরবনের বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ কিন্তু কলকাতাকেও ঝড়ঝাপ্টার তীব্রতা থেকে অনেকটাই রক্ষা করছে। দীর্ঘ বনাঞ্চল আমাদের carbon footprint কমাতে সাহায্য করছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে সুন্দরবন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রতি বছর দেশ বিদেশের বহু মানুষ সুন্দরবনে বেড়াতে আসেন। তাতে রাজস্ব আদায় হয়তো কিছু হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি কিন্তু হয় না।

নাগরিকবৃন্দের সামাজিক সুরক্ষা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতি নির্ধারণকারীরা নিশ্চয় এই বিষয়ে ভাবছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষজনের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি কিন্তু একটু বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ৪.২ মিলিয়ন মানুষের ওপর আমাদের জাতীয় অরণ্য সম্পদও নির্ভরশীল। অরণ্যসম্পদকে রক্ষার জন্য সুন্দরবনবাসীদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। ❑

সামাজিক নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও ভারত

চন্দ্রকান্ত লহরিয়া

গত কয়েক দশকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপায়ণে বিবর্তন ঘটেছে এবং এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে থাকা বেশকিছু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার আছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় সংবিধানে সংস্থান আছে এবং ভারতে একের পর এক সরকার এ ব্যাপারে বিভিন্ন মাত্রায় অগ্রাধিকার দিয়েছে। এসব কর্মসূচি অবশ্য এখনও এক্তিয়ার ও প্রভাবে সীমিতই রয়ে গেছে। সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে অগ্রগতি করতে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ভারত কাজে লাগাতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা, এসব কর্মসূচি ও কর্মসূচিতে জড়িত সংস্থাগুলির মিলমিশ, কর্মসূচিতে চাঁদা দেওয়ার জন্য মানুষকে একমত করার দিকে গুরুত্ব এবং রাজ্যগুলির নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে এটা সম্ভব।

'সামাজিক নিরাপত্তা' কথাটি বিভিন্ন পরিবেশে ও প্রসঙ্গে 'সামাজিক সুরক্ষা', 'সামাজিক কল্যাণ' এবং এহেন আরও কিছুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। 'সামাজিক নিরাপত্তা' কথাটিই অবশ্য সবচেয়ে বেশি চলে। মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ববিধি (রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ২১ক প্রস্তাব, ১৯৪৮)-এর ২২নং অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে। এতে ঘোষণা করা হয়েছে যে "সমাজের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তার অধিকার আছে এবং জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সহায়সম্পদ ও সংগঠন অনুসারে সে তার মর্যাদার জন্য অপরিহার্য আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ ও অবাধে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের হকদার।" এই বিধির ২৩নং অনুচ্ছেদ বলেছে "প্রয়োজন হলে, প্রত্যেক কর্মীর জন্য সামাজিক সুরক্ষার অন্যান্য উপায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।" আন্তর্জাতিক স্তরে, মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব বিধির ২২নং অনুচ্ছেদটি সামাজিক নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্রমবিকাশ

সেই প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে রাজা-বাদশাদের কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার আধুনিক বিবর্তনের গোড়াপত্তন অবশ্য উনিশ শতকের শেষাশেষি। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দিশারী হিসেবে জার্মানিকেই ধরা হয়। জার্মান চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপ্রধান অটো ভন বিসমার্কের জমানায় কর্মীর জন্য ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি (১৮৮৪ সাল), অসুস্থতা বিমা কর্মসূচি (১৮৮৮ সাল) ও সামাজিক বিমা কর্মসূচির (১৯৮৯ সাল) মতো এক গুচ্ছ উদ্যোগ শুরু হয় সে দেশে। বিশ শতকের প্রথম দিকেই, জার্মানির মানুষজন পূর্ণাঙ্গ এক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুবিধে ভোগ করছিল।

প্রায় একই সময়, ১৮৯৭-এ ব্রিটেনে চালু হয় কর্মীদের জন্য ক্ষতিপূরণ আইন। এরপর ১৯১১-এ জাতীয় বিমা আইন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই সে দেশের সরকার গড়ে তোলে প্রথম সংহত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এসব সংস্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি তারিফ করতে হয় ব্রিটেনের অর্থনীতিবিদ, প্রগতিশীল ও সমাজ সংস্কারক উইলিয়াম হেনরি বেভরিজকে। তিনি সরকারের কাছে এক প্রতিবেদন পেশ করেন যা কিনা বেভরিজ পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে তৈরি এক সুপরিচিত উদ্যোগ হল ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একে মডেল বলে ধরা হয়।

১৯০০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধ্যানধারণা নিয়ে আমেরিকায় বিবর্তন ঘটে যায়। বার্ধক্য সহায়তা (পেনসন) জোগান থেকে উত্তরণ ঘটে অর্থনৈতিক

[লেখক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নয়াদিল্লিস্থিত দপ্তরে 'National Professional Officer' হিসাবে যুক্ত। ই-মেল : c.lahariya@gmail.com; lahariyac@who.int]

নিরাপত্তা ও অবশেষে 'সামাজিক নিরাপত্তা' (সামাজিক বিমা-সহ অর্থনৈতিক সুরক্ষা)-য়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৫-এর 'সামাজিক নিরাপত্তা আইন' বানায়। এর ফলে ১৯৪৩-এ গড়ে ওঠে 'সংহত জাতীয় সামাজিক বিমা ব্যবস্থা'। ১৯৪৬-এ, পিয়ের লাহোর্ক্-এর হাত ধরে ফ্রান্সে সব মানুষকে সামাজিক সুরক্ষার ছত্রছায়ায় আনার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি হয়।

মোটামুটি এ সময়ে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) এবং রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক আইনকানুনে সামাজিক নিরাপত্তার উপর খুব জোর দেয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের ১৯৪৪-এর বিবৃতিতে উল্লেখিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সক্রিয়তা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আহ্বানকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে গণ্য করার দরকার। এহেন নিরাপত্তা ও সর্বাঙ্গীণ চিকিৎসা পরিচর্যার দরকার এমন সব মানুষের জন্য মোটামুটি আয়পত্তরের বন্দোবস্ত এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসারে রাষ্ট্রগুলিকে সহায়তা করার বিষয়টি এই বিবৃতিতে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৫২-এ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন সামাজিক নিরাপত্তা (ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড বা গড় মান) বিধি গ্রহণ করে। এতে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা আপদ-বিপত্তির এক সূচি (বক্স-১ দ্রষ্টব্য) রাখা আছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের যাবতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বিধির মধ্যে এটি প্রধান, কেননা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এটি একমাত্র মৌল সামাজিক নিরাপত্তা নীতিভিত্তিক আন্তর্জাতিক নিয়ম, যা কিনা গোটা বিশ্বে ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে স্বীকৃত।

বক্স-১
আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বিধি, ১৯৫২ মাফিক সামাজিক নিরাপত্তা (ক্রোড়পত্র)

- বার্ধক্য পেনসন : একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর ভাতা
- জীবিতের উপকার : অসহায় বিধবা ও বিপত্নীক বা সংসারে রোজগেরে মানুষের মৃত্যুর পর শিশুর জন্য
- অসুস্থতাজনিত ছুটির উপকার : রোগবালাইয়ের দরুন কাজকাম করার অক্ষমতাহেতু রোজগার না থাকা
- কর্মক্ষেত্রে জখম : চিকিৎসা, অসুস্থতাজনিত ছুটি, অকর্মণ্যতা এবং পেশাগত দুর্ঘটনা বা রোগের জন্য খরচপাতি
- প্রতিবন্ধকতা উপকার : স্থায়ী বা একটানা অক্ষমতাহেতু উপার্জন না থাকা
- বেকারি : সক্ষম ও কাজ করতে ইচ্ছুক অথচ উপযুক্ত কাজ না মেলায় রোজগার না থাকা
- পরিবারের উপকার : শিশুদের ভরণপোষণের দায়িত্ব
- চিকিৎসা পরিচর্যা : কারণ যাই হোক না কেন, রোগবালাই (গর্ভাবস্থা-সহ)-এর চিকিৎসা
- প্রসূতিকালীন উপকার : পোয়াতি হেতু আয় বন্ধ
- অন্যান্য কারণে যাদের নাগালে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নেই তাদেরকে সামাজিক সহায়তা

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে এক 'শক-অ্যাবজরবার' বা হঠাৎ করে আসা আপদ-বিপদ সামলানোর হাতিয়ার এবং অসহায়তা থেকে মানুষকে রক্ষা, সামাজিক অসাম্য দূর, গরিবি ও ক্ষুধার অবসান এবং মানুষের মর্যাদা, সামাজিক মিলমিশ ও গণতন্ত্র মজবুত করার এক পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক সংহতি ও অঙ্গীকার রূপে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লক্ষ্য ও বিধিতে এসব ব্যবস্থা সবসময় গুরুত্ব পেয়েছে।

কিছু দেশ আগেভাগে লেগে পড়লেও, কম ও মাঝারি আয়ের দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অগ্রগতি হচ্ছে ঢিমেতালে। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের এক প্রতিবেদন মতে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ পাচ্ছে বিশ্বের মাত্র ২৭ শতাংশ মানুষ। সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগের সামনে আছে হরেক চ্যালেঞ্জ। সুস্থায়িত্ব ও সর্বজনীনতা হল এহেন দুই চ্যালেঞ্জ।

অধিকাংশ দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু হয়েছিল বাছাই করা কিছু জনগোষ্ঠীর জন্য এবং এই কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধেও ছিল সীমিত। পরে এ দুয়েরই পরিসর বাড়তে থাকে এবং কয়েকটি দেশে এই কর্মসূচির আওতায় আসে প্রায় সব মানুষ। তবে সমস্যা আছে কম ও মাঝারি আয়ের দেশে। এসব দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পড়ে খুব অল্প মানুষ এবং এবাবদ বরাদ্দও বেশ কম। কাগজে-কলমে এসব কর্মসূচি ভালোই মনে হয়; তবে বেশিরভাগ মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ছত্রছায়ার বাইরে থেকে যায়। উপরন্তু, উদ্দীষ্ট মানুষজনকে ঝাড়াই-বাছাই করাটাও এক মস্ত ঝক্কি। এসব কর্মসূচি তাই সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ হওয়াটা দূর অস্তই রয়ে গেছে। মানুষের প্রত্যাশা ও দেশের আর্থিক ক্ষমতা এ দুয়ের মাঝে সঙ্গতি রেখে, কর্মসূচির আওতায় আরও বেশি বেশি লোক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক মনোযোগ জরুরি। চাই আরও বেশি সুযোগসুবিধেরও ব্যবস্থা করা এবং এজন্য এসব কর্মসূচি নিয়মিত খতিয়ে দেখতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে টেঁকসই করার প্রসঙ্গে বলা দরকার, দেশে দেশে এই কর্মসূচির রকমফের থাকলেও, জনসংখ্যাগত ও অর্থনৈতিক লক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ বেশকিছু উন্নত দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ লেগে যাবে এই কর্মসূচিবাবদ। মানুষের আয়ু বাড়তে থাকায় এর পর অবসর বাবদ খরচ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এর অনুপাত বাড়তে থাকবে। সোজা কথায়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাড়বে ব্যয়ের বোঝা। জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের আধিক্যের দরুন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খাতে টোল না খায় তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারকে রাজস্ব পরিকল্পনা সেই মতো ঠিক করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আর এক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গরিব মানুষের কাছে উপকার পৌঁছে দিতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের খামতি। উদ্দীষ্ট মানুষজনের বেশিরভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত বলে আইন মতে তারা প্রায়শই এসব প্রকল্পে চাঁদা দেওয়া ও অংশ নেওয়ার

অধিকারী নয়। সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দিয়ে এহেন মানুষজনের জন্য চাঁদা ছাড়াই নিরাপত্তা জোগানোর উপায় উদ্ভাবন ও রূপায়ণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপায়ণে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে সংবিধানে দেওয়া ক্ষমতার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ। অধিকাংশ দেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্থান আছে। লক্ষ্য করা গেছে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তার স্পষ্ট ও বিশদ উল্লেখ থাকা দেশগুলি এসব ব্যবস্থা রূপায়ণে অন্যান্যদের থেকে ঢের এগিয়ে।

বিশ্বে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের গুটিকয়েক নজির আছে। সবচেয়ে উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির অন্যতম ফিনল্যান্ড। সেখানকার সব বাসিন্দা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত। দেশটিতে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য আছে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। বাসস্থানভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার টাকাকড়ি জোগাড় হয় কর থেকে এবং তা পরিচালনার দায়িত্ব স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার। কর্মসংস্থানভিত্তিক, আয়-সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তার অর্থসংস্থান হয় চাঁদা থেকে। এ টাকা জমা পড়ে বেসরকারি বিমা সংস্থা ও পেনসন তহবিলে এবং তার তদারকি করে ফিনিশ সেন্টার ফর পেনসনস। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি কল্যাণমূলক দিকগুলিতেও নজর দেয়। সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসেবে ফিনল্যান্ডে আছে এক পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অন্য পাঁচটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে সারণি-১-এ।

দেশে দেশে চালু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দু' চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

● প্রায় সব দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য আছে পেনসন ও অবসরকালীন সুযোগসুবিধে এবং ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি। বেশ কিছু অন্যান্য গোষ্ঠীর কিছু মানুষকেও এ ধরনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি-১
বাছাই করা কয়েকটি দেশে সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগের সারসংক্ষেপ

দেশ	বিবরণ
অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র সঙ্গতিহীন ব্যক্তি/পরিবারকে সামাজিক কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা দেওয়া হয়। সে দেশে সমাজের এক ব্যাপক অংশ সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং চিরাচরিত গ্রহীতারা—অবসরপ্রাপ্ত, স্বামী-স্ত্রী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার, অসুস্থ, সদ্যোজাত শিশু পরিচর্যাকারী বাবা-মা ইত্যাদি ছাড়াও, ছাত্র, পরিচর্যাকারী (অসুস্থদের দেখভালকারী) এবং আদিম অদিবাসীরা এর আওতায় পড়ে।
চিন	চিনের প্রদেশগুলি (আমাদের রাজ্যের সমতুল) তাদের স্থানীয় প্রয়োজন মাফিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সাজায়। নিয়ম-কানুন জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু কর্মসূচি পরিচালনা ও তার বিশেষত্ব ঠিক করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। বিগত চার দশকে এসব কর্মসূচিতে বহু রদবদল ঘটেছে। সে দেশে বেশ কিছু কর্মসূচি চলছে। কিছু কর্মসূচিতে তহবিল জোগায় কর্মী-নিয়োগকর্তা এবং কয়েকটি চলে পুরোপুরি নিয়োগকর্তার দেয় টাকায়। বিমা প্রকল্পগুলিতে একটা নির্দিষ্ট অংক পর্যন্ত মজুরি পাওয়া কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দেয় চাঁদারও একটা সর্বোচ্চ সীমা আছে।
কিউবা	সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে গেলে সর্বজনীন এবং টাকাকড়ির বেশিরভাগটা জোগায় সরকার। বহু উন্নত দেশের তুলনায় সেখানকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক বেশি ব্যাপক। স্বাস্থ্য পরিষেবা মেলে নিখরচায়। কিউবা খুব দ্রুত অধিকাংশ ব্যবস্থা সেরে ফেলতে পেরেছে এবং তুলনায় বেশ কম খরচে।
জাপান	সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় সর্বজনীন। এই ব্যবস্থায় সকলের জোগদান বাধ্যতামূলক, নিদেনপক্ষে নীতিগতভাবে। মৌলিক জীবনযাত্রা, বাসস্থান, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য বিমা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ মেটাতে সরকারি সাহায্য মেলে। বছরের পর বছর ধরে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ক্রমবিকাশ হয়েছে এবং জনসংখ্যায় প্রবীণদের আধিক্যসম্পন্ন দেশগুলির কাছে জাপানের সামাজিক নিরাপত্তা এক আদর্শস্বরূপ।
ফিলিপিন্স	সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেসরকারি, পেশাদার এবং অসংগঠিত কর্মীদের জন্য আছে সরকার পরিচালিত সামাজিক বিমা কর্মসূচি। সামাজিক নিরাপত্তায় তিনটি কর্মসূচি : (ক) সামাজিক নিরাপত্তা, (খ) চিকিৎসা পরিচর্যা, (গ) কর্মীদের ক্ষতিপূরণ। সরকারি কর্মীরা রাষ্ট্র পেনসন তহবিলের আওতাধীন। এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নমেন্ট সার্ভিস ইনসুরেন্স সিস্টেমের।

● অসংগঠিতদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনার প্রচেষ্টায় খামতি আছে এবং সুযোগসুবিধেও বেশ কম।

● সামাজিক নিরাপত্তায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করতে সবাই মোটামুটি একমত; মাত্র গোটাকয়েক দেশ অবশ্য সকলের জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

● সামাজিক নিরাপত্তায় করিৎকর্মা অনেক দেশ বিভিন্ন কর্মসূচির মিলমিশ এবং রূপায়ণে সংহতির চেষ্টা করেছে। এসব ক্ষেত্রে পরিষেবার ক্রেতাদের থেকে প্রদানকারীদের পৃথক করা হয়েছে এবং সরকারের হয়ে এক বা একাধিক স্বাধীন ও স্বশাসিত সংস্থা এগুলি পরিচালনা করে।

● যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, কর্মসূচির ছক কষা এবং রূপায়ণের কাজ করে রাজ্যগুলি এবং জাতীয় সরকার সামঞ্জস্য আনতে নীতি এবং বিধি-নিয়ম ঠিক করে দেয়।

● সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবা প্রত্যাশিত মাত্রায় বাড়ানোর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দেশগুলি দরকার মতো আইনি সংস্থানেরও ব্যবস্থা করে।

সফল হতে ভারতের কাছে সাতটি উপায়

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর ভারত এক যুবা জনসংখ্যার দেশ (এর দরুন সুফলের সম্ভাবনা যথেষ্ট) এবং দুনিয়াজোড়া মন্দায় কাবু না হয়ে দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতি। এটাই বোধহয় ভারতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার মোক্ষম সময়। গোড়াতেই একটি কথা মনে রাখা ভালো, ভারতে সামাজিক নিরাপত্তা

ব্যবস্থায় একটা বড়ো জোর হচ্ছে যে এ দেশের সংবিধানের ধারা ৪১ ও ৪২, ৪র্থ খণ্ডে শিক্ষার অধিকার, বেকারি, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সহায়তার কথা আছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে এ এক জোরালো আইনি কাঠামো।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ দেশ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে বেশ আগেভাগেই। ১৯২৩ সালে ভারতে চালু হয় কর্মীদের ক্ষতিপূরণ আইন। সেই ইস্তক নতুন নতুন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে আরও বেশি বেশি জনগোষ্ঠীকে এবং সার্বিক চিত্র, নিদেনপক্ষে কাগজেকলমে বেশ আশাপ্রদ। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও অবশ্য সেই একই ধরনের চ্যালেঞ্জ : আধা খ্যাঁচড়া কর্মসূচি, রূপায়ণে খামতি (এমনকি হালের উদ্যোগ ও কর্মসূচিগুলির ক্ষেত্রেও একথা খাটে)। এই পরিস্থিতিতে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য ভারতের সামনে সাতটি উপায় (বক্স-২ দ্রষ্টব্য)।

বক্স-২
সামাজিক নিরাপত্তা রূপায়ণে বিশ্বের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের জন্য সাতটি উপায়

(১) সর্বজনীনতা, অর্থাৎ সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পথনির্দেশিকা বানানো ও তাতে একমত হওয়া
(২) স্বশাসিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা করা
(৩) উদ্ভাবনী অর্থসংস্থান ব্যবস্থা-সহ এক সামাজিক ক্ষেত্র লগ্নি পরিকল্পনা তৈরি
(৪) ঐক্য ও সংহতির পাশাপাশি জন সচেতনতা ও অংশগ্রহণে দৃষ্টি
(৫) সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসেবে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা
(৬) রাজ্য সরকারগুলির অতিসক্রিয় (প্রোঅ্যাকটিভ) নেতৃত্ব
(৭) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও আইনি সংস্কার

(১) সর্বজনীনতা অর্থাৎ সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে পথনির্দেশিকা বানানো ও তাতে একমত হওয়া :

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, উদ্দীষ্ট উপকৃতদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা দরকার, অন্যথায় তারা বাদ পড়বে। এ সব উদ্যোগের পরিসর বাড়ানোর জন্য চাই এক রোডম্যাপ বা পথনির্দেশিকা এবং এতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঐকমত্য জরুরি। দায়বদ্ধতা আনার জন্য সরকার এহেন পথনির্দেশিকা প্রকাশ করবে। এ কাজের জন্য মদতকারী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি গড়া এবং দক্ষতা আনতে বেশ কিছু প্রচলিত কর্মসূচির মধ্যে সংযুক্তি প্রয়োজন। আধার কার্ড ও জনধন যোজনার মতো ইদানীংকার উদ্যোগ সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য এক খাসা মঞ্চ হয়ে ওঠার এলেম রাখে এবং এগুলিকে পথনির্দেশিকা ও রূপায়ণের কাঠামোয় বিশেষভাবে ঠাঁই দেওয়া সমীচীন।

(২) স্বশাসিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা করা :

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি তদারকি করার জন্য কিছু দেশ স্বশাসিত সংস্থা গঠন করেছে। ভারতে হরেক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আছে। এগুলির রূপায়ণে কিছু খামতি থেকে যাচ্ছে। জাতীয় ও রাজ্য স্তরে এহেন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা দক্ষতা আনবে এবং রূপায়ণ ফলপ্রসূ হবে। এর ফলে নীতি প্রণয়নে সরকার আরও ফুরসত পাবে।

(৩) উদ্ভাবনী অর্থসংস্থান ব্যবস্থা-সহ সামাজিক ক্ষেত্রে লগ্নি পরিকল্পনা তৈরি :

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুরু করতে কোনও দেশ ধনী হওয়াটা অত্যাবশ্যক নয়। সামাজিক নিরাপত্তায় লগ্নি বরং আর্থনীতিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে। সহায়সম্পদের প্রয়োজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও পরিবর্তনশীল জনসংখ্যার বিষয়ে যথোচিত ভাবনাচিন্তা-সহ আগামী ১৫ বা ২০ বছরের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে লগ্নির এক পরিকল্পনা খুব কাজের হবে। টেঁকসই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে এসব কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দের জন্য এই পরিকল্পনা উদ্ভাবনী ও সুনিশ্চিত ব্যবস্থাবলির তালিকা তৈরি করবে। দরকার হলে, সংবিধান ও আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাছাই করা ও উদ্দীষ্ট মানুষজনের কাছ থেকে চাঁদা আদায় বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৪) ঐক্য ও সংহতির পাশাপাশি জন সচেতনতা এবং অংশগ্রহণে দৃষ্টি :

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঐক্য ও সংহতি এক মূলতত্ত্ব, যেখানে বঞ্চিত, অবহেলিত এবং দুর্ভাগাদের সাহায্য করতে মানুষ অঙ্গীকার করে। গরিবের পাশে বড়োলোক, অশিক্ষিতের পাশে দাঁড়ায় শিক্ষিত মানুষজন। সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ভাবে বেকার বা অসংগঠিত শ্রমিকের কথা। এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংহতি আনা সম্ভবপর। এর ফলে চালু কর্মসূচিগুলি আরও বেশি কাজে লাগানো যাবে।

(৫) সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসেবে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা :

রোগব্যাধির চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে ভারতে প্রতি বছর ৬ কোটি ৩০ লক্ষের

মতো মানুষ গরিব হয়ে পড়ে। গরিবিরেখার নিচের (বিপিএল) মানুষের হয় হাঁড়ির হাল। অন্য কথায়, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয়পত্তরের খাঁই মেটাতে ও সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাবে দেশে গরিবি হঠানো-সহ যাবতীয় সামাজিক নিরাপত্তা প্রচেষ্টা মাটি হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের অংশভাক মাত্র ৩০ শতাংশ; যা কিনা বিশ্বের এবাবদ কম ব্যয়ী দেশগুলির অন্যতম। স্বাস্থ্যের জন্য মানুষ নিজের ট্যাঁক থেকে খরচ করে মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৫ শতাংশ। বিশ্বের খুব কম দেশে স্বাস্থ্যের পিছনে মানুষকে শতাংশের অনুপাতে এত বেশি খরচ মেটাতে হয়। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে স্বাস্থ্যে সরকারি লগ্নি বাড়লে, মানুষকে কম খরচ করতে হয় এবং তা হয়ে ওঠে গরিবির বিরুদ্ধে এক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উপরন্তু, স্বাস্থ্যে লগ্নির সুবাদে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক বিকাশ বাড়ে। স্বভাবতই, সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ হিসেবে বহু দেশ সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্যের পথ বেছে নিয়েছে। ভারতে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে এ কাজে নেমে পড়া দরকার। স্বাস্থ্যে সরকারের আরও বিনিয়োগ দরকার এবং সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার মতো কর্মসূচির সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত, এসবের উদ্দেশ্য খুবই সাধু। যদিও, ভারতে স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সরকারি ব্যয়ের মাত্র ১ শতাংশ ঢালা হয় এই কর্মসূচিতে। বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই, এই কর্মসূচির প্রভাব সীমিত। সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এগোতে গেলে এই কর্মসূচিতে চাই যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ এবং প্রস্তাবিত জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচি চালু ও তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করা দরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির (২০১৭) রূপায়ণ ভারতে সবার জন্য স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

(৬) **রাজ্য সরকারগুলির অতিসক্রিয় (প্রোঅ্যাকটিভ) নেতৃত্ব :**

ভারতের মতো এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, রাজ্যগুলি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়োসড়ো ভূমিকা পালন করে। সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগকে সফল করতে এর ফলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করা ও উদ্ভাবনার যথেষ্ট সুযোগ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সবসময়ই আর্থিক টানাটানি থাকে। তবে, রাজ্যে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও দায়বদ্ধতা থাকলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপায়ণে সফলতা বাড়বে। সবার জন্য স্বাস্থ্য-সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সর্বজনীনতার জন্য কয়েকটি সফল রাজ্য দেশের বাদবাকি অংশকে পথ দেখাতে পারে।

(৭) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও আইনি সংস্কার :**

সুস্থায়িত্বের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলির দরকার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও আইনি সমর্থন। একটা সময়ে, করের টাকার পরিবর্তে অর্থসংস্থানের জন্য বাধ্যতামূলক চাঁদার ব্যবস্থা করতেই হবে, যাদের সামর্থ্য আছে তারা অবশ্যই টাকা দেবে। অন্যথায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখাটা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্য আইন প্রণয়ন করা ও আইনি সংস্থান থাকা দরকার। তেমন হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষত দেশের অগ্রণী শিক্ষা ও নীতি প্রতিষ্ঠানগুলির মতামত নিতে হবে।

পরিশেষে

গত কয়েক দশকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপায়ণে বিবর্তন ঘটেছে এবং এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে থাকা বেশকিছু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার আছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় সংবিধানে সংস্থান আছে এবং ভারতে একের পর এক সরকার এ ব্যাপারে বিভিন্ন মাত্রায় অগ্রাধিকার দিয়েছে। এসব কর্মসূচি অবশ্য এখনও এক্তিয়ার ও প্রভাবে সীমিতই রয়ে গেছে। সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে অগ্রগতি করতে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ভারত কাজে লাগাতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ পরিকল্পনা, এসব কর্মসূচি ও কর্মসূচিতে জড়িত সংস্থাগুলির মিলমিশ, কর্মসূচিতে চাঁদা দেওয়ার জন্য মানুষকে একমত করার দিকে গুরুত্ব এবং রাজ্যগুলির নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে এটা সম্ভব। এছাড়া, সবার জন্য স্বাস্থ্যকে ভারতে এক সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থা হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সর্বজনীন ও সুস্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দ্রুত এবং টেঁকসই আর্থনীতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে, কমবে গরিবি, স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করবে। এসবের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাও সম্ভব হবে।❑

আরও খবরাখবরের জন্য :

- ভারত সরকার, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১৭, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, নির্মাণ ভবন, নয়াদিল্লি
- International Social Security Association. Social Security Programs throughout the world; 4 volumes, Europe, Asia and Pacific, America and Africa. Published in 2011-12. ISSA and Social Security Administration, United States of America. Washington DC, 2011.
- International Labor Organization. ILO Social Security (Minimum standard) convention, 1952. Accessed at webpage : http://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205340/lang--en/index.htm
- World Health Organization. Health Financing : path to universal coverage. World Health Report 2010. WHO : Geneva. 2010.

জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সুরক্ষায় জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা

বদ্রী সিং ভান্ডারী

NSDL
Technology, Trust & Reach

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী যৌথ পরিবার ব্যবস্থাই এত দিন অবধি বয়োজ্যেষ্ঠদের আয়ের নিরাপত্তা দিয়েছে। পেশাগত পরিবর্তন, নগরায়ণ ও ছোটো পরিবারের আকাঙ্ক্ষার কারণে যৌথ পরিবারের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে। সর্বোপরি জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ও আয়ের স্তর বর্ধিত হবার ফলে মানুষের আয়ুও দীর্ঘতর হচ্ছে। একদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত পেনসন ব্যবস্থায় আর্থিক বোঝাই অধিকাংশ দেশকে পেনসন ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে টেনে এনেছে।

পেনসন বা বৃদ্ধাবস্থায় নিয়মিত আয়ের সংস্থান সামাজিক সুরক্ষা বিধানের এক অন্যতম অঙ্গ। পেনসন থাকলে প্রবীণ বয়সে দারিদ্র্য-কবলিত হবার আশঙ্কা থাকে না এবং অবসরের পরও পেনসনগ্রহীতার জীবনযাত্রা নির্বাহ অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। এখানে দু'টি বিষয় মনে রাখা দরকার : একদিকে পেনসন ব্যবস্থাকে গ্রাহকদের কাছে সুলভ করে তোলা যেমন প্রয়োজন; তেমনই অন্যদিকে এই ব্যবস্থার ফলপ্রসূতা ও সুস্থায়ীত্ব নিশ্চিত করাও খুব জরুরি। এটা করতে পারলে বিভিন্ন পেশা ও আয়বিশিষ্ট আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে পেনসন দেওয়া সম্ভব হবে। পেনসন ব্যবস্থার প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিগত তিন দশকে বিশ্বের নানা প্রান্তের দেশগুলিতে এই ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয়েছে; যেগুলিতে গুরুত্ব পেয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী যৌথ পরিবার ব্যবস্থাই এত দিন অবধি বয়োজ্যেষ্ঠদের আয়ের নিরাপত্তা দিয়েছে। পেশাগত পরিবর্তন, নগরায়ণ ও ছোটো পরিবারের আকাঙ্ক্ষার কারণে যৌথ পরিবারের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে। সর্বোপরি জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ও আয়ের স্তর বর্ধিত হবার ফলে মানুষের আয়ুও দীর্ঘতর হচ্ছে। একদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত পেনসন ব্যবস্থায় আর্থিক বোঝাই অধিকাংশ দেশকে পেনসন ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে টেনে এনেছে।

বৃদ্ধ বয়সের আয় নিরাপত্তাকে পেনসন বা ভবিষ্যনিধি বা বার্ধক্য ভাতা বা অবসর-কালীন আর্থিক সুবিধা বেনিফিট যে তকমাই দেওয়া হোক না কেন, ঐতিহাসিকভাবে এর সুযোগ নিতে পেরেছে সংগঠিত ক্ষেত্রের, বিশেষ করে সরকারি কৃত্যক, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং বৃহদাকার কয়েকটি বেসরকারি উদ্যোগের কর্মীরা। ২০০৪ সালের পেনসন সংস্কারের আগে ভারতের পেনসন চিত্রটি কেমন ছিল তার এক খণ্ড চিত্র এখানে তুলে ধরা হল :

- জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত ও ষাটোর্ধ্বদের, প্রতিবন্ধীদের ও বিধবাদের ন্যূনতম মাত্রার সুরক্ষা দেবার জন্য পরিচালিত কর তহবিলপ্রাপ্ত বিভিন্ন সামাজিক পেনসন।
- ২০০৪ সালের আগে কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য রয়েছে একটি সংজ্ঞায়িত 'বেনিফিট' পেনসন প্রকল্প যাকে বলা হয়ে থাকে Central Civil Services Pension Scheme 1972। সমগোত্রীয় পেনসন প্রকল্প রাজ্য সরকারগুলি ছাড়াও অসংখ্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে।
- Employees Provident Fund Organization (EPFO) পরিচালিত কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল এবং কর্মচারী

[লেখক 'Pension Fund Regulatory and Development Authority' (PFRDA)-এর পূর্ণ সময়ের সদস্য (অর্থনীতি)। ই-মেল : badris.bhandari@pfrda.org.in]

পেনসন প্রকল্প। ১৯৫২ সালের EPF আইন অনুযায়ী প্রজ্ঞাপিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ২০ বা ততোধিক কর্মচারী থাকলে ওই প্রকল্পের সুযোগ পাওয়া যায়।

● বিমা ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড সংস্থাগুলি পরিচালিত বার্ধক্য ও অবসরকালীন পেনসন কর্মসূচি। এছাড়াও রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ব্যাংক ও ডাকঘরের সাহায্যে নির্বাহিত হয়ে থাকে এবং যেগুলিতে যে কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অংশ নিতে পারেন। এটিতে অংশগ্রহণের প্রধান কারণ হল কর রেহাই-এর সুবিধা প্রাপ্তি।

একদিকে তহবিল-বিযুক্ত ও সংজ্ঞায়িত 'বেনিফিট'-এর আওতায় সরকারি কর্মীদের পেনসন প্রদানে বাজেটে টানাটানি, অন্যদিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রভুক্ত (যারা কিনা সমগ্র জনসংখ্যার ৮৪ শতাংশ) বিপুল সংখ্যক প্রবীণদের জন্য আয়ের নিরাপত্তা প্রসারিত করার সদিচ্ছা। ভারতে পেনসন ব্যবস্থা সংস্কারের অনিবার্যতা ওই দু'টি কারণেই নিহিত রয়েছে। একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পর যেসব সুপারিশ করেছিল, তার ভিত্তিতেই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরে যার নামকরণ হয়েছিল National Pension System (NPS) বা জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা। প্রয়াসটির মূল বুনিয়াদ গঠিত হয়েছে একটি সংজ্ঞায়িত অংশপ্রদানপুষ্ট তহবিলের সাহায্যে। নতুন এই ব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বর্তেছে Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) বা পেনসন তহবিল নিয়ন্ত্রণকারী ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওপর। ব্যবস্থাটি বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হয় সেই সব কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য, যারা পয়লা জানুয়ারি, ২০০৪ বা তার পরে কাজে যোগ দিয়েছেন (সেনাকর্মীরা বাদে)। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি কর্মীরাও এর আওতাভুক্ত হন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ২০০৯-এর পয়লা মে থেকে এটি ঐচ্ছিকভাবে সম্প্রসারিত হয় অসংগঠিত ও অচিরাচরিত ক্ষেত্রগুলিতে স্বনিয়োজিত কর্মী-সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উদ্যোগগুলির সকল ভারতীয় কর্মীদের জন্যও। এখন ১৮-৬০ বয়ঃসীমার যে কোনও ভারতীয় নাগরিক তাদের কর্মক্ষম জীবনে Systematic বা প্রণালিবদ্ধ বিনিয়োগ করে অবসরকালীন পেনসনের সুযোগ নিতে পারবেন। যে সব সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, তারা নিজেদের Permanent Retirement Account Number (PRAN)-এ বেতনের ১০ শতাংশ (মহার্ঘভাতা-সহ মূল বেতন) জমা দিলে নিয়োগকর্তার তরফ থেকেও সম পরিমাণ অর্থ জমা পড়বে। এই ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় যোগদানকারীরা প্রতি বছর ন্যূনতম ১ হাজার টাকা জমা করতে পারবেন, যা আয়ের স্তর মোতাবেক বাড়ানো যেতে পারে। পুঞ্জীভূত তহবিলকে পরে PFRDA-র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে সরকারি সিকিউরিটিজ, বন্ড বা ডিবেঞ্চার ও নামী সংস্থার ইক্যুইটি শেয়ারে পেশাদারদের সাহায্য নিয়ে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পেনসন তহবিল নির্বাচনের প্রশ্নে গ্রাহকদের মতামত গ্রাহ্য করা হয়ে থাকে এবং তারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী বিনিয়োগের সম্পদও বেছে নিতে পারবেন। সার্বিক সম্পদ শ্রেণিভুক্ত পৃথক সিকিউরিটিজ বেছে নেবার দায়িত্বে রয়েছেন পেনসন তহবিল ম্যানেজাররা।

জাতীয় পেনসন ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য মধ্যস্থতাকারীদের নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডগুলি হল : গ্রাহকদের নথিভুক্তকরণ, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পেনসনের প্রদেয় অর্থ সংগ্রহ করা, প্রত্যেক গ্রাহকের রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা, গ্রাহক তহবিলের অর্থ একত্রিত করা, আর্থিক বাজারে সিকিউরিটিজ বা ঋণপত্রে তহবিল নিয়োজন করা, সিকিউরিটিজের রেকর্ড রাখা এবং সময়ের ব্যবধানে পেনসন বা বার্ষিক প্রাপ্য সুদের সংস্থান করা। মধ্যস্থতাকারীদের নিয়োগ করা হয় দক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুশলতা যাচাই করার পর। জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য PAO, DDO-এর মতো সরকারি কার্যালয়গুলিকে জড়িত করা হয়। রয়েছে একাধিক Points of Presence (PoP) যাদের সাহায্য নিয়ে গ্রাহকদের প্রদেয় অর্থ সংগ্রহ করার পর সেই অর্থ ট্রাস্টি ব্যাংকে প্রেরিত হয়। একটি Central Record Keeping Agency (CRA) বা কেন্দ্রীয় রেকর্ড ধারণ এজেন্সির মধ্যবর্তিতায় প্রতিটি গ্রাহকের সমস্ত রকমের তথ্য ও ডেটা সংরক্ষিত হয়। এই এজেন্সিই প্রত্যেক গ্রাহককে একটি অভিনব Permanent Retirement Account Number (PRAN) ইস্যু করে থাকে। প্রতিটি অ্যাকাউন্ট নম্বরের ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ

করা ছাড়াও CRA-এর সাহায্যেই মধ্যস্থতাকারী সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সমন্বয় ও যোগাযোগ বজায় রাখা হয়। জাতীয় পেনসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত রেকর্ড কিপিং-এর দরুন দেশের যে কোনও স্থানে ব্যক্তিবিশেষের পেনসন অ্যাকাউন্টটি সম্পূর্ণভাবে পোর্টেবল বা বহনযোগ্য হয়ে উঠেছে। ব্যবস্থাটির পরিচালনা সর্বতোভাবে প্রযুক্তি নির্ভর, তথ্য ও তহবিলের আদানপ্রদান ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে হবার কারণে সকল স্তরেই দ্রুততা, নির্ভুলতা ও দক্ষতা সুনিশ্চিত হতে পেরেছে।

সরকারি কর্মীরা তাদের নিজ নিজ Drawing and Disbursing Officer (DDO) অথবা Pay and Account Office (PAO)-এর মারফত জাতীয় পেনসন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। কর্পোরেট ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য রয়েছে একাধিক PoP, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। PoP-গুলির ৬০ হাজারের বেশি কার্যালয় ছড়িয়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে গিয়ে গ্রাহক নথিভুক্তকরণের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে পরিচয়পত্র ও ঠিকানা সম্বলিত KYC-সহ। কয়েকটি PoP কার্যালয়ের শাখা প্রতিনিধিদের কেন্দ্র বিদেশেও রয়েছে। PoP-এর বিশদ তালিকা জানা যাবে www.pfrda.org.in এবং www.npscra. nsdl.co.in-তে গিয়ে। NPS পোর্টালের মধ্যবর্তিতায় অনলাইনেও জাতীয় পেনসন অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। eNPS পোর্টালে আধার অথবা প্যান এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে KYC প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেও পেনসন অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব। পেনসন ব্যবস্থায় যোগদানের পর গ্রাহকদের PRAN দেওয়া হয়ে থাকে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রযুক্তিচালিত হবার দরুন গ্রাহকরা অনলাইনে NPS মোবাইল অ্যাপ-সহ তাদের অ্যাকাউন্টের হালহকিকত জানতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা রূপায়ণকল্পে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ২০০৩-এর ডিসেম্বর মাসে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ব্যবস্থাটি

কার্যকর করতে চূড়ান্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হয় Controller General of Accounts-এর পক্ষ থেকে ২০০৪-এর জানুয়ারি মাসে। পেনসনের জন্য কর্মীদের প্রদত্ত অংশভাক Control Pension Accounting Office-এর পরিচালনায় পাবলিক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত রাখা হয়। ২০০৩-এর মার্চ মাসের পর গচ্ছিত অর্থ PFRDA-কর্তৃক নিয়োজিত ট্রাস্টি, ব্যাংকে প্রেরিত হয়, যাতে করে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি প্রাথমিক নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তা আর্থিক বাজারে খাটানো যায়। ট্রাস্টি ব্যাংকে প্রেরিত হবার আগে পর্যন্ত এ ধরনের জমা তহবিলে সরকারের পক্ষ থেকে ৮ শতাংশ সুদ দেওয়া হয়। পেনসন ব্যবস্থায় গচ্ছিত অর্থের প্রস্তুতিপর্ব, আপলোড ও প্রেরণের সময়সীমা এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশাবলী সম্পর্কে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসেই কেন্দ্রীয় ব্যয় সংক্রান্ত দপ্তরের আওতাধীন Controller General of Accounts-এর কার্যালয় থেকে CRA এবং ট্রাস্টি ব্যাংককে অবহিত করা হয়েছে। একইভাবে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসগুলি সম্পর্কেও বিভিন্ন নির্দেশাবলী কেন্দ্রীয় কর্মী বিভাগের পক্ষ থেকে সকল রাজ্যের মুখ্যসচিবদের জানানো হয়েছে ২০০৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে।

জাতীয় পেনসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের অ্যাকাউন্ট রয়েছে : টিয়ার-১ এবং টিয়ার-২। টিয়ার-১ হল পেনসন অ্যাকাউন্ট, এই অ্যাকাউন্ট থাকলে টিয়ার-২ অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে যেটি হবে বিনিয়োগের ঐচ্ছিক অ্যাকাউন্ট। টিয়ার-১ অ্যাকাউন্ট থেকে আংশিক পরিমাণ অর্থ তোলা যাবে, যা কখনওই গ্রাহকের প্রদত্ত অর্থের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না। যেসব কারণে টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হবে সেগুলি হচ্ছে : সন্তানদের উচ্চশিক্ষা ও বিবাহ, গৃহ নির্মাণ বা ক্রয় এবং গ্রাহক বা তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে বা নির্ভরশীল পিতামাতার নির্দিষ্ট রোগব্যাধির চিকিৎসা। দুর্ঘটনা ও জীবননাশের ঝুঁকি রয়েছে এমন পরিস্থিতিতেও টাকা তোলার সংস্থান রয়েছে। সমগ্র পুঞ্জীকরণপর্বে সর্বোচ্চ তিনবারের জন্য টাকা তোলা যাবে এবং পেনসন ব্যবস্থায় যোগদানের তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর প্রথমবার টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হবে। টিয়ার-১ অ্যাকাউন্ট থেকে আংশিক টাকা তোলার ব্যাপারে পূর্ণ কর রেহাই এবং টিয়ার-২ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ জমা ও টাকা তোলার পূর্ণ শিথিলতা-সহ স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের সুযোগ রয়েছে। টিয়ার-২-তে অবশ্য টাকা জমা এবং টাকা তোলার ক্ষেত্রে কর বিয়োজনের কোনও সংস্থান নেই।

ষাট বছরে পৌঁছোনোর পর গ্রাহকরা তাদের PRAN-এ সঞ্চিত ব্যালেন্সের ন্যূনতম ৪০ শতাংশ পর্যাবৃত্ত পেনসনের জন্য সালিয়ানা বা অ্যানুইটাইস করতে পারবেন এবং অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ এককালীন তুলে নিতে পারবেন। তুলে নেওয়া টাকার ৪০ শতাংশের ওপর কর রেহাই মিলবে।

সালিয়ানা করা অর্থেও কর রেহাই-এর সুযোগ থাকবে। ষাট বছর হবার আগে সরে যেতে চাইলে গ্রাহককে তার জমা অর্থের অন্তত ৮০ শতাংশ অ্যানুয়িটি কেনার জন্য বিনিয়োগ করতে হবে এবং বাকি ২০ শতাংশ এককালীন তোলা যাবে। ষাট বছর পূর্ণ হবার আগে যদি কোনও গ্রাহকের মৃত্যু হয়, তাহলে নমিনি বা মনোনীত ব্যক্তি কোনও রকম কর প্রদান ব্যতিরেকেই সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ পাবেন।

অনাবাসী ভারতীয়রাও প্রতিবাসনযোগ্য বা অপ্রতিবাসনযোগ্য পদ্ধতিতে জাতীয় পেনসন ব্যবস্থায় অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ পাঠাতে হবে নিজেদের NRE/FCNR/NRO অ্যাকাউন্টের মারফত। অপ্রতিবাসনযোগ্য পেনসন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তি বা আংশিক পরিমাণ টাকা তোলার ব্যাপারে পেনসনের গচ্ছিত অর্থ শুধুমাত্র NRO অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। একমাত্র ব্যক্তিগত নামেই NPS অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে এবং অ্যাকাউন্টটি পরিচালনার ব্যাপারে Power of Attorney-র কোনও ভূমিকা থাকবে না। পরিষেবা প্রদানকারীর সাহায্যে বিদেশে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় টিয়ার-১ অ্যাকাউন্টের জন্য ন্যূনতম ৬ হাজার টাকা, টিয়ার-২-এর জন্য ২ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বার্ষিক বা তারও কম সময়ের ব্যবধানে গ্রাহকরা টাকা জমা দিতে পারবেন। গ্রাহকদের নথিভুক্তকরণের সময় PoP-কে পরিষেবা চার্জ দিতে হবে মার্কিন ৮ ডলার বা সমমূল্যের স্থানীয় কারেন্সিতে এবং প্রাথমিক ও পরবর্তী জমার ক্ষেত্রে মোট প্রেরিত অর্থের ১ শতাংশ হারে (এক্ষেত্রে ন্যূনতম চার্জ হবে মার্কিন ১ ডলার বা সমমূল্যের স্থানীয় কারেন্সি এবং সর্বোচ্চ মার্কিন ৮ ডলার বা সমমূল্যের স্থানীয় কারেন্সি)। প্রতিটি নন-ফাইন্যান্সিয়াল লেনদেনের ক্ষেত্রে চার্জ দিতে হবে মার্কিন ১ ডলার ও সমমূল্যের স্থানীয় কারেন্সি। অ্যাকাউন্ট যদি ভারতে খোলা হয় তাহলে টিয়ার-১ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রারম্ভিক ও বার্ষিক জমা দিতে হবে যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১ হাজার টাকা।

সারণি-১
NPS-এর আওতায় গ্রাহক সংখ্যা, প্রদত্ত অর্থ ও পরিচালনাধীন সম্পদ

বিভাগ	গ্রাহক সংখ্যা		মোট রাশি		মোট পরিচালনাধীন সম্পদ	
	চূড়ান্ত সংখ্যা	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ
কেন্দ্রীয় সরকার	১,৮১৯,৪৫৭	১৭.০	৫১,৩৩২	৩৬.১	৭০,৯৬৫	৩৮.৪
রাজ্য সরকার	৩,৪১২,৪৮৬	৩১.৮	৭২,৩৩১	৫০.৮	৯১,৫৯৫	৪৯.৫
উপ-মোট সংখ্যা	৫,২৩১,৯৪৩	৪৮.৮	১২৩,৬৬৩	৮৬.৯	১৬২,৫৬১	৮৭.৯
কর্পোরেট	৬০৮,৪৩৪	৫.৭	১২,৯৫০	৯.১	১৬,০৯১	৮.৭
অসংগঠিত	৪৬০,৪৬৮	৪.৩	৩,৩৮৭	২.৪	৩,৫২০	১.৯
উপ-মোট সংখ্যা	১,০৬৮,৯০২	১০.০	১৬,৩৩৭	১১.৫	১৯,৬১০	১০.৬
এন.পি.এস. লাইট	৪,৪২৪,৮০৬	৪১.৩	২,২৬৩	১.৬	২,৭৭৭	১.৫
মোট	**১০,৭২৫,৬৫১**	**১০০.০**	**১৪,২৬৩**	**১০০.০**	**১৮৪,৯৪৮**	**১০০.০**
অটল পেনসন যোজনা	৫,৩৭২,৬১৮		২,০৭৭		২,২০৩	
মোট সংখ্যা	**১৬,০৯৮,২৬৯**		**১৪৪,৩৪০**		**১৮৭,১৫১**	

জাতীয় পেনশন ব্যবস্থায় কর্মীদের বেতন থেকে (মহার্ঘভাতা-সহ মূল বেতন) প্রদত্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আয়কর আইনের 80CCD(1) ধারা অনুযায়ী কর বিয়োজনযোগ্য তবে 80CCE অনুযায়ী সর্বোচ্চ সীমা বা সিলিং রয়েছে দেড় লক্ষ টাকার। আইনের 80CCD(2) অনুযায়ী একজন কর্মী তার জমা দেওয়া অর্থের মূল বেতন ও মহার্ঘভাতার ১০ শতাংশ অবধি কর বিয়োজনের আওতায় পড়বেন তবে এ ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক সীমা থাকবে না। এছাড়া 80CCD(1B)-এর আওতায় ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেড় লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেলেও অতিরিক্ত বিয়োজনের সংস্থান রয়েছে। সুতরাং NPS-এ নিজের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে মোট ২ লক্ষ টাকা বিয়োজন করা সম্ভব। স্বনিয়োজিত ব্যক্তিদের স্বার্থে ২০১৭-এর অর্থ আইন অনুযায়ী বিয়োজনের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে মোট ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। নিয়োগকর্তারাও কর্মীদের মূল বেতন ও মহার্ঘভাতার ১০ শতাংশ পর্যন্ত পেনসন অ্যাকাউন্টে জমা দেবার ক্ষেত্রে তাদের দেয় অংশকে আইনের 36(1)(iv)(a) ধারা অনুযায়ী বাণিজ্য ব্যয় হিসাবে দেখিয়ে কোনও ঊর্ধ্বসীমা ব্যতিরেকেই বিয়োজনের সুযোগ নিতে পারেন।

জাতীয় পেনসন ব্যবস্থায় অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে CRA কর্তৃক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা ও লেনদেন চার্জ, PoP দ্বারা অর্থ প্রেরণ চার্জ, পেনসন তহবিলের বিনিয়োগে পরিচালনা ব্যয় বা ফি, তত্ত্বাবধায়ক বা Custodian-এর সম্পদ পরিচালনা ফি, NPS ট্রাস্টের পরিষেবা চার্জ ইত্যাদির জন্য সব মিলিয়ে যে খরচ পড়ছে তা হল সমগ্র পরিচালনাধীন সম্পদের ০.৫ শতাংশেরও কম। বিমা সংস্থা ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলি তাদের অবসরকালীন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ফি ও চার্জ নিয়ে থাকে তার সঙ্গে তুলনায় NPS-এর চার্জকে সর্বনিম্ন বলা যেতে পারে।

সরকারি ক্ষেত্রের গ্রাহকদের বিনিয়োগ বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে সরকারি কর্মীদের NPS-এ প্রদত্ত অর্থ তিনটি পেনসন তহবিলে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এগুলি হল : SBI পেনসন তহবিল, UTI অবসরকালীন প্রকল্প এবং LIC পেনসন তহবিল। বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে পূর্ববর্তী বছরের কাজকর্মের নিরিখে। PFRDA-এর বিনিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী মেনে ওই সব তহবিল থেকে লগ্নি করা হয়

নিম্নে বর্ণিত সম্পদ শ্রেণি ও অনুপাত ভিত্তিতে :

(ক) সরকারি সিকিউরিটিজ ও অন্যান্য আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্টে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত;

(খ) ডেট বা ঋণ ইনস্ট্রুমেন্টে ও ওই জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্টে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত;

(গ) ইক্যুইটি ও ওই জাতীয় ইনস্ট্রুমেন্টে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত;

(ঘ) স্বল্পমেয়াদি ঋণ ইনস্ট্রুমেন্টে ও ওই জাতীয় বিনিয়োগে ৫ শতাংশ পর্যন্ত;

(ঙ) সম্পদ-সমর্থিত ট্রাস্ট কাঠামোযুক্ত ও বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগে ৫ শতাংশ পর্যন্ত।

সরকারি কর্মীরা বাদে অন্য গ্রাহকরা আটটি পেনসন তহবিল থেকে বাছাই করার সুযোগ পাবেন। এগুলি হল : HDFC Pension Management Co. Ltd., ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd., Kotak Mahindra Pension Fund Ltd., LIC Pension Fund Ltd., Reliance Capital Pension Fund Ltd., SBI Pension Funds Pvt. Ltd., UTI Retirement Solutions Ltd. এবং Birla Sun Life Pension Management Ltd.। সর্বোপরি এই শ্রেণিভুক্ত গ্রাহকরা তাদের তহবিল থেকে বিনিয়োগের ধরন বা বিন্যাসও বেছে নিতে পারবেন। বাছাই করা যেতে পারে একটি কম্পোজিট পোর্টফোলিও যাতে থাকবে ইক্যুইটি শেয়ার, সরকারি সিকিউরিটিজ ও কর্পোরেট বন্ড, তবে ইক্যুইটি শেয়ার ৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। অন্যদিকে সরকারি সিকিউরিটিজ বা কর্পোরেট বন্ড-ডিবেঞ্চারের প্রতিটির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বিকল্পরূপে কোনও গ্রাহক ইচ্ছা করলে Life Cycle ফান্ডও বেছে নিতে পারেন।

চলতি বছরের তেসরা জুন অবধি গৃহীত হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় পেনসন ব্যবস্থার আওতায় গ্রাহকের সংখ্যা ১০.৭ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে, যাদের জমা করা অর্থ এবং মোট পরিচালনাধীন সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ১৪২২৬৩ কোটি টাকা এবং ১৮৪৯৪৮ কোটি টাকা। মোট গ্রাহক সংখ্যার ৪৯ শতাংশই হলেন সরকারি কর্মী, যাদের দখলে রয়েছে মোট পরিচালনাধীন সম্পদের ৮৮ শতাংশ। যদি অটল পেনসন যোজনার গ্রাহক সংখ্যা, তাদের প্রদত্ত অর্থ, মোট পরিচালনাধীন সম্পদের হিসাব যোগ করা হয়, তাহলে চূড়ান্ত গ্রাহক সংখ্যা, প্রদত্ত অর্থ ও মোট পরিচালনাধীন সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৬.১ মিলিয়ন, ১৪৪৩৪০ কোটি টাকা ও ১৮৭১৫১ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে বিভাগীয় খুঁটিনাটি ১ নং সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় পেনসন ব্যবস্থা বা NPS-এর পোর্টফোলিও-কে বিভিন্ন শ্রেণির সম্পদ ও সিকিউরিটিজে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র পেনসন ব্যবস্থায় পোর্টফোলিওর প্রায় ১৩.৫ শতাংশকে ইক্যুইটি শেয়ার, প্রায় ৪৮ শতাংশকে সরকারি সিকিউরিটিজে, ৩৫.৫ শতাংশকে কর্পোরেট বন্ড ও অবশিষ্টাংশকে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক বাজারস্থ ইনস্ট্রুমেন্টগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সর্বোপরি কর্পোরেট বন্ড পোর্টফোলিও-র প্রায় ৯৮ শতাংশকে বিনিয়োগ করা হয়েছে উচ্চ রেটিং-প্রাপ্ত সিকিউরিটিজে।

জাতীয় পেনসন ব্যবস্থার আওতায় CG (কেন্দ্র সরকার) ও SG (রাজ্য সরকার) প্রকল্পগুলিতে গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে চলতি বছরের এপ্রিল অবধি গড় বার্ষিক রিটার্ন (চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক গ্রোথ—CAGR) ১০ শতাংশের বেশি। এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি তথ্য ২ নং সারণিতে উল্লেখ করা হল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কর রেহাই এবং ৫০ হাজার টাকা বিশেষ আয়কর বিয়োজন ছাড়াও জাতীয় পেনসন ব্যবস্থায় রয়েছে সহজ কাঠামো, স্বচ্ছতা, বিভিন্ন স্থানে Portability বা বহনযোগ্যতা, পেনসন তহবিল ও বিনিয়োগ বিন্যাস বাছাই করার সুযোগ, পরিচালন ব্যয়ের স্বল্পতা এবং আকর্ষণীয় রিটার্ন বা ফেরত পাবার সুযোগ। ব্যবস্থাটি গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার এগুলিই আসল কারণ।❑

সারণি-২
গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে প্রকল্পভিত্তিক ও PF-ভিত্তিক রিটার্ন
২৯ এপ্রিল, ২০১৭-এর হিসাব অনুযায়ী

পেনসন তহবিল		এসবি আই	ইউটি আই	এলআই সি	কোটাক	রিলায়েন্স	আইসি আইসি আই	এইচডি এফসি
কেন্দ্রীয় সরকার		১০.৪৩	১০.০৬	১০.১৩				
রাজ্য সরকার		১০.০৪	১০.১১	১০.২৩				
কর্পোরেট কেন্দ্রীয় সরকার		১০.৬১		১০.৭৯				
টিয়ার-১	ই	৯.৬৯	১১.৮১	১৩.৮৯	১০.৯৪	১১.০১	১১.৮৪	১৬.৮০
	সি	১১.১৪	৯.৭৯	১১.৬১	১১.০৬	৯.৬৭	১১.১১	১১.৬৫
	জি	১০.০৬	৮.৭৫	১২.৪৪	৮.৯৬	৮.৬৩	৯.০৩	১১.০৪
টিয়ার-২	ই	৯.৩৩	৯.৬৪	৮.৯১	১০.০৮	৯.৫৯	৯.৩১	১২.৩১
	সি	১০.৮০	৯.৯৯	৯.৯৪	৯.৮০	৯.৪৪	১১.০৪	৯.৯০
	জি	১০.২৯	৯.৮৬	১২.৬৩	৮.৮২	৮.৯৫	৯.২০	১১.৬৫
এনপিএস স্বাবলম্বন		**১১.১০**	**১০.৯৬**	**১০.৯২**	**১১.১৮**			

সূত্র : www.npst.org.in

ভূসংস্থান

বৃহত্তর অর্থে 'ভূসংস্থান' (Topography) বলতে বোঝায় ভূপৃষ্ঠ বিষয়ে বিশদে অধ্যয়ন। যা কিনা কোনও ভূখণ্ডের ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে পড়ছে পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, নদী, জলাশয়, সাগর ও মহাসাগর; তা ছাড়াও সড়ক, সেতু, বাঁধ, রেল-লাইন, শহরের মতো মনুষ্যসৃষ্ট ভৌত পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যগুলিও।

ভূসংস্থানের উদ্দেশ্য কোনও ভূবৈচিত্র্যের অবস্থান, যেমন কিনা তার অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে) উচ্চতা নির্ধারণ করা। এর সঙ্গে (জমিজমা) জরিপের পদ্ধতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ভূপৃষ্ঠে কোনও একটি বিন্দুর সাপেক্ষে আরেকটির অবস্থান নির্ধারণ ও তা লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিই হল জরিপ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, পরিবেশগত ব্যবস্থাপক ও নগর পরিকল্পকদের পাশাপাশি বহির্জগৎ বিষয়ে অত্যুৎসাহী মানুষজন, আপৎকালীন পরিষেবা প্রদানকারী এজেন্সিগুলি ও ইতিহাসবিদরা ভূসংস্থানিক মানচিত্র (Topographic map) ব্যবহার করে থাকেন। এটি ত্রিমাত্রিক ভূপৃষ্ঠের দ্বিমাত্রিক প্রতিরূপ। সমোন্নতি রেখা, বর্ণ, প্রতীক, লেবেল ও অন্যান্য ভৌগোলিক উপস্থাপনার মাধ্যমে ভূসংস্থানিক মানচিত্র ভূপৃষ্ঠের উপরকার কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যসমূহের আকার ও অবস্থানকে চিহ্নিত করে থাকে।

ভূসংস্থানের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল প্রত্যক্ষ জরিপ (Direct Survey)। এই পদ্ধতিতে দূরত্ব ও কোণ পরিমাপ করতে *'theodolite'*-এর মতো যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। 'Digital Imaging System'-সহ সব ধরনের ভূসংস্থানিক মানচিত্র তৈরির জন্য প্রাথমিক তথ্য এভাবেই সংগৃহীত হয়। আর এই তথ্যাদির সঙ্গে 'aerial photography' বা 'satellite imagery'-র মতো অন্যান্য ব্যবস্থার মিলমিশ করে কোনও বিশেষ ভূতল বা ভূখণ্ডের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। সাগর-মহাসাগরের পরিমাপ করা হয় 'sonar mapping'-এর সাহায্যে। সাগরের

জলের নিচে কোনও স্পিকার থেকে শব্দ তরঙ্গ নির্গত হয়। এই তরঙ্গ জলের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সমুদ্রতল, প্রবাল দ্বীপ/প্রাচীর, বা ডুবোজাহাজের মতো বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই শব্দ microphone দ্বারা পরিমাপ করা হয়। প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা যে বস্তুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। জলের নিচের ভূখণ্ডের মানচিত্রে পরিবর্তন সাধনে এই তথ্য ব্যবহার করা হয়।

প্রযুক্তির অগ্রগতির দৌলতে এখন 'Global Positioning System' (GPS)-এর মাধ্যমে ক্ষেত্রীয় জরিপের কাজে, এমন কি প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকাতেও, যেখানে সাবেক পদ্ধতিতে জরিপের কাজ চালানো অসম্ভব, সেখানেও কয়েক ফুট পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে আনুভূমিক অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে। 'Navigational satellite'-এর সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের সাহায্যে কাজ করে এই GPS ব্যবস্থা। কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে কোনও ত্রিমাত্রিক নির্মাণের ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরির জন্য উপগ্রহ বা অন্য কোনও মহাকাশযান থেকে তোলা চিত্র ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা 'Aerial photography' ও 'photogrammetry' (জরিপ ও মানচিত্র বানানোর জন্য তোলা ছবি) ছবি মিশিয়ে 'triangulation' প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ভূবৈচিত্র্যের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন ধরনের সেন্সর বহনকারী অন্যান্য উপগ্রহের দৌলতে খুব জলদিই হয়তো মানচিত্র তৈরির জন্য 'Aerial photography' পদ্ধতি ব্যবহারে ইতি টানা হবে। মানচিত্র প্রস্তুত বা তা হালনাগাদ করার জন্য এর ফলে অনেক কম সময় প্রয়োজন হবে। একই সাথে সার্বিক ভাবে তা আরও নিখুঁত ও অভ্রান্ত হবে। ❑

সংকলক : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : গভর্নর জেনারেল

১. কোন আইন বলে গভর্নর জেনারেল অফ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল পদটিকে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া পদে উন্নীত করা হয়?

২. ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে?

৩. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে পূর্ত দপ্তর (Public Works Department, PWD) স্থাপন করা হয়?

৪. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেলের শাসনকালে ICS-এ প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু করা হয়?

৫. কোন আইন বলে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার সাথে ভাইসরয়, এই অতিরিক্ত উপাধি যুক্ত করা হয়?

৬. ভারতের প্রথম ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কে?

৭. ভারতের কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের শাসনকালে 'ভারতীয় দণ্ড সংহিতা' (Indian Penal Code) আইনে পরিণত হয়?

৮. ভারতের কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের শাসনকালে প্রথম নিয়মিত জনগণনা শুরু হয়?

৯. লিভ ভ্যাকান্সিতে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল?

১০. কোন গভর্নর জেনারেল (অফ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল)-কে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনক বলা হয়?

১১. কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়?

১২. কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে ভারত ও আফগানিস্থানের সীমান্ত নির্ধারক ডুরান্ড লাইন স্থির করা হয়?

১৩. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য প্রণীত ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৪৮) কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়?

১৪. কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়?

১৫. আর্মস অ্যাক্ট (১৮৭৬)-লাইসেন্স ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ভারতীয়দের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ, এই আইন কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে লাগু হয়?

১৬. কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়?

১৭. একমাত্র কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল কর্মরত অবস্থায় নিহত হন?

১৮. কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে বার্মা ভারত থেকে পৃথক হয় (১৯৩৫ সালে)?

১৯. কোন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেলের আমলে সেনাবাহিনীতে প্রথম ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করা হয়?

২০. ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল কে?

উত্তর :

১. ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন। ২. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮৩৩-'৩৫ সাল)। ৩. লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-'৫৬ সাল)। ৪. লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-'৫৬ সাল)। ৫. দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য বেটার গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া (১৮৫৮)। ৬. লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-'৬২ সাল)। ৭. লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮ সালে; এই সংহিতা তৈরি করেছিলেন টমাস ব্যারিংটন মেকলে)। ৮. লর্ড রিপন (১৮৮১ সালে)। ৯. লর্ড রিপন (১৮৮০-'৮৪ সাল)। ১০. লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-'৯৩ সাল)। ১১. লর্ড হার্ডিঞ্জ (দ্বিতীয়) (১৯১০-'১৬ সাল)। ১২. লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-'৯৪ সাল)। ১৩. লর্ড রিপন (১৮৮০-'৮৪ সালে)। ১৪. লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪-'৮৮ সাল)। ১৫. লর্ড লিটন (১৮৭৬-'৮০ সাল)। ১৬. লর্ড হার্ডিঞ্জ (দ্বিতীয়) (১৯১০-'১৬ সাল)। ১৭. লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-'৭২ সাল) (আন্দামানে এক পাঠান বন্দির ছুরিকাঘাতে)। ১৮. লর্ড ওয়েলিংটন (১৯৩১-'৩৬ সাল)। ১৯. লর্ড রিডিং (১৯২১-'২৫ সাল)। ২০. চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (জুন, ১৯৪৮-জানুয়ারি, ১৯৫০)।❑

ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

আগামী ১৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ভোটগ্রহণ। বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই ২০ জুলাই ফলাফল ঘোষিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হল এবারের যোজনা নোটবুক-এ।

ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ গ্রেট ব্রিটেনের আদলে গঠিত হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনের রানির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রের শাসনবিভাগের আলঙ্কারিক বা আনুষ্ঠানিক প্রধান। ড. বি আর আম্বেদকরের মতে, ভারতের সংবিধানে 'রাষ্ট্রপতি' শব্দটি যুক্ত করা হলেও মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার ক্ষমতা ও ভূমিকার কোনও মিল নেই। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের রাজা বা রানির মতোই রাষ্ট্রের প্রধানের ভূমিকা পালন করেন। তিনি বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রের শাসনবিভাগের প্রধান নন।

● **রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা :** ভারতের সংবিধানের ৫৮নং ধারায় রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতার বিষয়ে উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী হতে হলে কোনও ব্যক্তিকে (১) ভারতের নাগরিক হতে হবে; (২) অন্তত ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে; (৩) লোকসভায় নির্বাচিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে; (৪) তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কোনও লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকতে পারবেন না; (৫) তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনসভার কোনও কক্ষের সদস্য থাকতে পারবেন না; (৬) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর নাম নির্বাচক সংস্থার অন্তত ৫০ জন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ৫০ জন কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় ১৫,০০০ টাকা জমা দিতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লোকসভা, রাজ্যসভা অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোনও কক্ষের সদস্য যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন, তাহলে যেদিন তিনি রাষ্ট্রপতিপদে শপথ গ্রহণ করবেন সেই দিনই তিনি ওই সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হবে [৫৯নং ধারা]।

● **রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি :** ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral College) কর্তৃক সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট (Proportional Representation by means of a Single Transferable Vote)-এর মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

● **রাষ্ট্রপতি কাদের ভোটে নির্বাচিত হন?** ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন না। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

● **রাষ্ট্রপতি কাদের দ্বারা নির্বাচিত হন?** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য বা বিধায়কগণ এবং সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ভোট দিতে পারেন।

● **রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সকল কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিধানসভার সদস্যদের ভোটাধিকার আছে কি?** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সকল কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিধানসভার সদস্যদের ভোটাধিকার নেই। সংবিধানের ৭০-তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫নং ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে যে 'জাতীয় রাজধানী ভূখণ্ড (National Capital Territory) হিসাবে দিল্লি এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে একমাত্র পুদুচেরির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের বা বিধায়কদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার আছে।

উপরোক্ত সংশোধনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে-ভাবে অঙ্গরাজ্যের বিধায়কদের ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত হবে সেই পদ্ধতি অনুসারে দিল্লি ও পুদুচেরির বিধায়কদের ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত হবে।

● **বিধানসভার সদস্যদের ভোটের সংখ্যা নির্ধারণ :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি নির্বাচক সংস্থার দ্বারা। কীভাবে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়? রাজ্য বিধানসভা ও সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং দিল্লি ও পুদুচেরির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যে, সংবিধানে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যার সঙ্গে সংসদের সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যার সমতা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের সংখ্যা নির্বাচনের জন্য একটি ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যার দ্বারা ভাগ করতে হয়। ওই ভাগফলকে পুনরায় ১,০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগফল যা হবে সেই সংখ্যাই হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মোট বিধায়কদের মোট ভোটের মূল্য। এক্ষেত্রে ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয় তাহলে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত হবে।

সংক্ষেপে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি হল :

$$\frac{\text{রাজ্যের মোট জনসংখ্যা}}{\text{বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা}} \div ১০০০$$

● **সংসদের সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারণ :** সংবিধানে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটের সংখ্যা নির্ধারণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রথমে সব বিধানসভার মোট নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যাকে সংসদের উভয় কক্ষের মোট নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক বা তার বেশি হয় তাহলে সংসদের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোট সংখ্যার সঙ্গে একটি করে ভোট যুক্ত হবে।

● **ভোটদান ও গণনা :** এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ধরা যাক, বিধানসভা ও সংসদের প্রতিটি সদস্যের ভোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫১ এবং ৭০৬। এবার ভোট দেবার সময় কোনও বিধায়ক ও সাংসদ যে প্রার্থীকে ভোট দেবেন তিনি কি ১৫১-টি বা ৭০৬-টি ভোটপত্রে ভোট দেবেন? না। তিনি যে প্রার্থীকে ভোট দেবেন তার ভোটের সংখ্যা হবে ১৫১-টি বা ৭০৬-টি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায় হল ভোটদান। গোপন ভোটে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটদানের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একক হস্তান্তরযোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচনে যতজন প্রার্থী থাকবেন প্রতিটি ভোটদাতা ইচ্ছা করলে ততগুলি পছন্দ (preference) জানাতে পারবেন। ভোটদাতা প্রার্থীদের নামের পাশে তার পছন্দ অনুযায়ী ১,২,৩,৪ লিখে পছন্দ জানাতে পারবেন। ভোটদাতাকে কোনও-না-কোনও প্রার্থীর নামের পাশে ১ লিখে নিজের প্রথম পছন্দ জানাতেই হবে। তা না হলে তার ভোটপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এইভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় ভোটগণনার পালা। রাষ্ট্রপতিপদে কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত হতে হলে কোটা (Quota) পেতে হবে। কোটা নির্ধারণের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে : বাতিল ভোটপত্র বাদ দিয়ে বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত প্রথম পছন্দের সকল ভোট যোগ করা হয়। তারপর যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে কোটা স্থির করা হয়। এই পদ্ধতিটি সূত্রাকারে দেখানো যেতে পারে।

$$\text{কোটা} = \frac{\text{মোট বৈধ ভোট}}{২} + ১$$

ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে কোটা বলতে বোঝায় মোট বৈধ ভোট, অর্থাৎ ১০০-টি বৈধ ভোট যদি হয়, তাহলে নির্বাচিত হওয়ার জন্য $\frac{১০০}{২} + ১ = ৫১$-টি ভোট প্রার্থীকে পেতে হবে। কোনও প্রার্থী এই কোটা পেলে তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। যদি কোনও প্রার্থীই নির্দিষ্ট কোটা না পান তবে যিনি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দিয়ে তার ভোটপত্রে প্রদত্ত দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলি পছন্দানুসারে অন্যান্য প্রার্থীদের পক্ষে হস্তান্তর করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও প্রার্থী কোটায় পৌঁছতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থী বাদ এবং ভোট হস্তান্তর বজায় থাকে। উল্লেখ্য ১৯৬৯ সালের নির্বাচন ছাড়া অন্যান্য নির্বাচনে রাষ্ট্রপতিরা প্রথম পছন্দের ভোটেই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১২ সালে ১৪তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রণব মুখোপাধ্যায় মোট পেয়েছিলেন ৭,১৩,৭৬৩ মূল্যের ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ণ অ্যাজিটক সাংমা পেয়েছিলেন ৩,১৫,৯৮৭ মূল্যের ভোট। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টে কোনও মামলা দায়ের করা হলে সুপ্রিম কোর্ট ওই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। তবে অদ্যাবধি এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুর ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ৬ মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কাজ শেষ করতে হয়। ❑

● রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০১৭ ●

রাইসিনা হিলসের পরের বাসিন্দা কে হবেন, তা স্থির করার নির্ঘণ্ট ৮ জুন ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ভোট হবে ১৭ জুলাই। আর নতুন রাষ্ট্রপতি রাইসনা হিলসের বাসভবনে পা দেবেন তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, ১৪ জুন বিজ্ঞপ্তি জারির পরে ২৮ জুনের মধ্যে মনোনয়ন পেশ করতে হবে। উল্লেখ্য, বিহারের রাজ্যপাল রামনাথ কোবিন্দকে এনডিএ-র রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে বিজেপি। আর বিরোধী জোটের প্রার্থী লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার মীরা কুমার। এদিকে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাংসদ ও বিধায়কদের আলাদা আলাদা রঙের ব্যালট পেপার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সাংসদদের জন্য সবুজ রঙের ব্যালট থাকবে আর বিধায়কদের জন্য থাকবে গোলাপি রঙের ব্যালট। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, অরুণাচলপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির জন্য ব্যালট ইংরেজি ও হিন্দিতে ছাপা হবে। আর অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, গোয়া, গুজরাত, জম্মু-কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, ওড়িশা, পাঞ্জাব, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও পুদুচেরির ব্যালট ইংরেজি এবং হিন্দির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষাতেও ছাপা হবে। এবার বিশেষ পেন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ওই বিশেষ পেন দিয়েই ভোটারকে ভোট দিতে হবে। না হলে সেই ভোট বাতিল হবে।

২০১৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
বিধায়কদের ভোটের মূল্য
[সংবিধানের ৫৫(২) ধারা অনুযায়ী]

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য/অঞ্চল	বিধায়ক সংখ্যা (নির্বাচিত)	জনসংখ্যা (১৯৭১ আদমশুমারি)	বিধায়ক পিছু ভোটের মূল্য	রাজ্যের মোট ভোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৭৫	২৭৮০০৫৮৬	১৫৯	১৫৯ × ১৭৫ = ২৭৮২৫
২.	অরুণাচলপ্রদেশ	৬০	৪৬৭৫১১	৮	০০৮ × ০৬০ = ৪৮০
৩.	আসাম	১২৬	১৪৬২৫১৫২	১১৬	১১৬ × ১২৬ = ১৪৬১৬
৪.	বিহার	২৪৩	৪২১২৬২৩৬	১৭৩	১৭৩ × ২৪৩ = ৪২০৩৯
৫.	ছত্রিশগড়	৯০	১১৬৩৭৪৯৪	১২৯	১২৯ × ০৯০ = ১১৬১০
৬.	গোয়া	৪০	৭৯৫১২০	২০	০২০ × ০৪০ = ৮০০
৭.	গুজরাট	১৮২	২৬৬৯৭৪৭৫	১৪৭	১৪৭ × ১৮২ = ২৬৭৫৪
৮.	হরিয়ানা	৯০	১০০৩৬৮০৮	১১২	১১২ × ০৯০ = ১০০৮০
৯.	হিমাচলপ্রদেশ	৬৮	৩৪৬০৪৩৪	৫১	০৫১ × ০৬৮ = ৩৪৬৮
১০.	জম্মু ও কাশ্মীর	৮৭	৬৩০০০০০	৭২	০৭২ × ০৮৭ = ৬২৬৪
১১.	ঝাড়খন্ড	৮১	১৪২২৭১৩৩	১৭৬	১৭৬ × ০৮১ = ১৪২৫৬
১২.	কর্ণাটক	২২৪	২৯২৯৯০১৪	১৩১	১৩১ × ২২৪ = ২৯৩৪৪
১৩.	কেরালা	১৪০	২১৩৪৭৩৭৫	১৫২	১৫২ × ১৪০ = ২১২৮০
১৪.	মধ্যপ্রদেশ	২৩০	৩০০১৬৬২৫	১৩১	১৩১ × ২৩০ = ৩০১৩০
১৫.	মহারাষ্ট্র	২৮৮	৫০৪১২২৩৫	১৭৫	১৭৫ × ২৮৮ = ৫০৪০০
১৬.	মণিপুর	৬০	১০৭২৭৫৩	১৮	০১৮ × ০৬০ = ১০৮০
১৭.	মেঘালয়	৬০	১০১১৬৯৯	১৭	০১৭ × ০৬০ = ১০২০
১৮.	মিজোরাম	৪০	৩৩২৩৯০	৮	০০৮ × ০৪০ = ৩২০
১৯.	নাগাল্যান্ড	৬০	৫১৬৪৪৯	৯	০০৯ × ০৬০ = ৫৪০
২০.	ওড়িশা	১৪৭	২১৯৪৪৬১৫	১৪৯	১৪৯ × ১৪৭ = ২১৯০৩
২১.	পাঞ্জাব	১১৭	১৩৫৫১০৬০	১১৬	১১৬ × ১১৭ = ১৩৫৭২
২২.	রাজস্থান	২০০	২৫৭৬৫৮০৬	১২৯	১২৯ × ২০০ = ২৫৮০০
২৩.	সিকিম	৩২	২০৯৮৪৩	৭	০০৭ × ০৩২ = ২২৪
২৪.	তামিলনাড়ু	২৩৪	৪১১৯৯১৬৮	১৭৬	১৭৬ × ২৩৪ = ৪১১৮৪
২৫.	তেলেঙ্গানা	১১৯	১৫৭০২১২২	১৩২	১৩২ × ১১৯ = ১৫৭০৮
২৬.	ত্রিপুরা	৬০	১৫৫৬৩৪২	২৬	০২৬ × ০৬০ = ১৫৬০
২৭.	উত্তরাখন্ড	৭০	৪৪৯১২৩৯	৬৪	০৬৪ × ০৭০ = ৪৪৮০
২৮.	উত্তরপ্রদেশ	৪০৩	৮৩৮৪৯৯০৫	২০৮	২০৮ × ৪০৩ = ৮৩৮২৪
২৯.	পশ্চিমবঙ্গ	২৯৪	৪৪৩১২০১১	১৫১	১৫১ × ২৯৪ = ৪৪৩৯৪
৩০.	দিল্লি	৭০	৪০৬৫৬৯৮	৫৮	০৫৮ × ০৭০ = ৪০৬০
৩১.	পুদুচেরি	৩০	৪৭১৭০৭	১৬	০১৬ × ০৩০ = ৪৮০
	মোট	৪১২০	৫৪৯৩০২০০৫		= ৫৪৯৪৯৫

- লোকসভার ৫৪৩ সাংসদ ও রাজ্যসভার ২৩৩ সাংসদ মিলিয়ে মোট সাংসদ সংখ্যা = ৭৭৬
- বিধায়কদের সর্বমোট ভোট মূল্যকে মোট সাংসদ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। যথা,

  সাংসদ পিছু ভোটের মূল্য = $\frac{৫,৪৯,৪৯৫}{৭৭৬}$ = ৭০৮
- সব সাংসদদের ভোটের মোট মূল্য = ৭০৮ × ৭৭৬ = ৫,৪৯,৪০৮
- মোট নির্বাচক সংখ্যা = বিধায়ক (৪১২০) + সাংসদ (৭৭৬) = ৪৮৯৬
- ২০১৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৪৮৯৬ নির্বাচকের মোট ভোট মূল্য = ৫,৪৯,৪৯৫ (বিধায়ক) + ৫,৪৯,৪০৮ (সাংসদ) = ১০,৯৮,৯০৩

যোজনা ডায়েরি

(২১ মে—২০ জুন, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

➢ পাঁচ হাজার জঙ্গির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল ইসলামাবাদ। পাক দাবি, এর ফলে, সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাতে সমর্থক ও বিভিন্ন সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের দেওয়া অন্তত ৩০ লক্ষ ডলার অর্থ আর থাকল না পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গিদের হাতে। ঘটনাচক্রে, জুলাইয়েই স্পেনে বৈঠকে বসছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স। বিশ্বের নানা প্রান্তের নানা দেশে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন কীভাবে, কতটা আর্থিক মদত পাচ্ছে, তার ওপর নজর রাখে ৩৫-টি দেশকে নিয়ে গড়া ওই টাস্ক ফোর্স।

➢ তালিবান আতঙ্ক মুছে আফগানিস্তানে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যেই কাবুল প্রসেসের আয়োজন। ২৩-টি দেশের এই সম্মেলনে ভারতও অন্যতম অংশীদার। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘনি ৬ জুন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

➢ ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে খঞ্জর সেক্টরে সফররত রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক পর্যবেক্ষকদের গাড়ি লক্ষ্য করে গোলাগুলি চালিয়েছিল বলে পাক সেনাবাহিনী যে অভিযোগ করেছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে ২৪ মে সেক্রেটারি জেনারেলের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেই অভিযোগ নস্যাৎ করেন। উল্লেখ্য, ভিম্বার জেলার (পাকিস্তানে) বিভিন্ন এলাকা যখন ঘুরে দেখছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক পর্যবেক্ষকেরা, তখন তাদের গাড়ি এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছিল পাক সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি। সেই সময় পর্যবেক্ষকরা নিয়ন্ত্রণরেখায় গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলেও তাদের লক্ষ্য করেই সেই গোলাগুলি ছোঁড়া হচ্ছিল, এমন কোনও প্রমাণ তারা পাননি। সেই গোলাগুলিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের কোনও পর্যবেক্ষক আহতও হননি।

● **সাংহাই গোষ্ঠীতে পাক ও ভারত :**

বহু-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর প্রতিনিধিপদ পেল ভারত ও পাকিস্তান। রাশিয়া, চিন, ভারত, পাকিস্তান, কাজখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান—এই ৮ দেশ এখন সাংহাই জোটের পূর্ণাঙ্গ সদস্য। আরও ৪-টি দেশ রয়েছে পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে, ৬-টি দেশ রয়েছে ডায়লগ পার্টনার হিসেবে। অতিথি হিসেবেও এই সাংহাই জোটের অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু দেশ। ভারত ও পাকিস্তান আগে জোটের পূর্ণাঙ্গ সদস্য ছিল না। কাজখস্তানের আস্তানায় দু' দিনের (৮-৯ জুন) এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রেসিডেন্ট তথা সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি শি চিনফিং-এর সঙ্গে পার্শ্ব বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত, পাকিস্তান এবং ইরান-কে এনসিও-তে পরিদর্শক রাষ্ট্র হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল ২০০৫ সালে। শেষপর্যন্ত এসসিও-তে প্রবেশাধিকার পেল ভারত। একইভাবে ঢুকল পাকিস্তানও। এসসিও সদস্য হওয়ায় একাধিক লাভ ভারতের। ইউরোপের অনেক বহু-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর সদস্য হলেও, এত দিন মধ্য এশিয়া তথা পূর্ব ইউরোপের কোনও বড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল না ভারত। চিন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান—এসসিও-র সদস্য এই ছ'টি দেশের সঙ্গে আলাদাভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে ভারতের। এই গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার সুবাদে পৃথকভাবে দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্তরে বাণিজ্যিক, পরিবহণ, শক্তি এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যোগাযোগ বাড়বে।

● **ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভোট :**

গত ৮ জুন ভোট। গণনা হয় ৯ জুন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভোটে ৩১৮-টি আসন পেয়ে টেরেসা মে-র কনজারভেটিভ পার্টি বৃহত্তম দল হিসেবে এগিয়ে থাকে, তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে ত্রিশঙ্কু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যে কোনও দলের ৩২৬-টি আসন দরকার। আটটি আসনের ঘাটতি পূরণ করতে উত্তর আয়ারল্যান্ডের দল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ননিস্ট পার্টির সমর্থন জোগাড় করেন মে। তারা পেয়েছে দশটি আসন। আয়ারল্যান্ডের দলটিকে সঙ্গে নিয়েই সরকার গঠন করেন কনজারভেটিভ নেত্রী। অন্য দিকে, জেরেমি বানার্ড করবিনের লেবার পার্টি পেয়েছে ২৬১-টি, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি পেয়েছে ৩৫-টি এবং টিম ফ্যারনের লিবারেল ডেমোক্র্যাট পেয়েছে ১২-টি আসন।

ব্রিটেনে ভোটের ফল যাই হোক না কেন, তাতে জয়জয়কার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদেরই! ভোটে জিতে হাউস অব কমন্সে জায়গা করে নিলেন লেবার পার্টির প্রীত কউর গিল ও তনমনজিৎ সিংহ ধেসি। ফের জিতে নিজের আসন ধরে রাখলেন লেবার পার্টির প্রার্থী বঙ্গসন্তান লিসা নন্দীও। ২০১৫ সালে ভোটে জেতার পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জায়গা করে নিয়েছিলেন ১০ জন এমপি। এবার প্রীত ও তনমনজিতের জয়ের পরে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল ১২। প্রীতই প্রথম শিখ মহিলা যিনি এমপি

নির্বাচিত হলেন। কনজারভেটিভ পার্টির যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থীরা নিজেদের আগের আসনগুলি ধরে রেখেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মে সরকারের এশিয়া সংক্রান্ত মন্ত্রী অলোক শর্মা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সচিব প্রীতি পটেল ও ইনফোসিস কর্ণধার নারায়ণ মূর্ত্তির জামাই ঋষি সুনক পেয়েছেন উইদ্যাম এবং রিচমন্ড ইয়র্কশায়ার আসন। কেমব্রিজশায়ারের ওয়েস্ট সিটটি ধরে রেখেছেন শৈলেশ ভারাও। ফারহেমে ফের জয়ী হয়েছেন গোয়ার সুয়েল্লা ফার্নান্ডেজ। নিজেদের আসন ধরে রাখতে পেরেছেন লেবার পার্টির বহু প্রার্থীও। তাদের মধ্যে অন্যতম কিথ ভাজ। ১৯৮৭ থেকে পূর্ব লেস্টারে জিতে আসছেন কিথ। দক্ষিণ ওয়ালস্যাল আসন জিতেছেন কিথের বোন ভ্যালেরি ভাজও। ইলিং সাউথ হল আসনের প্রার্থী বীরেন্দ্র শর্মাও জিতেছেন।

পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। ফের জিতলেন মুজিবুর রহমানের নাতনি, প্রধানমন্ত্রী হাসিনার বোনঝি লেবার পার্টির টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকি। টিউলিপ ছাড়াও এই ভোটে নিজেদের আসন ধরে রাখলেন রুশনারা আলি এবং রূপা হক। তিন জনই ছিলেন লেবার পার্টির প্রার্থী। বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবান আসন থেকে জিতে এমপি হয়েছেন। রূপা জিতেছেন লন্ডনের ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাক্টন আসনে। আর উত্তর লন্ডনের বেথনাল অ্যান্ড গ্রিন বো আসন থেকে জয়ী হয়েছেন রুশনারা। রুপা ও রুশনারা এই নিয়ে তৃতীয়বার আর টিউলিপ দ্বিতীয়বারের জন্য এমপি হলেন। ব্রিটেনের ভোটে এবার মোট ১৪ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

● **ফ্রান্সে পার্লামেন্ট নির্বাচন :**

প্রেসিডেন্ট পদে জেতার পর ইমানুয়েল মাকরঁ-এর দলের জয়জয়কার ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনেও। French Fifth Republic-এর ১৫তম National Assembly-র জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচন হয় যথাক্রমে ১১ ও ১৮ জুন। প্রত্যাশা মতোই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে মাকরঁ-এর জোট। মাকরঁ-এর দল La République En Marche (REM) বা Republican on the Move ও জোট সঙ্গী Democratic Movement (MoDem) ৫৭৭-টির মধ্যে ৩৫০-টি আসন দখলে করেছে। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা (LR) পেয়েছে ১১২-টি আশন আর সোশ্যালিস্টরা পেয়েছে মাত্র ৩০-টি।

● **আয়ারল্যান্ডে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নতুন প্রধানমন্ত্রী :**

আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে ফিনে গেইল পার্টির সদস্য লিও ভারাদকর। তার ঠিক পিছনেই রয়েছেন সে দেশের আবাসনমন্ত্রী সিমন কনভেনেস। একটা সময় ছিল, সমকামী হওয়ার 'অপরাধে' আয়ারল্যান্ডে খুন হয়ে যেতে হ'ত। আর এখন সেই আয়ারল্যান্ডেরই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একজন সমকামী। ঘটনাচক্রে তিনি আবার ভারতীয় বংশোদ্ভূতও বটে।

২০১৫ সালে সে দেশে সমকামী বিয়ে বৈধতা পায়। তার আগে কেউ সমকামী, এ কথা প্রকাশ্যে এলেই তাকে সহ্য করতে হ'ত নানা রকমের হেনস্থা। সমকামী হওয়ার 'অপরাধে' ১৯৮৩ সালে ডেকল্যান ফ্লিন নামে এক ব্যক্তিকে খুব পর্যন্ত হতে হয়। কাজেই লিও-র মতো একজন সমকামী মানুষের সে দেশের অন্যতম শীর্ষ পদে বসাটাও আসলে বিশ্ব দরবারে আয়ারল্যান্ডকে এক ধাপ তুলে ধরল।

লিও-র জন্ম এক গুজরাতি পরিবারে। বাবা অশোক ভারাদকার মুম্বইয়ে থাকতেন। ব্যবসায়িক সূত্রে আয়ারল্যান্ডে এসে মিরিয়াম নামে এক মহিলার সঙ্গে বিয়ে। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্ম লিও-র। ডাবলিন থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। তখন সমকামিতা সে দেশে সামাজিক 'অপরাধ'। জানাজানি হলে আইনি দণ্ডও জুটত। এমন একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটেই প্রকাশ্যে নিজেকে সমকামী বলে জানান দিয়েছিলেন লিও।

সমকামীদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হন পরে। এই লড়াই আংশিক সাফল্য পায় ১৯৯৩ সালে সমকামিতা অপরাধ নয়, এ নিয়ে বিল পাস করে আয়ারল্যান্ড পার্লামেন্ট। সাম্যতা রক্ষার সেই আন্দোলন পূর্ণতা পায় ২০১৫ সালে। তার আগেই অবশ্য ওই বছরেই নির্বাচনে লড়েন লিও। পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীও হন। সে বছরই আয়ারল্যান্ডের ৭৬ শতাংশ মানুষ সমকামী বিয়ের পক্ষে ভোট দেন। জনগণের সেই রায়ের জেরেই আইনি সংশোধন আনে পার্লামেন্ট। সমকামী বিয়ে বৈধতা পায় আয়ারল্যান্ডে। জনগণের ভোটে বিশ্বের প্রথম সমকামী বিয়েতে বৈধতাপ্রাপ্ত দেশ হিসাবে নজির গড়ে তোলে।

● **প্রধানমন্ত্রীর চার দেশীয় সফর :**

গত ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জার্মানির উদ্দেশ্যে রওনা হন। তার পরবর্তী গন্তব্য ছিল স্পেন। ৩১ মে থেকে ২ জুন চলে রাশিয়া সফল। সফর শেষে ২-৩ জুন ছিলেন ফ্রান্স।

➲ **জার্মানি :** প্রধানমন্ত্রীর বার্লিন সফরের মূল লক্ষ্য বাণিজ্য। ৩০ মে নয়াদিল্লি-বার্লিনের মধ্যে সাক্ষরিত হয় আটটি চুক্তি। জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেলকে পাশে নিয়ে স্মার্ট সিটি, ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে স্বচ্ছ ভারতের মতো প্রকল্পগুলিতে আরও বেশি পরিমাণ লগ্নি করার জন্য জার্মান বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে গত তিন বছরে চারবার সাক্ষাৎ হল মোদি-মের্কেলের। এবার অবশ্য মোদী-মের্কেলের আলোচনা বাণিজ্যের মধ্যেই আটকে ছিল না। দুই শীর্ষ প্রধানের আলোচনায় আসে ফুটবল প্রসঙ্গও। ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নে জার্মানির সাহায্য চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে ২০১৭ গুরুত্বপূর্ণ বছর। ফিফা অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক ভারত। ভারতীয় ফুটবলকে গতিশীল করতে মোদী ভরসা রাখলেন ক্লিন্সম্যানের দেশের উপর। জারি হওয়া যৌথ বিবৃতিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বিষয়টিতে।

➲ **স্পেন :** প্রায় তিন দশকে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেন গেলেন। স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফেলিপের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী, প্রেসিডেন্ট মারিয়ানো রাজোয়ের সঙ্গেও আলোচনায় বসেন।

➲ **রাশিয়া :** গত ২ জুন তামিলনাড়ুর কুড়ানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আরও দু'টি চুল্লি গড়তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ভারত-রাশিয়া। দিল্লিকে তারা এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে মস্কো। ত্রিস্তরীয় এই ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা একসঙ্গে ৩৬-টি ক্ষেপণাস্ত্র নষ্ট করতে পারে বলে জানান প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞেরা। দাবি, এস-৪০০ হাতে এলে কৌশলগত দিক থেকে চিন ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকবে ভারত। সন্ত্রাস দমন নিয়েও যৌথ বিবৃতি দেয় দুই দেশ। এছাড়াও গাড়ি, বিমান তৈরি-সহ নানা ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গড়বে ভারত এবং রাশিয়া। গত কয়েক বছর ধরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক লেনদেন কমলেও, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে তা বেড়েছে ২৯ শতাংশ। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতে এই

পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে শুধু প্রতিরক্ষা নয়, আগামী দিনে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যৌথভাবে কাজের সুযোগ রয়েছে দুই দেশের সামনে। যার মধ্যে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তি, যোগাযোগ, ওষুধ, হিরে, কৃষি ইত্যাদি। মোদীর সফরে এই ক্ষেত্রগুলিতে ইতোমধ্যেই ১৯-টি চুক্তি সই করেছে ভারত ও রাশিয়ার বিভিন্ন সংস্থা। এছাড়াও করা হয়েছে মেধাসম্পদ রক্ষা নিয়ে চুক্তিও।

➲ **ফ্রান্স :** সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ সঙ্গে বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এটা অবশ্য তার তৃতীয় ফ্রান্স সফর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ২০১৫ সালে তার প্রথম ইউরোপ সফর তিনি শুরু করেন ফ্রান্স থেকেই। গত বছর রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি দ্বিতীয়বার প্যারিস যান।

● **মার্কিন ভিসা নীতিতে রদবদল :**

ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে আরও একগুচ্ছ প্রশ্ন জুড়তে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত ২৩ মে আমেরিকার ম্যানেজমেন্ট এবং বাজেট সংক্রান্ত দপ্তর এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আমেরিকায় আসতে ইচ্ছুক কোনও ভিসা প্রার্থীকে এবার থেকে যেমন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য মার্কিন অফিসারদের দিতে হবে, তেমনই গত ১৫ বছরে ওই আবেদনকারী কোন কোন দেশে ভ্রমণ করেছেন, তার তথ্যও তৈরি রাখতে হবে। মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা চাইলে ওই আবেদনকারীর আগেকার পাসপোর্ট নম্বরও জানতে চাইতে পারেন। মার্কিন আধিকারিকেরা আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিলেও অভিবাসন বিশেষজ্ঞেদের মতে, নতুন নিয়মের ফলে আমেরিকায় ঢোকার গোটা প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। আরও কঠিন হবে মার্কিন ভিসা পাওয়া। যাতে সমস্যায় পড়বেন বিশ্বের নানা প্রান্তের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। তবে, পরে সিলিকন ভ্যালির চাপের মুখে ভিসা নীতি নরম করার আভাস দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এইচ-১-বি ভিসা পেতে প্রতিভাবানদের কোনও সমস্যা হবে না—সিলিকন ভ্যালির কর্তাদের ট্রাম্প এমনই আশ্বাস দিয়েছেন। মার্কিন তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যদি মনে করে কোনও কর্মীকে বিদেশ থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তাহলে এইচ-১-বি ভিসা পেতে সেই সব কর্মীর কোনও সমস্যা হবে না। প্রতিভাবানদের 'স্পেশ্যাল পিপল' আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

● **সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট, কাতার-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক :**

সৌদি আরব, আরব আমিরশাহি, ইয়েমেন, বাহরিন, মিশর, লিবিয়া, মালদ্বীপ—এই সাত দেশ গত ৬ জুন কাতারের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে। দেশগুলির দাবি, আল কায়দা ও আইএস-এর মতো জঙ্গি গোষ্ঠীদের মদত দেয় কাতার। ইয়েমেনে হুথি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে কাতারকে। অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে কাতার। সাম্প্রতিককালে আরব দুনিয়ায় এমন রাজনৈতিক সঙ্কট বিশেষ আসেনি বলেই মনে করছেন কূটনীতিকরা। এর কয়েক দিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইসলামিক দেশগুলিকে সন্ত্রাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান। তার কয়েক দিনের মধ্যেই কাতারের সঙ্গে কূটতৈকি সম্পর্ক ছেদের এই সিদ্ধান্ত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু তার সপ্তাহখানেকের মাথাতেই কাতারের সঙ্গে আমেরিকা বিপুল অঙ্কের সামরিক চুক্তি করায়, মার্কিন অবস্থান নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠেছে আন্তর্জাতিক মহলে। গত ১৬ জুন কাতারের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী খালিদ আল-আতিয়ারের সঙ্গে এফ-১৫ যুদ্ধবিমান সরবরাহের জন্য ১২০০ কোটি ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব জন ম্যাটিস। কাতার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মোট ৩৬-টি যুদ্ধবিমান সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি দু'টি মার্কিন যুদ্ধজাহাজও কাতারের বন্দরে গিয়েছে। উল্লেখ্য, কাতারের ঘাঁটিতে ১০ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়নে আরব দুনিয়ায় সবার উপরে কাতার। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু আয়ের দেশ। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের সম্ভারে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকারী। আবর দুনিয়ার প্রতিটি দেশেই কমবেশি কাতার থেকে গ্যাস রপ্তানি হয়। মিশর ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি কাতার থেকেই মূলত গ্যাস আমদানি করে থাকে। সম্পর্ক ছেদের সিদ্ধান্ত কাতারের গ্যাস রপ্তানিতে বড়ো ধাক্কা দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যান্য দেশ কাতারের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে। কাতার একঘরে হলে, বা কাতারের সঙ্গে অন্যান্য প্রধান আরব দেশগুলির সম্পর্ক খারাপ হতে থাকলে, তা আরব দুনিয়ায় বড়োসড়ো কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি করবে বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত। পাশাপাশি, ২০২২ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক কাতার। আরব দুনিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে তারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই কূটনৈতিক সঙ্কট সেখানে কোনও প্রভাব ফেলবে কি না, তা অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়।

● **চিনা মুখপত্রে পাক সন্ত্রাস নিয়ে মন্তব্য :**

পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য। চিনের শাসক কমিউনিস্ট পার্টির যে মুখপত্রে আন্তর্জাতিক এবং কূটনৈতিক বিষয় নিয়ে বেজিং-এর মনোভাব বিশদে প্রকাশ করা হয়, সেই গ্লোবাল টাইমসেই পাকিস্তানে বাড়তে থাকা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে এমন কথা লেখা হয়েছে। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে চিনা মুখপত্রটিতে। বালুচিস্তানে এর এক সপ্তাহ আগেই ঘটেছে অপ্রীতিকর ঘটনাটা। দুই চিনা নাগরিককে সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করে খুন করে। অভিযোগের তির ইসলামিক স্টেটের (আইএস) দিকে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চিন।

প্রসঙ্গত, ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বা ওবিওআর নীতির রূপায়ণে চিন এখন অত্যন্ত উৎসাহী। চিনের এই বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় এ যাবৎ যেসব প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডোরই (সিপিইসি) সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প। এই প্রকল্পে জন্য চিন ইতোমধ্যেই পাকিস্তানে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। আবার এই করিডোরকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠছে নানা প্রকল্প। সেসব প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য চিনা ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশার নাগরিকদের ভিড়ও প্রায় রোজই বাড়ছে পাকিস্তানে। এই চিনা নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে বেজিং কোনও রকম আপোসের পক্ষপাতী নয়, স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে গ্লোবাল টাইমসে। চিন অবশ্য নিজেকে সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম বড়ো নিশানা হিসেবে এখনও মনে করছে না বলে দাবি গ্লোবাল টাইমসের। চিনের অনেকগুলি সংস্থা এখন বহুজাতিক হয়ে

গিয়েছে, সেই সূত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি চিনা নাগরিক এখন কমসূত্রে বিদেশে থাকছেন। এই প্রসারের কারণেই চিনারা এখন আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় সন্ত্রাসের কবলে পড়ছেন, মত বেজিং-এর। পৃথিবীর যে দেশগুলিতে সন্ত্রাসের বিপদ সবচেয়ে বেশি, সেই দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম। পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল বলে মত গ্লোবাল টাইমসের। পাকিস্তানে কর্মরত চিনা নাগরিকদের ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে বলেও চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে লেখা হয়েছে। তবুও পাকিস্তানকে 'চিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

● **নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা :**

নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন শের বাহাদুর দেউবা। এই নিয়ে চতুর্থবার সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন নেপালি কংগ্রেসের এই নেতা। গত ১০ বছরে এই নিয়ে ১০ বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সাক্ষী হল ভারতের প্রতিবেশী দেশটি। রাজতন্ত্রের অবসানের পর থেকেই প্রবল রাজনৈতিক ডামাডোল চলছে নেপালে। রাজতন্ত্র থাকাকালীন দেউবা তিন বার নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের পতনের পর শের বাহাদুর দেউবা এই প্রথমবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। দেউবা এখন নেপালের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান। তবে ৫৯৩ আসনের পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা কোনও দলেরই নেই। গত ১০ বছর ধরেই একের পর এক জোট সরকার নেপালকে শাসন করছে। কিছুদিন আগে মাওবাদী নেতা পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই থেকে পদটি খালিই ছিল। গত ৬ জুন নেপালের পার্লামেন্ট দেউবাকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়। দেউবার পক্ষে ভোট পড়ে ৩৮৮-টি। বিপক্ষে ১৭০-টি। ৩৫ জন ভোট দেননি। প্রচণ্ডর দল কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল—মাওইস্ট সেন্টার দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক হিসেবে দেউবার সরকারে সামিল হচ্ছে। পরের দিন, অর্থাৎ ৭ জুন শের বাহাদুর দেউবা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

● **উত্তর কোরিয়া ফের জাপানের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল :**

স্বল্পপাল্লার কোরীয় ক্ষেপণাস্ত্র ফের আঘাত হানল জাপানের 'এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন'-এ। এই নিয়ে মে মাসের শেষ তিন সপ্তাহে তিনবার ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল কিম জং-উনের বাহিনী। উত্তর কোরিয়ার পূর্ব উপকূলের ওয়নসানের কাছে অবস্থিত একটি এয়ারফিল্ড থেকে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোঁড়া হয়। ২৮০ কিলোমিটার উড়ে গিয়ে জাপান সাগরে আঘাত হানে সেটি। সমুদ্রের যে অংশে ক্ষেপণাস্ত্রটি আঘাত হেনেছে, সেটি জাপানের নিজস্ব অর্থনৈতিক জলসীমা। চলতি বছরেই আরও একবার এই রকম ঘটনা ঘটায় উত্তর কোরিয়া। সেবার একই দিনে অন্তত তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল জাপানের এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনের মধ্যে। ২৯ মে আবার তেমনই ঘটনা ঘটাল কিম জং-উনের বাহিনী।

উত্তর কোরিয়া এই ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার পরেই জাপানের তরফ থেকে ডাকা আপৎকালীন সাংবাদিক সম্মেলনে জাপান সরকারের চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি য়োশিহিদে সুগা মন্তব্য করেছেন জাপানের অর্থনৈতিক জলসীমায় আঘাত হেনে উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছে। উত্তর কোরিয়া যে আবার ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে, তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিশদে জানানো হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়েছে হোয়াইট হাউসও। মার্কিন নৌসেনার প্যাসিফিক কম্যান্ডের তরফে জানানো হয়েছে, জাপান সাগরে আঘাত হানার আগে ৬ মিনিট ধরে ক্ষেপণাস্ত্রটিকে নজরে রাখা হয়েছিল।

শুধু জাপান এবং আমেরিকা নয়, দক্ষিণ কোরিয়াও এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কিমের ক্ষেপণাস্ত্র জাপান সাগরে আঘাত হেনেছে জেনেই নিজের দেশের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক ডাকেন দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন। এই উৎক্ষেপণকে ধরে গত এক বছরে অন্তত ১২-টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়লেন কিম জং-উন। কঠোর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর এক দিন আগেই মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জিম ম্যাটিস উত্তর কোরিয়াকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। তার পর দিনই জাপানের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল কিমের বাহিনী। সাড়ে পাঁচ বছরে শাসনকালে ৭৮ বার ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়েন কিম জং-উন। তার বাবা তথা উত্তর কোরিয়ার পূর্বতন শাসক কিম জং-ইলও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র এবং পরমাণু অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইলের ১৭ বছরের শাসনকালে উত্তর কোরিয়া ১৬-টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল। তার তিন ভাগের এক ভাগ সময়েই প্রায় পাঁচ গুণ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন কিম জং-উন।

● **গদ্দাফি-পুত্র সইফ মুক্ত :**

যুদ্ধাপরাধের দায়ে প্রাণদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু একটি বিশেষ রায়ে মুক্তি পেলেন সইফ আল-ইসলাম গদ্দাফি। লিবিয়ার প্রাক্তন স্বৈরাচারী শাসক মুয়াম্মর গদ্দাফির দ্বিতীয় পুত্র সইফের মুক্তির কথা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন তার আইনজীবী খালেদ আল-জাইদি। কিন্তু তার মক্কেল এখন কোন শহরে রয়েছেন, তা নিয়ে মুখ খোলেননি। খালেদ বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, আবু বকর আল-সিদ্দিক ব্যাটেলিয়নের ক্ষমা ভিক্ষায় মুক্তি মিলেছে সইফের। নিরাপত্তার খাতিরেই তার গতিবিধি এখন সবাইকে জানানো যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের আরব বসন্তের বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হন লিবিয়ার দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসক মুয়াম্মর গদ্দাফি। সিত্তের যুদ্ধে মৃত্যু হয় তার। ওই বছরই সশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়েন গদ্দাফির দ্বিতীয় ছেলে সইফ। তার পরে আবু বকর আল-সিদ্দিক ব্যাটেলিয়নের নজরদারিতে জিনতান শহরের এক কারাগারে এত দিন আটক ছিলেন তিনি। সিদ্দিক ব্যাটেলিয়ন আসলে একটি জঙ্গি গোষ্ঠী। অভ্যন্তরীণ সরকারের অনুরোধে সইফের প্রাণভিক্ষা করা হয়েছে বলে একটি বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে। দেশের পূর্বাংশে স্বায়ত্তশাসন রয়েছে এই অভ্যন্তরীণ সরকারের। সেই সরকার আগেই সইফের অপরাধ ক্ষমা করেছিল। গদ্দাফির শাসনকালে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে লিবিয়ার মুখ ছিলেন সইফই। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে ২০০৮ সালে পিএইচডি করেন তিনি। ২০১৫ সালে ত্রিপোলির এক আদালত যুদ্ধাপরাধ ও হত্যার দায়ে সইফের ফাঁসির আদেশ দেয়। তার বাবার শাসনের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক কণ্ঠস্বরকে সে সময় সইফ হত্যা করেছিলেন বলে অভিযোগ। আন্তর্জাতিক আদালতও তাকে বহু দিন খুঁজছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মদতপুষ্ট ন্যাশনাল অ্যাকর্ড দেশের পশ্চিমাংশে আলাদা একটি সরকার চালায়। সেই সরকারের আদালতই সইফের ফাঁসির সাজা দিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ সরকারের সঙ্গে ন্যাশনাল দীর্ঘদিনের বিরোধিতা।

● **দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানে জন্মহার সর্বোচ্চ :**

গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় জন্মহার সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানে। গত ১৯ বছরে এই প্রথম মানুষের মাথা গোনা হয়েছে পাকিস্তানে। সেই জনগণনায় দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের জনসংখ্যা এখন ২০ কোটি। ১৯ বছর আগে যে সংখ্যাটা ছিল সাড়ে ১৩ কোটি। এও দেখা গিয়েছে, এক জন মা গড়ে তিনটি সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন পাকিস্তানে। উপজাতিদের মধ্যে সেই হারটা আরও বেশি। সংবাদ সংস্থা এএফপি-র খবর, জনগণনায় দেখা গিয়েছে, বেশি বেশি ছেলেপুলে থাকাটাই যেন 'স্টেটাস সিম্বল' হয়ে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানে। কারও ছেলেপুলের সংখ্যা ৩৬। কারও ২৪-টি, কারও বা ২২-টি। আবার এও দেখা গিয়েছে, তিনজন বাবার মোট ছেলেপুলের সংখ্যা ১০০-রও বেশি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন, কারণ জনগণনা বলছে, পাকিস্তানে ৬ কোটি মানুষ রয়েছেন দারিদ্র্যসীমার নিচে।

● **রাষ্ট্রপুঞ্জে ইকোসক-এর নির্বাচনে জয়ী ভারত :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা, ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের (ইকোসক)-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে পুনর্নির্বাচিত হল ভারত। শোচনীয় পরাজয় হল পাকিস্তানের। গত তিন বছর ধরে এই পরিষদের সদস্য ছিল ভারত। এ বছরের শেষেই সেই মেয়াদ ফুরানোর কথা ছিল। কিন্তু ফের নির্বাচিত হওয়ায় ভারত ২০১৮-র প্রথম দিন থেকে আরও তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ইকোসক-এর সদস্য থাকছে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ইকোসক-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী, ইকোসক-এর সদস্য পদে নির্বাচিত হতে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়ার দরকার হয়। ভারত তার চেয়ে অনেক বেশি, ১৮৩-টি ভোট পেয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক বিভাগে ভারতের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে একমাত্র জাপান। এই দুই দেশই এত দিন ইকোসকের সদস্য ছিল। এবার পুনর্নির্বাচিত হল। এই অঞ্চল থেকে নতুন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হল ফিলিপিন্স। কিন্তু আর এক বর্তমান সদস্য পাকিস্তান পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনয়ন জমা দিলেও জিততে পারেনি। পেয়েছে মাত্র ১-টি ভোট।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপুঞ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছ'টি শাখার মধ্যে একটি হল ইকোসক। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন নীতি নিয়ে চলবে, তার রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে কীভাবে সমন্বয়সাধন করা হবে, ইকোসক-ই তা নির্ধারণ করে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য যেসব সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত হয়, তার রূপায়ণও এই ইকোসক-এর মাধ্যমেই হয়। ইকোসক-এ মোট ৫৪-টি আসন। প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের, অর্থাৎ, ১৮ সদস্যের মেয়াদ শেষ হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রতি বছর ১৮-টি দেশ নতুন করে নির্বাচিত হয়। এ বছর বেলারুশ, ইকুয়েডর, এল. সালভাদর, ফ্রান্স, জার্মানি, ঘানা, ভারত, আয়ারল্যান্ড, জাপান, মালাউই, মেক্সিকো, মরক্কো, ফিলিপিন্স, স্পেন, সুদান, টোগো, তুরস্ক এবং উরুগুয়ে—এই ১৮-টি দেশ নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, জাপান, আয়ারল্যান্ড এবং ঘানা পুনর্নির্বাচিত হয়। বাকিরা নতুন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হল।

● **ভাইপোকে সরিয়ে ছেলেকেই ক্রাউন প্রিন্স করলেন সৌদি রাজা :**

পরবর্তী রাজা হওয়ার অন্যতম দাবিদার তথা ভাইপো, মহম্মদ বিন নায়েক বিন আবদুলাজিজের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ৩১ বছর বয়সী সলমনকে যুবরাজ বা ক্রাউন প্রিন্স পদে অভিষিক্ত করলেন সৌদি রাজা সলমন। রাজ্যের প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব তো ছিলই, এবার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদও সঁপে দেওয়া হল যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন বিন আবদুলাজিজকে। সৌদি আরবের বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেকই তরুণ প্রজন্ম। ৫৭ বছরের যুবরাজের বদলে ৩১ বছর বয়সী তরুণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পিছনে এটাই অন্যতম কারণ বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। মহম্মদ বিন নায়েফ বিন আবদুলাজিজও ক্ষমতায় এসেছিলেন হঠাৎই। তৎকালীন যুবরাজ মুক্রিনকে সরিয়ে ২০১৫ সালের ২৯ এপ্রিল সৌদি রাজা সলমন তাকে মনোনীত করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের প্রথম ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদও দেওয়া হয় তাকে। নায়েফ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান হন। ওয়াশিংটনের কাছেও পরবর্তী সৌদি রাজা হিসেবে নায়েফই ছিলেন প্রত্যাশিত নাম।

২০১৫ সালে রাজা হিসেবে সলমনের ক্ষমতা গ্রহণের আগে মহম্মদ বিন সলমন সৌদি আরবের বাইরে তেমন পরিচিত ছিলেন না। সলমন ক্ষমতায় আসার পরেই মহম্মদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তরুণ মহম্মদ বিন সলমনই এখন জনপ্রিয় মুখ। সৌদি আরবের সত্যিকার ক্ষমতা মহম্মদের কাছে রয়েছে বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকার সময় গত মার্চে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন মহম্মদ।

● **ওবামার কিউবা চুক্তি বাতিল করলেন ট্রাম্প :**

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে কিউবার সঙ্গে যে সৌহার্দ্য-চুক্তি করেছিলেন বারাক ওবামা, ১৭ জুন তা বাতিল করে দিলেন তার উত্তরসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গিয়েছিলেন মায়ামির লিটল হাভানাতে—দেশছাড়া কিউবানদের এক সভায়। সেখানেই তিনি 'আগের প্রশাসনের সম্পূর্ণ একতরফা চুক্তি' বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন। তার অভিযোগ, রাউল কাস্ত্রোর প্রশাসনের সঙ্গে ওবামা ওই চুক্তি করার পরে কিউবায় 'নিষ্ঠুর' কমিউনিস্ট শাসনের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। ট্রাম্প জানান, কিউবাকে আগে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে। আমেরিকার আইনের হাত থেকে পলাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের প্রত্যর্পণ করতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে দেশে অবাধ নির্বাচন করতে হবে। এই শর্তগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কাস্ত্রোর দেশের সঙ্গে নয়া চুক্তি করবে না আমেরিকা। মার্কিন সংস্থাগুলিও কিউবার 'সামরিক সরকার-চালিত' সংস্থাগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারবে না। পাশাপাশি, কিউবার সেনাকে যেসব মার্কিন নাগরিক টাকা পাঠান বলে অভিযোগ, তাদের এবার ধরপাকড়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন ট্রাম্প। ওবামার উদ্যোগে ৫৪ বছর পরে হাভানায় খুলেছিল মার্কিন দূতাবাস। সেই দূতাবাস অবশ্য বন্ধ করছেন না ট্রাম্প। বন্ধ হচ্ছে না বাণিজ্যিক উড়ান ও জাহাজ চলাচল। কিন্তু তাতে থাকছে নিয়মের ফাঁস। মার্কিন সরকারের অনুমোদিত কারণ ছাড়া কেউ কিউবায় গেলে ট্রেজারি অডিটের মুখে পড়তে হতে পারে তাকে।

● **বিশ্ব যোগ দিবস :**

গোটা দুনিয়ার সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র গড়ে দিয়েছে 'বিশ্ব যোগ দিবস'। প্রতি বছর ২১ জুন পালিত হবে 'বিশ্ব যোগ দিবস', ২০১৪ সালে এই ঘোষণা করে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ২০১৬-এ বিশ্বের ২০ কোটি মানুষ

অংশগ্রহণ করেছিলেন যোগ দিবসে। এ বছর সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। এ বছর ভারত ছাড়াও চিন, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, লেবানন, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, কানাডা-সহ মোট ১৮০-টি দেশে পালিত হয়েছে 'বিশ্ব যোগ দিবস'। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোয় সেজে ওঠে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তর। যোগের চিহ্ন দেওয়া বিশেষ আলো জ্বালানো হয় এই বিখ্যাত বিল্ডিংটির গায়ে। যোগ চিহ্নের নিচে ইংরেজিতে বড়ো বড়ো করে 'যোগ' কথাটিও লেখা ছিল। পাশাপাশি, এ বছর রাষ্ট্রপুঞ্জের ডাক বিভাগ যোগ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ স্ট্যাম্পও প্রকাশ করেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এক দিন আগেই 'বিশ্ব যোগ দিবস' পালিত হয়। গত ২০ জুন সূর্যাস্তের পর হাজার হাজার মানুষ আরব আমিরশাহির বুর্জ পার্ক, জাবিল পার্ক, বুরহানী কমপ্লেক্স, শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম-সহ বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত হন দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য। ভারতের পর চিনেই সবচেয়ে বড়ো করে 'বিশ্ব যোগ দিবস' পালিত হয়েছে। পূর্ব চিনের ১২-টি শহরে ১৭ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত পালিত হয়েছে যোগ সপ্তাহ। মালয়েশিয়াতে এ বছর 'বিশ্ব যোগ দিবাস'-এ প্রায় ১০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য সিঙ্গাপুর মোট ৭০-টি কেন্দ্রে প্রায় ৮ হাজার মানুষ যোগদান করেছেন। জাপানেও 'বিশ্ব যোগ দিবস'-এ হাজার হাজার মানুষ যোগদান করেন। ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত গৌতম বাম্বাওয়ালের নেতৃত্বে পাকিস্তানেও পালিত হয়েছে বিশ্ব যোগ দিবস। ২০ জুনই ইসলামাবাদে একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে কয়েকশো মানুষ যোগাসনের অনুশীলন করেন। নেদারল্যান্ডসে ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে পালিত হয়েছে বিশ্ব যোগ দিবস। এ বছর সে দেশে ১ হাজার মানুষ যোগদান করেন। ফ্রান্সেও পালিত হয়েছে বিশ্ব যোগ দিবস। সে দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মোহন কুমারের উদ্যোগ গত বছরই ৭ হাজারেরও বেশি মানুষ যোগদান করেন যোগাভ্যাসের জন্য। এ বছর সংখ্যাটা ছাপিয়ে গেছে। ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে। ২১ জুন রাতে চার ঘণ্টা ধরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে এই বিশেষ দিনটি। বুদাপেস্ট-সহ হাঙ্গেরির মোট ১৫-টি শহরে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়েছে।

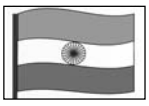

জাতীয়

● **পাঞ্জাবে মেয়েদের নিখরচায় পড়াশোনা :**

রাজ্যে মেয়েদের পড়াশোনার আর কোনও খরচই লাগবে না। গত ১৯ জুন এমনটাই ঘোষণা করল পাঞ্জাব সরকার। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হবে এই নতুন নিয়ম। পাঞ্জাবে নজিরবিহীনভাবে দেশে এই প্রথম প্রাথমিক স্তর থেকে পিএইচডি পর্যন্ত নিখরচায় পড়াশোনা করতে পারবে মেয়েরা। পাশাপাশি, রাজ্যের ১৩ হাজার প্রাথমিক স্কুল আর ৪৮-টি সরকারি কলেজে বিনামূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ২০১১-র জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী, পাঞ্জাবে মোট সাক্ষর মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭ হাজার ১৩৭। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, এ রাজ্যের শিক্ষার হার ৭৫.৮৪ শতাংশ, যেখানে গোটা দেশে এই হার ৭৩.০ শতাংশ। রাজ্যের পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৮০.৪৪ শতাংশ এবং মহিলাদের ৭০.৭৩ শতাংশ।

● **লক্ষ্য ২০২২ :**

স্বাধীনতার ৭৫ বছর। এই উপলেক্ষ্য সব মন্ত্রককে এখনই আগামী পাঁচ বছরের রোড ম্যাপ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতার ৭৫ বছরকে কেন্দ্র করে 'নতুন ভারত' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতোমধ্যেই আগামী পাঁচ বছরের রিপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছেন সুরেশ প্রভু, রাধামোহন সিংহ, পীযূষ গোয়েল, বেঙ্কাইয়া নাইডুরা। রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে অন্য মন্ত্রকগুলিতেও। আগামী পাঁচ বছরে কৃষকদের আর্থিক বিকাশে জোর দিতে চাইছে সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিংহ মূলত কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উপরেই জোর দিতে চেয়েছেন। কৃষিমন্ত্রীর মতে—কৃষিঋণ মাফ করলেই আয় বাড়ে না। ফসলের উৎপাদন বাড়ানো, বীজের দাম কমানো, কৃষিজাত পণ্যের বাজার তৈরি করা, ফসল-বিমার মতো সংস্কারমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। একই সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে দেশের সমস্ত কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনা, সয়েল কার্ড তৈরি করা ও সব কৃষককে ফসল বিমার আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কৃষিমন্ত্রক। রেলের ক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে গোটা দেশে 'গতিমান'-এর মতো সেমি হাইস্পিড ট্রেন চালানো, আলাদা পণ্য পরিবাহী করিডোর, প্রতি ট্রেনে ও স্টেশনে বায়ো টয়লেট ও ওয়াইফাই ব্যবস্থা, নিরাপত্তা খাতে আধুনিকীকরণ ও নতুন কোচ বানানোর মতো কাজে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই টাকার মধ্যে ৩০ শতাংশ আসবে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে। বেঙ্কাইয়া নায়ডুর স্বপ্ন সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এই কাজ সফল করতে চায় তার নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। ২০১৯ সালের মধ্যে ১০০-টি ও পরের তিন বছরে আরও ১০০-টি স্মার্ট শহর গড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে তার। আবার দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। আগামী পাঁচ বছরে কয়লা, বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে প্রায় ২৫ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ হবে বলে দাবি গোয়েলের। এর একটি বড়ো অংশ বিনিয়োগ হবে অপ্রচলিত শক্তি খাতে। বর্তমানে অপ্রচলিত উৎস থেকে যে ৬০০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। আগামী পাঁচ বছরে সেটিকে পাঁচগুণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই বিদ্যুতের একটি বড়ো অংশ আসবে সূর্যালোক থেকে। ২০২২ সালের মধ্যে অপ্রচলিত উৎস থেকে উৎপাদিত হবে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। যার মধ্যে অন্তত এক লক্ষ ইউনিট আসবে সূর্যের আলো থেকে।

● **গবাদি পশু কেনাবেচা নিয়ে কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি :**

গত ২৬ মে কেন্দ্র এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, দেশের হাটে-বাজারে এবার থেকে কোনও গবাদি পশুই জবাইয়ের উদ্দেশ্যে কেনাবেচা করা যাবে না। গবাদি পশুর সংজ্ঞা অনুযায়ী, গরু, বাছুর, বলদ, ষাঁড়, মোষ এবং উট। সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে মাংস, কেনাবেচায় নিষেধাজ্ঞা আনা সরকারের উদ্দেশ্য নয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পশুপালকদের কাছ থেকে মাংসের জন্য পশু কেনা যাবে। কিন্তু হাটে-বাজারে গবাদি পশু কিনে জবাই করা চলবে না। অসুস্থ বা অক্ষম গরু বেচাও কঠিন হবে। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কৃষির প্রয়োজন ছাড়া গবাদি পশু বাজার থেকে কেনাবেচা করা যাবে না। এখন থেকে ক্রেতাকে প্রমাণ দিতে হবে তিনি কৃষিজীবী, কৃষির

প্রয়োজনে পশু কিনছেন। এবং বিক্রেতাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে, জবাইয়ের জন্য পশুটিকে বিক্রি করা হচ্ছে না। ক্রেতা এবং বিক্রেতা দু'জনকেই তাদের সচিত্র পরিচয়পত্র দিতে হবে। পশু বাজারের আধিকারিকরা সেগুলি খতিয়ে দেখে তবে অনুমোদন দেবেন।

বাজার বসার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এত দিন পর্যন্ত বেশির ভাগ রাজ্যেই এ ধরনের বহু বাজার বসত সীমান্ত এলাকায়, যাতে পড়শি রাজ্যের লোকেরাও তাতে অংশ নিতে পারেন। নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দুই রাজ্যের সীমানা থেকে ২৫ কিলোমিটার এবং সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে পশুর বাজার বসাতে হবে। সীমান্তে পশুপাচার ঠেকাতেই এই পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে হায়দরাবাদের একটি সংগঠন শীর্ষ আদালতে এই নির্দেশিকা বাতিলের দাবি জানিয়ে মামলা দায়ের করে। গত ১৫ জুন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর. কে. অগ্রবাল এবং এস. কে. কলের অবসরকালীন বেঞ্চ আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের কাছ থেকে এর যথাযথ ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছে। ১১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে ফের এই মামলার শুনানি হবে।

● **রাজ্যসভার ভোট আপাতত স্থগিত :**

আপাতত স্থগিত হয়ে গেল রাজ্যসভার ভোট। পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া এবং গুজরাতের খালি হওয়া আসনগুলির জন্য ৮ জুন ভোট নেওয়ার কথা ছিল। গত ১৬ মে কমিশন এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। ২২ মে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে এক মুখপাত্র জানান, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধানসভার সচিবরা একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এবং রাজ্যসভা ভোটের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ করেন। দু'টি ভোটের কাজ একসঙ্গে পড়ায় প্রশাসনিক প্রস্তুতির সমস্যা হ'ত বলে কমিশন মনে করছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে মোট ছ'টি আসন খালি হয়েছিল।

● **বিদেশেও জনপ্রিয় 'মন কি বাত' :**

দেড়শোরও বেশি দেশে সম্প্রচার করা হয় নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত'। অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তা বিপুল সাড়া ফেলেছে বলে জানান আকাশবাণীর ডিরেক্টর অম্লানজ্যোতি মজুমদার। লাইভ হিন্দি, তার ইংরেজি অনুবাদ সম্প্রচার করার পাশাপাশি বাছাই করা অংশ শোনানো হয় রুশ, ফরাসি, উর্দু ও চিনা ভাষাতেও। বিশ্বের বহু দেশ থেকে বিপুল সাড়া দিচ্ছেন অনাবাসী ভারতীয়েরা। প্রতিবারই সম্প্রচারের পর অসংখ্য বার্তা আসে। বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে, যেখানে গুজরাত থেকে যাওয়া বহু মানুষের বাস। অসংখ্য বার্তা আসে কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে। দেশে যখন নোটবন্দির সমালোচনা হচ্ছিল, সে সময়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপানোর জন্য অভিনন্দন জানিয়ে প্রচুর বার্তা এসেছে বিদেশ থেকে। মন কি বাত অনুষ্ঠানটি যে এতটা সাড়া ফেলেছে, তার কারণ সম্ভবত বিদেশে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গুণমুগ্ধ ও অনুগামীর সংখ্যা বিপুল। মোদী ২০১৪-র মে মাসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৫৫-টি দেশে সফর করেছেন। এই সব দেশ থেকে ভারতে পর্যটক আসার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। বিশ্ব নেতাদের মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মোদীরই। ৬৯ লক্ষ।

● **কৃষিঋণ মকুব মহারাষ্ট্রে :**

মকুব করে দেওয়া হচ্ছে কৃষিঋণ, জানাল মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফডণবীসের সরকার। ঋণ মকুবের আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন সে রাজ্যের কৃষকরা। কৃষকদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রিগোষ্ঠী গড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ফডণবীস। গত ১১ জুন কৃষক আন্দোলনের নেতারা এই মন্ত্রিগোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করেন। তার পরেই কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করে সরকার। টানা ১১ দিন ধরে মহারাষ্ট্রে কৃষক বিক্ষোভ চলছিল। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল—কৃষকদের ঋণ সম্পূর্ণ মকুব করতে হবে; কৃষকরা যাতে তাদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পান, তা সুনিশ্চিত করতে হবে; নিখরচায় বিদ্যুৎ দিতে হবে; সেচের জন্য অনুদান দিতে হবে এবং ৬০ বছরের বেশি বয়স যে কৃষকদের, তাদের পেনশন দিতে হবে। গোটা মহারাষ্ট্রে প্রায় ৫ লক্ষ কৃষক এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছিল, ১২ জুন থেকে আরও তীব্র হবে বিক্ষোভ। রাজ্য সরকার ১১ জুন জানায়, কৃষকদের ঋণ মকুব করা হচ্ছে। সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ফডণবীস প্যানেলও গঠন করেছেন।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চল বেশ কয়েক বছর ধরেই খরাক্লিষ্ট। বহু কৃষক ঋণের জালে জর্জরিত। কৃষকদের আত্মহত্যার একের পর এক ঘটনা সামনে আসছিল। দেবেন্দ্র ফডণবীসের নেতৃত্বাধীন সরকারের উপর কৃষিঋণ মকুবের চাপ তাই শুরু থেকেই ছিল। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে আগেই কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

● **বাবার সম্পত্তির ভাগ পাবে না 'অবৈধ' সন্তান, জানাল বম্বে হাইকোর্ট :**

এক সঙ্গে রাত কাটালেই তাদের সেই সম্পর্ককে বিয়ের মান্যতা দেওয়া হবে না। পাশাপাশি বাবার সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার থাকবে না ধরনের সম্পর্কজাত সন্তানেরও। কারণ তা হিন্দু বিবাহ আইনবিরোধী। সম্প্রতি একটি মামলার শুনানিতে এই রায় দেয় বম্বে হাইকোর্ট। বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি মৃদুলা ভাটকর জানান, কোনও সম্পর্ককে বিয়ের রূপ দিতে গেলে ধর্মীয় রীতি পালন বা আইনের পথ অনুসরণ করতেই হবে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বা দুর্ঘটনাবশত শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে, কিন্তু তা কখনই বিয়ে নয়। তাই এর ফলে যে সন্তান জন্ম নেবে, বাবার সম্পত্তির উপর তার কোনও অধিকার থাকবে না। সম্পত্তির অধিকার পেতে গেলে বিয়ে করতেই হবে।

যে মামলা প্রসঙ্গে বিচারপতির এই রায়, সেখানে এক ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগ পেতে মামলা করেছিলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী। বিচারপতি বলেন, হিন্দু বিবাহ আইনে বহু বিবাহ প্রচলিত না হলেও এক্ষেত্রে যেহেতু ওই ব্যক্তির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিয়ের উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েছেন, তাই তাদের সন্তান সম্পত্তির ভাগ পাবে। মামলা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিচারপতি বলেন, সমাজ পরিবর্তনশীল। এখন বহু দেশ সমকামী সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে। লিভ ইন সম্পর্কও বেশ কয়েকটি দেশে আইনত বৈধ। এর ফলে যত দিন যাচ্ছে বিবাহের পরিধি বিচার করতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

● **ছাবাহার ব্যবহার করতে পারবে ভারত :**

ইরানের ছাবাহার বন্দরের মাধ্যমে আফগানিস্তান-সহ মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র তৈরির কাজে অনেকটা এগোল নয়াদিল্লি। বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, ছাবাহার ব্যবহারের অধিকার ও পরিচালনার দায়িত্ব

আগামী দু' বছরের জন্য ভারতকে দিতে রাজি হয়েছে ইরান। গোটা বিষয়টি একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিম এশিয়ার উত্তাল পরিস্থিতিতে যখন আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন ইরান-বিরোধী অবস্থান নিয়ে চলেছে, তখন ভারত সতর্কভাবে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরব-সহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশ কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রকৃতপক্ষে বার্তা দিতে চেয়েছে ইরানকেই। এতে সমর্থন রয়েছে আমেরিকারও। গত মে মাসে বিদেশসচিব এস জয়শঙ্কর ছাবাহার দৌত্য সেরে এসেছেন ইরান গিয়ে। সাংহাই কো-অপারেশনের বৈঠকেও ইরানের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতীয় অফিসারেরা।

● **১৯৯৩ মুম্বই বিস্ফোরণ; দোষী সাব্যস্ত আবু সালেম-সহ ছয় :**

ভারতের বুকে সবচেয়ে বড়ো জঙ্গি হামলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হল এককালে দাউদ ইব্রাহিম-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতী আবু সালেমকে। ১৬ জুন বিশেষ টাডা আদালত ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণ মামলার আরও পাঁচ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই ছয় অপরাধীর সাজা ঘোষণা অবশ্য বাকি। আবু সালেম-সহ ছ'জনকে কী শাস্তি দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করার আগে ফের দু' পক্ষের কৌঁসুলিদের বক্তব্য শুনবে আদালত। ১৯ জুন থেকে সেই শুনানি শুরু হবে বলে এই মামলার সিবিআই কৌঁসুলি দীপক সালভি জানিয়েছেন। আবু সালেম ছাড়া যে পাঁচ জনকে এদিন আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে, তারা হল মুস্তাফা দোর্সা, ফিরোজ খান, তাহের মার্চেন্ট, রিয়াজ সিদ্দিকি, করিমুল্লা খান। এই দফায় মোট সাত অভিযুক্তের বিচার করেছেন বিশেষ টাডা আদালতের বিচারক। তাদের মধ্যে একমাত্র আবদুল কায়ুম শেখকে আদালত মুক্তি দিয়েছে। মুম্বইতে ১৯৯৩ সালে হওয়া ধারাবাহিক বিস্ফোরণের মামলায় এই নিয়ে দ্বিতীয় দফার বিচার শেষ হল টাডা আদালতে। যে সাত জনকে এদিন দোষী সাব্যস্ত করা হল, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২০০৩ থেকে ২০১০-এর মধ্যে। এদের আগে ১২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১০০ জনই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়। ২০০৬ সালেই তাদের সাজা ঘোষণা করেছিল আদালত। আবু সালেম এবং বাকিরা যখন ধরা পড়েছিল, তখন যেহেতু ওই ১২৩ জনের বিচারের কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, সেহেতু এই সাত জনের বিচার আলাদা করে শুরু হয়। আদালত এদিন ছ' জনকেই দোষী বলে ঘোষণা করেছে। মুম্বই বিস্ফোরণ মামলায় ৩৩ অভিযুক্ত এখনও পলাতক। সেই তালিকায় রয়েছে দাউদ ইব্রাহিম এবং টাইগার মেমনের নামও। রয়েছে দাউদের ভাই আনিস ইব্রাহিমের নাম। এদিন যে মুস্তাফা দোসা দোষী সাব্যস্ত হল, তার ভাই মোহম্মদ দোসার নামও ওই তালিকায় রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১২ মার্চ, ১৯৯৩-এ মুম্বই জুড়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ২৫৭ জনের, আহত হয়েছিলেন ৭১৩ জন। নষ্ট হয় মোট ২৭ কোটি টাকার সম্পত্তি। এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত দাউদ ইব্রাহিম, টাইগার মেমন এখনও ফেরার। মামলার আর এক মূল অভিযুক্ত ইয়াকুব মেমনকে ৩০ জুলাই ২০১৫-এ ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। দোষী সাব্যস্ত ছ' জনের মধ্যে আবু সালেম, মুস্তফা দোসা, ফিরোজ খান, তাহের মার্চেন্ট, আর করিমুল্লা খান—এই পাঁচ জন সক্রিয়ভাবে ২৪ বছর আগের সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ কাণ্ডের ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল বলে জানায় বিশেষ টাডা আদালত। এদের সকলের বিরুদ্ধেই অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক সরবরাহের অভিযোগ প্রমাণিত বলে বক্তব্য আদালতের। রিয়াজ সিদ্দিকিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও, টাডা আইনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। পর্তুগালে পালিয়ে যাওয়া আবু সালেমকে প্রত্যার্পণ চুক্তির মধ্যে ভারতে নিয়ে আসা হয় ২০০৫ সালের নভেম্বরে। আবু সালেমের বয়ানের ভিত্তিতে রিয়াজ সিদ্দিকি এবং কায়ুম শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

● **পঞ্চম-অষ্টমে পরীক্ষা নেবে আইসিএসই :**

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতেও বোর্ডের পরীক্ষা চালু করছে আইসিএসই। তবে ওই জোড়া পরীক্ষায় পাস-ফেল থাকবে না। এর সঙ্গে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি স্কুলে নতুন পাঠ্যক্রমও আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে। সিবিএসই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-সহ বিভিন্ন বোর্ডের মতো আইসিএসই-তেও এত দিন প্রথম বোর্ড-পরীক্ষা নেওয়া হ'ত দশম শ্রেণিতে। মাঝখানে কোনও শ্রেণিতেই বোর্ডের তরফে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এই জোড়া পরীক্ষার উদ্দেশ্য মূলত দু'টি। প্রথমত, পড়ুয়াদের সাধারণ বোধবুদ্ধি যাচাই করা এবং কোন বিষয়ে তাদের আন্তরিক আগ্রহ আছে, সেই প্রবণতার খোঁজখবর নেওয়া। যাতে মানস-প্রবণতা অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যতের জন্য যথা সম্ভব তৈরি করে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-শিক্ষিকারা নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পড়ুয়াদের যথাযথভাবে এগিয়ে দিতে পারছেন কি না, তার একটা প্রচ্ছন্ন মূল্যায়নও এই পরীক্ষার লক্ষ্য।

আইসিএসই বোর্ডের দাবি, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে তাদের পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে বাড়তি চাপের প্রশ্নই নেই। আইসিএসই বোর্ডের সচিব জেরি অ্যারাথুন গত ৭ জুন এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান আর সোশ্যাল স্টাডিজের পরীক্ষায় বসতে হবে পড়ুয়াদের। উত্তর দিতে হবে নিজেদের বোধবুদ্ধির সাহায্যে। তার পরে সেই উত্তরের মূল্যায়ন করে দেখা হবে, কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কোথায় খামতি থাকছে। বিস্তারিতভাবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবককে।

চলতি শিক্ষাবর্ষেই নতুন পাঠ্যসূচি চালু করেছে আইসিএসই। কিন্তু সব স্কুল এখনও তা গ্রহণ করেনি। ২০১৮-'১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব স্কুলকেই তা গ্রহণ করতে হবে। নতুন পাঠ্যক্রম শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে যথাযথভাবে পড়াতে পারেন, তার জন্য তাদেরও তালিমের বন্দোবস্ত হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পারফর্মিং আর্টস, যোগ আর শারীর শিক্ষাও চালু করা হচ্ছে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে সংস্কৃতকে রাখা হচ্ছে তৃতীয় ভাষা হিসেবে। পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে কোন বিষয় নিয়ে পড়বে, তা নির্ধারণের জন্য 'ডিজিট্যাল সাবজেক্ট সিলেকশন টুল' চালু করতে চলেছে আইসিএসই বোর্ড। মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী কোন পড়ুয়ার কোন বিষয় পড়া উচিত, কোন বিষয় পড়লে ভবিষ্যতে কতটা কী সুযোগ আছে, এই বিশেষ ব্যবস্থায় সবই জানা যাবে।

● **অবশেষে গ্রেপ্তার কারনান :**

অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিন্নাস্বামী কারনান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ দল ২০ জুন কারনানকে তামিলনাড়ুর কোয়ম্বত্তুর শহরে তার এক পরিচিতের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। রাজ্য পুলিশের দলটির নেতৃত্বে ছিলেন হোমগার্ডের ডিজি রাজ কানোজিয়া। ২১ জুন বিমানে কলকাতায় পৌঁছে কারনানকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সুপ্রিম কোর্ট

কারনানকে ছ' মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজিত সেনগুপ্ত অবসর নেওয়ার দু' বছর পর, ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার হন। তার বিরুদ্ধে ফেরা (ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট) লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছিল। অজিতবাবুই প্রথম কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, যিনি গ্রেপ্তার হন। তারপর কারনান। তবে কারনান অবসর নেওয়ার আগে তার কারাদণ্ড হয়েছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হওয়ার পর, নিজের বদলির নির্দেশের উপর নিজেই স্থগিতাদেশ জারি করে শিরোনামে এসেছিলেন কারনান। তার পর বিচার বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি চিঠি লেখেন। প্রথা ভেঙে এভাবে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বিচার বিভাগের নিন্দা করার জেরেই তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়। কিন্তু দেশের প্রধান বিচারপতি-সহ সুপ্রিম কোর্টের আট বিচারপতির পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করেন কারনান। বার বার দেশের শীর্ষ আদালতকে কারনান যেভাবে অগ্রাহ্য করেছেন, তা আদালত অবমাননার সামিল বলে মনে করে সুপ্রিম কোর্ট। তাই তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ

- তিন বছরে রাজ্যে লো-ভোল্টেজের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে ৭ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। নয়া সাবস্টেশন তৈরি, ট্রান্সফর্মার ও ফিডার বসানো-সহ শক্তিশালী বিদ্যুৎবাহী তার লাগিয়ে ভোল্টেজ সমস্যা মেটাতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। প্রকল্পে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রও টাকা দিচ্ছে। সময়ে কাজ শেষ করতে নজরদারি কমিটিও হচ্ছে। রাজ্যে প্রায় সব গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছেছে বলে দাবি রাজ্য সরকারের। কিন্তু গ্রামে লো-ভোল্টেজ সমস্যা নতুন নয়। পরিকাঠামো উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে বছর দেড়েক আগে কাজ শুরু হয়। ঠিক হয়, গ্রাহককে উন্নত মানের বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে নতুন ১২৭-টি সাবস্টেশন-সহ ৩০ হাজার ট্রান্সফর্মার বসানো হবে। বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার মোটা তার লাগানো হবে। ক্ষমতা বাড়ানো হবে কিছু পুরোনো সাবস্টেশনের।
- ব্যারাকপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে এসে ৩০ মে দু'টি শিল্পতালুক গড়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি হাবরার বাণীপুরে, বস্ত্রশিল্প তালুক (টেক্সটাইল হাব)। অন্যটি, অশোকনগরে ছোটো শিল্পের তালুক (স্মল ইন্ড্রাস্ট্রি হাব)। বাণীপুরে শিক্ষা দপ্তরের প্রায় ২৫ কাঠা জমি আছে। সেখানেই বস্ত্রশিল্প তালুক হবে। ওই জমি এবার শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরে হস্তান্তরিত হবে। অশোকনগর রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রস্তুত হয় শাঁখা, টোপর-গয়না রাখার বাক্স, চিরুনিও। অশোকনগরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের যে জমি আছে, সেখানেই হবে ক্ষুদ্র শিল্পের হাব।
- শহরের পথ থেকে ঘোড়ায় টানা ট্রাম হারিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু সেই ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানো নিয়ে ব্রিটিশ আমলের অকেজো আইন কাগজে-কলমে রয়েই গিয়েছিল। দেশের আইন কমিশনের সুপারিশে সেই আইনটি ২২ মে বিধানসভায় বাতিল করেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী। 'দ্য স্টেজ-ক্যারেজ (রিপিলিং) বিল, ২০১৭' ওই দিন বিধানসভায় পাস করে 'দ্য স্টেজ ক্যারেজেস অ্যাক্ট, ১৮৬১' বাতিল করা হয়। আইন কমিশন সব রাজ্যকেই এই আইন বাতিল করতে বলেছে। তবে আইনটি বাতিল হলেও ব্যক্তিগতভাবে প্রমোদভ্রমণ বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ি আগের মতোই কলকাতা বা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চলাচল করতে পারবে।

● **গ্রামের শিক্ষিত বেকারদের জন্য 'মুক্তিধারা' :**

গ্রামে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম নয়। তাদের রোজগারের ব্যবস্থা করতে 'মুক্তিধারা' প্রকল্প চালু করছে সরকার। তাদের নিখরচায় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। 'মুক্তিধারা' নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতোমধ্যেই পাইলট প্রকল্প হিসেবে পুরুলিয়া জেলায় এর কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও ১০-টি জেলায় কাজ শুরু হয়ে যাবে। মুরগি, হাঁস, ছাগল পালন থেকে মাছ চাষ এবং ডেয়ারি ফার্মিং—সবেতেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদের নিয়ে তৈরি হবে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী। বাজেটে এর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। ১১-টি জেলার ৩৮-টি সদরের ২০৬-টি ব্লকে কাজ শুরু করা হবে। প্রতি সদরে একটি করে অফিস খোলা হচ্ছে। আর প্রতিটি ব্লকের পাঁচটি করে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নেওয়া হবে। এক-একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০-টি করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী করা হবে। এই পর্যায়ে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পুরুলিয়ার পাইলট প্রকল্পে সাড়া মিলেছে। বেকারদের জন্য সরকারের একাধিক প্রকল্প রয়েছে, যাতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া হয়। কোনও ব্যবসায় ৫ লক্ষ টাকার মূলধন দরকার হলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকি দেয় সরকার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারদের ব্যাংক থেকে সেই ধরনের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্তা করা হবে। এ ব্যাপারে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও মৎস্য দপ্তরও সহায়তা করবে।

● **জৈবচাষে চাষিদের নতুন সংস্থা রাজ্যে :**

চাষিদের আয় বাড়াতে তাদের নিয়েই কোম্পানি গড়ে বড়োসড়ো সাফল্য পেয়েছে কৃষি বিপণন দপ্তর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'সুফল বাংলা' নামে কাঁচা আনাজের স্টলগুলি চালাচ্ছেন চাষিরাই। এবার জৈবচাষেও সে রকমই কোম্পানি (ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি) তৈরি করছে কৃষি দপ্তর। কোম্পানি তৈরির অন্যতম শর্ত, চাষিদের নিজের জমি থাকতে হবে। সেই শর্ত মেনেই কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীনে এ পর্যন্ত ৫২-টি কোম্পানি তৈরি হয়েছে। জৈবচাষে উৎসাহ বাড়াতে সেই বাধ্যবাধকতাও শিথিল করতে রাজি কৃষি দপ্তর।

এখন কোনও ব্যক্তির একক চেষ্টায় কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রাজ্যের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে কীটনাশকমুক্ত চাষ হচ্ছে। সেই সব আনাজের দাম আকাশছোঁয়া। চাষিদের একত্রিত করে জৈব চাষের উৎপাদন বাড়িয়ে সেই একাধিপত্যে লাগাম টানতে চাইছে কৃষি দপ্তর। সরকারি উদ্যোগে হুগলির বলাগড় ও হরিপালে ১২-১৪ জনকে নিয়ে সুসংহত জৈবচাষ শুরু হয়েছে। এছাড়াও বাঁকুড়ার ছাতনা ও গঙ্গাজলঘাঁটিতে প্রায় আট হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হচ্ছে। সেখানকার ট্যাঁড়স, চিচিঙ্গা, পেঁপে, পটল ও কুমড়ো মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই, কাতারের বাজারে বিকোচ্ছে। কলকাতার বিধান শিশু

উদ্যান ও বাগুইআঁটিতেও সপ্তাহে এক দিন করে বাজার বসছে। একই কারণে হাওড়া পুরসভা বিদ্যাসাগর সেতুর নিচে কৃষি দপ্তরকে জায়গা দিয়েছে। ঠিক হয়েছে, যত দিন না পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্টল মিলছে, তত দিন সুফল বাংলার স্টলেই জৈব আনাজ বিক্রি করবেন চাষিরা।

● **আর্সেনিক দমনে নমামি গঙ্গে প্রকল্প :**

পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক-পীড়িত এলাকায় ওই ভয়াবহ দূষণ প্রতিরোধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডে গঙ্গার দু' পাশের আর্সেনিক-কবলিত এলাকায় সেই কাজ হবে। গত ২৬ মে কাশীপুরে এ কথা জানান কেন্দ্রীয় জলসম্পদ এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী উমা ভারতী। এই বিষয়ে প্রকল্প তৈরি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ভূজল পর্ষদ। আর্সেনিক পশ্চিমবঙ্গের ভয়ঙ্কর সমস্যা। বিশেষত গঙ্গা সংলগ্ন জেলাগুলিতে এর প্রকোপ বেশি। তার মোকাবিলায় কাজ করছে ভূজল সম্পদ। তার পরে বিষয়টিকে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার এই সিদ্ধান্তটি এক নতুন পদক্ষেপ। অনেকেরই অভিযোগ, এ রাজ্যে গঙ্গায় সরাসরি মলমূত্র ফেলা হয়। বিশেষত গঙ্গার পাড়ে বসবাসকারীরা ওই নদীতে মলমূত্র ত্যাগ করেন। এটি গঙ্গা দূষণের অন্যতম মূল কারণ। সামগ্রিকভাবে গঙ্গা দূষণ ঠেকাতে রাজ্য সরকারকে প্রকল্প পাঠাতে হবে কেন্দ্রের কাছে। গঙ্গার প্যাড়ে বসবাসকারীদের অধিকাংশই গরিব। নমামি গঙ্গে প্রকল্পে যেসব বর্জ্য শোধন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, সেখানে ওই গরিবদের কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

● **বেসরকারি স্কুল নিয়ন্ত্রণে কমিটি :**

রাজ্যে এবার বেসরকারি স্কুল শিক্ষায় ফি, ডোনেশন নিয়ন্ত্রণে সেল্ফ রেগুলেটরি কমিটি গড়ে তোলা হল। গত ৩১ মে কলকাতার টাউন হলে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষদের নিয়ে এক বৈঠকে ওই কমিটি গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও রাখা হয়েছে লা মার্টিনিয়ার, মর্ডার্ন হাই, সেন্ট জেভিয়ার্স, হেরিটেজ, ডিপিএস, শ্রীশিক্ষায়তন, লরেটো, সেন্ট লরেন্স, সাউথ পয়েন্ট, কলকাতার এই ৯-টি নামী স্কুলকে। থাকছেন কলকাতার দুই আর্চবিশপও। দার্জিলিং-এর এক প্রতিনিধিকেও ওই কমিটিতে রাখা হয়েছে। শিক্ষা সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশের কমিশনার ও প্রত্যেকটি জেলার ডিপিও-কে নিয়ে গড়া ওই কমিটিকে বছরে অন্তত ৪ বার মিটিং করতে হবে। আর সেই মিটিং-এ কী কী আলোচনা হল, কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা যাতে জনগণ জানতে পারেন, সে জন্য সে সবই ওয়েবসাইটে জানিয়ে দিতে হবে। কোনও গোপনীয়তা রাখা চলবে না।

● **সব সরকারি স্কুলে এবার একই ফি :**

শুধু বেসরকারি স্কুল নয়, সরকারি স্কুলগুলিও এত দিন আলাদা আলাদা ফি নিত। শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা আনতে সরকারি স্কুলগুলিতে একাদশ শ্রেণিতে ফি বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। ভর্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার উদ্যোগ পর্বে বেঁধে দেওয়া হল বিভিন্ন স্কুলের আসন-সংখ্যাও। সরকারি স্কুলগুলিতে একাদশ শ্রেণিতে বছরে ৭০০ থেকে ৯০০ টাকা ফি নেওয়া হ'ত। এবার ঠিক হয়েছে, যেসব বিষয়ের পঠন-পাঠনে গবেষণাগার ব্যবহার করতে হয় না, সেক্ষেত্রে বার্ষিক মোট ফি হবে ২৫০ টাকা। আর গবেষণাগার ব্যবহার করলে ফি ২৯৫ টাকা। এবার থেকে সব স্কুলই বেঁধে দেওয়া ফি নিতে বাধ্য হবে। সব সরকারি স্কুলেই ভর্তির ন্যূনতম নম্বর অভিন্ন। কোন সরকারি স্কুলে কী কী বিষয় নিয়ে ভর্তি হওয়া যাবে, সেটাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ভর্তির ফর্ম বিনা খরচে ডাউনলোড করা যাবে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে। স্কুলেও ফর্ম মিলবে। কোন সরকারি স্কুলে কোন কোন বিষয়ের পঠন-পাঠন হয়, কিছু দিন আগেই তার তালিকা চাওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী তৈরি হয়েছে 'সাবজেক্ট কম্বিনেশন'। কম্বিনেশনের বাইরে অন্য বিষয় নেওয়া যাবে না। ভর্তির নিয়মাবলি ও ফর্ম ইতোমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

● **আয় বাড়াতে তিন করে ওয়েভার স্কিম :**

পণ্য প্রবেশ কর, বিনোদন কর এবং হোটেল-রেস্তোরাঁর উপর বিলাস করের ক্ষেত্রে বিশেষ ওয়েভার স্কিম আনছে অর্থ দপ্তর। এ নিয়ে বিধানসভায় বিল পেশ করা হয়েছে। রাজ্যে মূলত পণ্য প্রবেশ করের বকেয়া বাবদ বিশাল অঙ্কের টাকা অনাদায়ী হয়ে রয়েছে। ২০১২ সালে এই কর চালু করার পর বেশ কিছু সংস্থা আদালতে গিয়েছিল। অধিকাংশ সংস্থা কর দেওয়া বন্ধও রেখেছিল। যেখানে প্রথম বছর পণ্য প্রবেশ কর বাবদ প্রায় ১২০০ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল, মামলার জেরে সেই আয় কমে অর্ধেক হয়ে যায়। গত কয়েক বছরে অনাদায়ী করের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের কর আদায়ের অধিকারে সিলমোহর দেয়। সেই আদেশের পর বহু সংস্থাকেই এখন বকেয়া কর মেটাতে হবে।

কিন্তু বর্তমান আইনে বকেয়া কর নিতে হলে নিয়ম মেনে তার উপর সুদ এবং জরিমানাও আদায় করার কথা। সেই পথ এড়িয়ে বিভিন্ন সংস্থাকে সুবিধা দিতেই সরকার একটি নতুন ওয়েভার স্কিম আনছে। যেখানে সুদ-জরিমানা ছাড়া শুধু বকেয়া করের টাকা মেটালেই হবে। অর্থ দপ্তরের আশা, বহু সংস্থা এই ওয়েভার স্কিমের সুবিধা নিয়ে বকেয়া পণ্য প্রবেশ কর মিটিয়ে দেবে। পণ্য প্রবেশ কর ছাড়াও বিনোদন কর এবং হোটেল-রেস্তোরাঁর উপর বিলাস কর আদায়ের ক্ষেত্রেও ওয়েভার স্কিম আনছে অর্থ দপ্তর। এই দুই ক্ষেত্রেও বহু কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। ওয়েভার স্কিমের সুবিধা নিয়ে তা মিটিয়ে দিলে রাজ্যের ঘরে বাড়তি কিছু রাজস্ব আসবে। আসলে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু হয়ে গেলে এই করগুলির উপযোগিতা সেভাবে থাকবে না। ফলে এখনও এই করগুলির নিয়ন্ত্রণে যেসব সংস্থা রয়েছে তারাও আর বকেয়া মেটাতে উৎসাহী হবেনা। সেই কারণে নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করে রাজস্ব বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে নবান্ন।

● **ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ওয়েবেল ইনফর্ম্যাটিক্স :**

ওয়েবেল-এর শাখা সংস্থাগুলিকে মিশিয়ে দেওয়ার নিদান দিয়েছে উপদেষ্টা সংস্থা ডেলয়েট। তার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বলেছে প্রতিটি শাখা সংস্থার আর্থিক স্বাস্থ্য চাঙ্গা করার কথা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করার কথা জানাল তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন ওয়েবেলের শাখা সংস্থা ওয়েবেল ইনফর্ম্যাটিক্স (ডব্লিউআইএল)। মূলত তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন শিল্পের জন্য প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে যারা। ২০১১-'১২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত প্রায় নাগাড়ে লোকসান করেছে তারা। সেখানে ২০১৬-'১৭ সালে তাদের ব্যবসা ৫০ কোটি ছাড়িয়েছে। পৌঁছেছে ৫২ কোটিতে। যা আগের বছরের তুলনাতেও প্রায় ২৫ শতাংশ বেশি। ২০১৭-'১৮ সালে এই অংক ১০০ কোটি ছোঁবে বলে তাদের দাবি।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ২০১১-'১২ সালে পর্যন্ত ডব্লিউআইএল-এর লাগাতার লোকসান করার অন্যতম কারণ ওই সংস্থা থেকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা আলাদা করে দেওয়া। ওয়েবেল টেকনোলজিকে সেই সমস্ত ব্যবসা দিয়ে দেওয়া হয়। সেই ধাক্কা সামলাতে সময় লেগেছে। উল্লেখ্য, গত বছরের মাঝামাঝি ওয়েবেলকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করে তুলতে ওয়েবেলের শাখা সংস্থাগুলিকে সংযুক্তিকরণের নিদান দেয় ডেলয়েট। প্রস্তাবে সায় দিয়েছে ওয়েবেলের পরিচালন পর্ষদও। সংযুক্তিকরণ হলে, ব্যবসা পাওয়া সহজ হবে। কমবে খরচ। কর্মীদের সম্মিলিত দক্ষতা ব্যবহার করা যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওয়েবেল টেকনোলজি নামে শাখা সংস্থাটিকে আলাদা রাখা হচ্ছে। তার ব্যবসার পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। প্রথমে হিসেবের সুবিধার জন্য ওয়েবেলের সঙ্গে মিশবে ওয়েবেল টেকনোলজি। পরে আলাদা হয়ে তা বেরিয়ে আসবে। তারা কাজ করবে ই-গভর্ন্যান্সের নোডাল এজেন্সি হিসেবে। এখন ওয়েবেলের মূল সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ডব্লিউবিইআইডিএল)। এছাড়া রয়েছে ছ'টি শাখা—ওয়েবেল ইনফর্ম্যাটিক্স, ওয়েবল মিডিয়াট্রনিক্স, ওয়েবেল ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সিস্টেমস, ওয়েবেল টেকনোলজি, ওয়েবেল কমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিজ ও ওয়েবেল কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স। সব মিলিয়ে কর্মী প্রায় ৪০০। তবে শেষ দু'টি সংস্থা বর্তমানে বন্ধ।

● **রাজ্যে খুচরো বিপণন নীতি তৈরি হয়নি এখনও :**

আলোচনা শুরুর দু' বছর পরও রাজ্য এখনও তৈরি করে উঠতে পারেনি 'রিটেল' বা খুচরো বিপণন নীতি। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটকের মধ্যেই চালু করেছে এই নীতি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাতও তৈরি করে ফেলেছে খুচরো বিপণন নীতি। অথচ এখনও দৌড়ে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রিটেলার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (আরএআই) এই নীতি নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করেছিল।

খুচরো বিপণনে বিনিয়োগ টানতে রাজ্য স্তরে এই নীতি জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ মূলত 'কনজিউমার' বা ক্রেতা-প্রধান রাজ্য হওয়ার কারণে খুচরো বিপণনের বাড়বাড়ন্ত সরকারি কোষাগারেও ইতিবাচক ছাপ ফেলবে। খুচরো বিপণন নীতি তৈরির ক্ষেত্রে একজানলা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছে আরএআই। বস্তুত দেশে ৮ শতাংশ কর্মসংস্থান তৈরি করা রিটেল বা খুচরো বিপণন ক্ষেত্রে নতুন বিনয়োগ টানতে জোরকদমে মাঠ নেমেছে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্য। লগ্নি টানার 'রোডম্যাপ'-কেই এসব রাজ্য খুচরো বিপণন নীতির ভিত হিসেবে ব্যবহার করছে। এই নীতির জোরে অন্ধ্রপ্রদেশ খুচরো বিপণনে ১৫০০ কোটি টাকা লগ্নি টেনেছে। তেলেঙ্গানাও ১০০০ কোটি টাকার বেসি লগ্নি পেয়েছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড কোনও রাজ্যে পা রাখার আগে সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন খতিয়ে দেখে। এ রাজ্যেও খুচরো ব্যবসায়ে দশ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করেন। আরএআই-এর তথ্য বলছে, ভারতে ১২ শতাংশ বার্ষিক হারে বাড়ছে এই ব্যবসা। ২০১৮ সালে এই ব্যবসার পরিমাণ ছুঁয়ে ফেলবে ৯৫,০০০ কোটি ডলার। পাশাপাশি, কেন্দ্রের শিল্পনীতি ও উন্নয়ন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ২০০০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৯৪ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ টেনেছে এই ক্ষেত্র।

● **হস্তশিল্প প্রসারে জোড়া কৌশল :**

একদিকে হাতে তৈরি প্রথাগত পণ্যে বৈচিত্র্য আনা। অন্যদিকে সেগুলির গুণমান ও উপযোগিতা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা। রাজ্যের হস্তশিল্পকে আরও ছড়িয়ে দিতে এবার এই জোড়া দাওয়াই প্রয়োগের পথেই হাঁটছে বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন (বিবিএমসি)। হস্তশিল্প প্রসারের লক্ষ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পরেই সংস্থাটি তৈরি করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। তৈরি হয় বিশ্ব-বাংলা ব্র্যান্ড। কিন্তু ছৌ নাচের মুখোশের মতো বাংলার সংস্কৃতির হাজারো নিদর্শনই হোক বা ডোকরা-টেরাকোটর ঘর সাজানোর জিনিস, প্রতিযোগিতা ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলেছে তাদেরও। বাজারে যখন হস্তশিল্প পণ্যের ছড়াছড়ি, তখন স্রেফ ঘরসজ্জার বৃত্তে আটকে থেকে যে ব্যবসা বাড়বে না, সে কথা মাথায় রেখেই এবার জোড়া কৌশল নিয়ে বাজার দখলে ঝাঁপাচ্ছে বিবিএমসি। হস্তশিল্পে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা হচ্ছে। জোর দেওয়া হচ্ছে ঘর সাজানোর বড়ো মাপের পণ্যগুলির ছোটো সংস্করণ বানানোয়। যেমন, মাদুরকাঠি ও শীতলপাটি দিয়ে তৈরি যোগ ব্যায়ামের ম্যাট কিংবা কাঠের চামচের উপর পটচিত্র ইত্যাদি। শুধু বৈচিত্র্য নয়, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মান যাচাইয়েও। ডোকরার কাঁচা-চামচ বাজারে মিললেও, সেগুলির ব্যবহারযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। বিবিএমসি তাই পণ্যের গুণমান যাচাইয়ের মাপকাঠি স্থির করতে চাইছে। এ জন্য ন্যাশনাল টেস্ট হাউসের মতো বিভিন্ন স্বীকৃত পরীক্ষাগারে সেগুলি পাঠাচ্ছে সংস্থা।

● **রাস্তার মোড়ের কিয়স্ক থেকেই এবার ই-জিডি :**

ই-জিডি করার সুবিধে আনছে কলকাতা পুলিশ। ই-জিডি মানে, বৈদ্যুতিন জেনারেল ডায়েরি। যা করতে থানায় যাওয়ার দরকার হবে না। মোবাইল, ড্রাইভিং লাইসেন্স কিংবা অফিসের পরিচয়পত্র খোওয়া যেতে পারে। পকেটমারি হতে পারে এটিএম কার্ড। হয়তো মিলছে যাচ্ছে না জন্মের বা মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের শংসাপত্র। এ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ও নতুন সিম কার্ড পেতে থানায় জেনারেল ডায়েরি করা বাধ্যতামূলক। তার পরে হারিয়ে যাওয়া জিনিস নতুনভাবে ফিরে পেতে চেয়ে করা আবেদনের সঙ্গে সেই জিডি নম্বর পেশ করতে হয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ই-জিডি কিয়স্ক তৈরি করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দশটি কম্পিউটারচালিত যন্ত্র কেনা হয়েছে। সেগুলি ধর্মতলা, শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট, পার্ক সার্কাস-সহ শহরের দশটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসানো হবে। প্রথমে নিজেকে নথিভুক্ত করতে হবে সঠিক পরিচয় যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় নিজের নাম, দ্বিতীয় ফোন নম্বর, ঠিকানা উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। তারপরে নালিশের ধরন, অর্থাৎ, জিনিসটি হারিয়েছে না খোওয়া গিয়েছে, কোথায়, কবে ও কখন ঘটেছে, তা জানাতে হবে। ঘটনাস্থল জানালে কম্পিউটার জানিয়ে দেবে, কোন থানার এক্তিয়ারে পড়ছে।

যেসব জিনিস হারালে বা খোলা গেলে ই-জিডি করা যাবে, সে রকম ৩১-টি বস্তুর একটি তালিকা তৈরি করেছে লালবাজার। ই-জিডি করতে গেলে কম্পিউটারের স্ক্রিনে ওই তালিকা ভেসে উঠবে। নিজের খোয়া যাওয়া বা হারানো জিনিসকে তার মধ্যে বেছে নিতে হবে। তার পরে জানাতে হবে বিস্তারিত বিবরণ। যেমন, আধার কার্ড হারালে তার নম্বর, ফোনের আইএমইআই নম্বর, সিম কার্ডের নম্বরের সঙ্গে সংস্থার নাম ইত্যাদি। এই সব ধাপ পেরোনোর পরে ই-জিডি নম্বর তৈরি হবে। ই-জিডি সর্বত্র বৈধ। ব্যাংক, মোবাইল পরিষেবা দেওয়া সংস্থা প্রয়োজনে পুলিশের ওয়েবসাইটে ই-জিডি-র নম্বর দিয়ে যাচাই করে দেখে নিতে পারেন। প্রথম প্রথম ই-জিডি কিয়স্কে পুলিশকর্মী থাকবেন। তারা মানুষকে সাহায্য করবেন ই-জিডি করতে। তবে, তালিকাভুক্ত ৩১-টি জিনিস হারালে ই-জিডি ছাড়াও থানায় গিয়েও জিডি করা যাবে।

● **কন্যা ভ্রূণ বাঁচাতে প্রচারে স্বাস্থ্য দপ্তর :**

পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে হাজার পুরুষপিছু মহিলা রয়েছেন ৯৫০ জন। রাজ্যের সমস্ত জেলার মধ্যে মেয়েদের অনুপাত কলকাতায় সবচেয়ে কম। হাজার পুরুষপিছু মহিলার সংখ্যা ৯৩৩। কন্যা ভ্রূণ হত্যার ঘটনাও কলকাতায় সবচেয়ে বেশি। এ রাজ্যে মহিলা-পুরুষের অনুপাত সবচেয়ে ভালো মুর্শিদাবাদ জেলায়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে মোট ২৪৯৬-টি ইউএসজি সেন্টার রয়েছে। যেখানে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করার অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে ৫০৪-টি সেন্টারই রয়েছে কলকাতায়। তালিকায় এর পরের নাম দার্জিলিং। সেখানে প্রায় শ' খানেক এ ধরনের ইউএসজি সেন্টার রয়েছে। পরিস্থিতির পরিবর্তনে উদ্যোগী স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রকল্পের নাম 'সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড'। ইউএসজি সেন্টারগুলিতে কোনও বেআইনি কাজ চলছে কিনা, তার উপরে কড়া নজরদারির পাশাপাশি স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে। লিঙ্গ নির্ধারণ কী, কেন তা অবৈধ এবং মেয়েদের সংখ্যা কমে গেলে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারে—ইতোমধ্যে কলকাতার আশপাশের স্কুলগুলিতে সেই সব বোঝানো হচ্ছে। শুধু এক তরফা বোঝানো নয়। এই প্রজন্ম এই সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে কী ভাবছে, তাও জানার চেষ্টা চলছে। তথ্যচিত্র, চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। পড়ুয়া এবং প্রশাসনিক কর্তা, এই দু' তরফের আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচি চলছে। বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শুধু ছাত্রীদের নয়, ছাত্রদেরও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, তাতে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি সাড়ে ছ' জন পুরুষপিছু এক জন করে মহিলা থাকবেন। যা কোনও দিনই সুস্থ সমাজ তৈরি করতে পারে না।

● **ভেজাল যুদ্ধে নয়া সংস্থা :**

দুধ, ঘি, সর্ষের তৈল, এমনকী বোতল বা জারবন্দি পানীয় জলেও ভেজাল। কিন্তু ভেজাল খাবার ও পানীয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে দেখা যাচ্ছে, তা একটি বা দু'টি দপ্তরের একার কাজ নয়, অনেকগুলি দপ্তর এর সঙ্গে যুক্ত। ভেজালের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধে নামতে এবার তাই একটি নোডাল এজেন্সি গড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। খাদ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখা (ইবি)-র ডিজি বিজয় কুমারকে এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব তৈরি করতে বলেছেন। সেটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি পেলেই ভেজাল রোখার নোডাল এজেন্সি তৈরি হবে। গত ১৮ মে খাদ্য ভবনে খাদ্যমন্ত্রী এবং ইবি-র ডিজি-র বৈঠক হয়।

বহু জায়গায় নিম্ন মানের চাল ও গম, পচা আটা, ভেজাল তেল বিক্রি হচ্ছে বলে খাদ্য দপ্তরের হাতে তথ্য আছে, সেই তথ্য এবার ইবি-কে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেকটরেরা আছেন। চাল-তেল-ডাল-গমের গণবণ্টন ব্যবস্থা দেখে খাদ্য দপ্তর। দুধে ভেজাল হলে দায় পড়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উপর। খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁর লাইসেন্স দেয় পুরসভা। খাবারের গুণমান ও সেটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৈরি হয়েছে কি না, তা বিচার করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ফুড সেফটি অফিসারেরা। ভেজাল বা পচা খাবারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করে ইবি। ভেজালের বিরুদ্ধে অন্য কয়েকটি রাজ্যে নোডাল এজেন্সি বা টাস্ক ফোর্স রয়েছে। সেই আদলে এখানেও প্রতি মাসে নোডাল এজেন্সির সদস্যেরা বৈঠক করবেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন ও নিয়মিত অভিযান করবেন।

● **হাওড়ায় গড়া হবে ছোটো শিল্পের 'হাব' :**

এবার হাওয়া জেলায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের 'হাব' তৈরি করবে রাজ্য সরকার। জেলার কোথায় কোন জমিতে কী ধরনের মাঝারি ও ছোটো শিল্প হতে পারে, তা সমীক্ষা করে রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছিল পরামর্শদাতা সংস্থা 'ক্রিসিল'-কে। তারা প্রায় ৭০০০ একর জমি চিহ্নিত করেছে। পতিত জমি কিন্তু জল, রাস্তা, বিদ্যুতের মতো পরিকাঠামো তৈরি করতে পারলে শিল্পের কাজে লাগানো যেতে পারে—এমন জমিই চিহ্নিত করেছে ক্রিসিল। সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, এমন জমিতে হাব হলে ২০২৮-'৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে অতিরিক্ত চার লক্ষ মানুষের। সংশ্লিষ্ট জমির মালিকেরা চাইলে সরকার ওই জমি কিনে নেবে। ছোটো শিল্পের প্রসারে হাওড়ায় ২০০ একর জমিতে 'বেলুড় শিল্প তীর্থ' গড়ে তোলা হচ্ছে। ১০০ একর জমিতে একটি বস্ত্র শিল্প তালুকও গড়ে উঠছে। নতুন করে কোথায়, কীভাবে শিল্প তালুক গড়ে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো যায়—এখন সেই পরিকল্পনা তৈরির কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, প্রথম পাঁচ বছরে অর্থাৎ, ২০২৩ সালের মধ্যে বেশকিছু অঞ্চলের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে যাবে। সেই কাজ সম্পন্ন হলে ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্র থেকে হাওড়ায় ১৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে। এক্ষেত্রে ছোটো ইঞ্জিনিয়ারিং, চর্মপণ্য, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, অলঙ্কার, প্লাস্টিক, রাবার, জরি, পাট প্রভৃতি শিল্পকে প্রধান্য দেওয়া হবে। প্রথাগতভাবে হাওড়ায় এই সব ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই শিল্পের উপযোগী মানবসম্পদও হাওড়া ও তার আশপাশের জেলাগুলিতে রয়েছে। নতুন পরিকল্পনায় শিল্পের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জমির পাশাপাশি বিনিয়োগে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে এক জায়গা থেকে সব ধরনের অনুমতি দেওয়ার জন্য 'এক জানলা' ব্যবস্থাও চালু হতে চলেছে।

● **মঞ্জুষা এবার বাণিজ্যিক যুদ্ধে :**

বাজার ধরার লড়াইয়ে নেমেছে রাজ্য সরকারের সংস্থা 'মঞ্জুষা'। লাভের মুখও দেখছে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমের অধীন এই সংস্থা। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে তাদের মোট বিক্রি হয়েছিল ৪৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার। লাভ হয়েছিল ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে বিক্রি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ, ৮৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। লাভ বেড়ে হয়েছে ৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। বিভিন্ন সংস্থার সরঞ্জাম সরবরাহের টেন্ডারে বহুজাতিক সংস্থাকে টেক্কাও দিচ্ছে তারা। গত বছর ৮৩-টি ই-টেন্ডারে যোগ দিয়ে ২১-টিতে বরাত পেয়েছে মঞ্জুষা। জিনিসের মান বজায় রেখেও দাম কমানোর চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন জেলায় পড়ুয়াদের পোশাক, জুতো, মিড-ডে মিলের রান্নার উপকরণ, রাঁধুনিদের পোশাক, পুলিশের জুতো এবং বেল্ট, ত্রাণ দপ্তরের কম্বল ও মেয়েদের পোশাক সরবরাহ হচ্ছে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে আদিবাসীদের তৈরি ভেষজ আবির বিক্রি করা হয়েছে এবার। পরিবহণ দপ্তরের কর্মীদের পোশাক সরবরাহের বরাতও মিলেছে। বেসরকারি হাসপাতাল ও পাঁচতারা হোটেলেও চাদর ও আরও কিছু সামগ্রী সরবরাহ করছে তারা।

● **জিএসটি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স রাজ্যে :**

পয়লা জুলাই থেকেই এ রাজ্যেও চালু হয়েছে পণ্য ও পরিষেবা (জিএসটি) কর। এ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সে ১৪ জুন অনুমোদন দিয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৫ জুন রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করতেই রাজ্যে জিএসটি চালুর পথ খুলে যায়। তখন বিধি, বিজ্ঞপ্তি এবং ট্রেড সার্কুলার জারি হয়। ফলে পয়লা জুলাই থেকে জিএসটি চালু করতে সমস্যা হয়নি রাজ্যে। চামড়া থেকে সোনা, চলচ্চিত্র থেকে তেল-সাবান, জামা কাপড়ের মতো ৬৬-টি পণ্যের উপর করের হার কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়া, জিএসটি চালু হওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে কেন্দ্র প্যাকেজও দিচ্ছে।

● **প্রবীণদের 'ভরসা' দিতে নতুন প্রকল্প :**

পরিসংখ্যান বলছে, প্রবীণ নাগরিকদের একটি বড়ো অংশই নানান নির্যাতনের শিকার। গত ১৫ জুন নন্দন প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ব প্রবীণ-নিগ্রহ সচেতনতা দিবস পালনের আয়োজন করেছিল নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর। মন্ত্রী শশী পাঁজা সেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৈরি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে ব্যাংক, হাসপাতাল, রাস্তা, শপিং মলে অধিকাংশ প্রবীণই মানসিক নিগ্রহের শিকার হন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রবীণ নাগরিকদের উন্নত জীবনের জন্য 'ভরসা' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেন। তাতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমাজকল্যাণ দপ্তর তরুণ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেবে। কীভাবে বয়স্কদের সঙ্গে সময় কাটানো যায়, তাদের ন্যূনতম শারীরিক পরীক্ষা কীভাবে করতে হয়। অচেনা আয়া সেন্টার থেকে কর্মী নিয়োগ না করে সরকারি নথিভুক্ত এই প্রশিক্ষিত কর্মীদের বাবা-মায়ের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করলে সন্তানেরাও অনেকটা নিশ্চিত থাকবেন। উল্লেখ্য, প্রবীণদের জন্য কলকাতা পুলিশেরও একটি প্রকল্প, 'প্রণাম' চালু আছে।

● **ইস্ট-ওয়েস্ট সম্প্রসারণে নীতিগত সায় :**

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পকে সল্টলেক থেকে ভিআইপি রোডের হলদিরাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার অনুমোদন আগেই মিলেছিল। এবার বিমানবন্দর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নীতিগত সম্মতি দিল রেল বোর্ড। তবে এখনই ওই প্রকল্পের কাজ শুরুর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। শুধু বলা হয়েছে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ হলদিরাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরে বিমানবন্দরের দিকের মুখ খোলা রাখতে। যাতে ভবিষ্যতে বিমানবন্দরের দিকে মেট্রো রুট সম্প্রসারণ করা যায়। সম্প্রতি এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল)-কে চিঠি দিয়েছে রেল বোর্ড। সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ, বৌবাজার, লালদিঘি হয়ে হাওয়া ময়দান পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রুটের প্রস্তাব অনুমোদন পায় ২০০৮ সালে। প্রকল্পের দায়িত্ব পায় কেএমআরসিএল। তারপর থেকে বহুবার প্রকল্পের রুট বদলেছে। সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে নতুন স্টেশন করা নিয়ে জমি-জট এবং লালদিঘির কাছেও স্টেশন তৈরি নিয়ে সমস্যা হয়। শেষমেশ ঠিক হয়, বৌবাজার-হিন্দ সিনেমা হলের কাছে স্টেশন হবে। সেখানে থেকে পাতালপথে এস. এন. ব্যানার্জি রোড, ধর্মতলা ট্রাম ডিপো, বি. বা. দী. বাগ হয়ে মেট্রো ঢুকে যাবে গঙ্গার তলায়। সেখান থেকে মাথা তুলে তা শেষ হবে হাওড়া ময়দানে। গঙ্গার নিচে ইতোমধ্যেই সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই বি. বা. দী. বাগ এলাকায় কয়েকটি পুরোনো বাড়ির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন নিয়ে এবং তিনটি প্রাচীন সৌধের একশো মিটারের মধ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়া নিয়ে ফের জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

এর মধ্যেই রাজ্য সরকার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পকে ভিআইপি রোডের হলদিরাম পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। ঠিক হয়েছে, সেক্টর ফাইভ থেকে কেষ্টপুর খাল ধরে বাঁক খেয়ে ভিআইপি রোড দিয়ে বাগুইআটি, দমদম পার্ক হয়ে প্রকল্প শেষ হবে হলদিরামে গিয়ে। ওখানেই সেটি জুড়বে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের সঙ্গে। ওই প্রকল্পটি ই. এম. বাইপাস হয়ে নিউ টাউন ঘুরে যাচ্ছে বিমানবন্দর। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প হাওড়া স্টেশন এবং শিয়ালদহ স্টেশন ছুঁয়ে যাচ্ছে। শহরতলি থেকে বিপুল পরিমাণ যাত্রী ওই দুই স্টেশনে যাতায়াত করেন। কাজেই, তা বিমানবন্দরের সঙ্গে যুক্ত হলে যাত্রীদের সুবিধে হবে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের যুক্তি মেনে নিয়েছে রেল বোর্ড। সে কারণেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোকে বিমানবন্দর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে তারা।

● **প্রাচীন সৌধের জট মুক্ত ইস্ট-ওয়েস্ট :**

অবশেষে জট খুলল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের। ব্রেবোর্ন রোড ও বি. বা. দী. বাগ এলাকার তিনটি প্রাচীন সৌধের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার অনুমতি দিল 'ন্যাশনাল মনুমেন্টস অথরিটি' (এনএমএ)। গত ১৯ জুন হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের আদালতে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কৌশিক চন্দ এনএমএ-র ওই অনুমতিপত্র তুলে দেন। তবে এনএমএ-র অন্যতম শর্ত হল, মাটির উপরে প্রাচীন সৌধের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণ কাজ করা যাবে না। সৌধের ১০০ মিটারের বাইরে মাটির উপরে মহাকরণ স্টেশন বা মেট্রোর অন্য কোনও নির্মাণ করা যেতে পারে। এনএমএ-র আরও শর্ত, মেট্রোর কাজে সুড়ঙ্গ খোঁড়া বা অন্য কোনও নির্মাণের সময়ে সৌধগুলির কোনও ক্ষতি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে তিন সদস্যের যৌথ কমিটি। ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (এএসআই) পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা, খড়্গপুর আইআইটি-র প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশনের এক জন অফিসার ওই কমিটিতে থাকবেন। কমিটি প্রতি মাসে রিপোর্ট দেবে এনএমএ কর্তৃপক্ষ এবং এএসআই-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে।

এনএমএ প্রথমে ওই অনুমতি না দেওয়ায় প্রকল্পের কাজ আটকে যেতে বসেছিল। তার জেরে হাইকোর্টে মামলা করে প্রকল্পের ঠিকাদার সংস্থা। হাওড়ার দিক থেকে গঙ্গার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার যন্ত্রের গতি কমিয়ে দিতে হয় সংস্থাকে। গত ১৫ জুন মামলার শুনানির সময়ে ঠিকাদার সংস্থার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বিচারপতি দত্তের আদালতে দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের একটি নথি পেশ করেন। তাতে দেখা যায়, দিল্লিতে প্রাচীন সৌধের তলায় ১০০ মিটারের মধ্যেই সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে। দিল্লির ক্ষেত্রে প্রাচীন সৌধের মাটির তলায় কত মিটারের মধ্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে, তা নিয়ে ওই দিন কেন্দ্রের ক্যাবিনেট সচিবকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এ দিন সেই হলফনামা পেশের কথা ছিল। কিন্তু মামলা শুনানির শুরুতেই এনএমএ-র তরফে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র আদালতে পেশ করা হয়।

● **৩২ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা, তালিকায় এ রাজ্যেরও এক :**

দেশের ৩২-টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এর মধ্যে কিছু কলেজকে দু' বছরের জন্য, কিছু কলেজকে এক বছরের জন্য অ্যাডমিশন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের পরও ছাত্র ভর্তি নিতে গেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অনুমতি পেতে হবে। নিম্নমানের পরিষেবা প্রদানের অভিযোগে কলেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ৩২-টি কলেজের তালিকায় এ রাজ্যের একটি কলেজও রয়েছে। সেটি হল হলদিয়ার 'আইকেয়ার ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ'। তবে, কলেজগুলিতে পাঠরত প্রায় চার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যতের দিকটাও নজরে রেখেছে মন্ত্রক। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ মতো ওই কলেজগুলিতে ইতোমধ্যেই যারা ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন, তাদের পড়াশোনা চলবে। এই ৩২-টি মেডিক্যাল কলেজকে ২ কোটি টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে। ওই মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিকাঠামো, শিক্ষার মান নিয়ে বেশকিছু অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কলেজগুলির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর অনুমোদন দেওয়া-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গত বছর মে মাসে তিন সদস্যের কমিটি গড়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কমিটির মাথায় রাখা হয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এম. এল. লোঢাকে। সেই প্যানেল গত বছর সরকারি অনুমোদন না পাওয়া ৩৪-টি কলেজকে শর্তসাপেক্ষে ছাত্র ভর্তির অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে এর মধ্যে ৩২-টি কলেজের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা চাপল।

● **কম খরচে প্রশিক্ষণ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরে :**

কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি এবার থেকে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির। গত ১৬ জুন এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান শিল্পমন্দিরের প্রতিনিধি স্বামী বেদাতীতানন্দ। বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে ১৯৫৪ থেকেই। তাতে ডিপ্লোমা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কম্পিউটার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এবার তার পাশাপাশি মাসিক দু' হাজার টাকায় এখানে সরকারি চাকরিতে বসার জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হল। ছ' মাসের প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও সরকারি চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পাবেন পড়ুয়া। প্রথমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সরকারি চাকরির পরীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও এ বছরের শেষ থেকে ব্যাংকের চাকরি এবং স্নাতক স্তরের চাকরির পরীক্ষার প্রশিক্ষণও শুরু হবে। এছাড়া যে কোনও পড়ুয়া সরকারি চাকরির প্রশিক্ষণে ভর্তি না হয়েও শিল্পমন্দিরে এসে নিখরচায় অন-লাইনে মক টেস্ট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। খুব কম খরচে ডিজিট্যাল মার্কেটিং প্রশিক্ষণেরও সুযোগ পাবেন যুবকেরা। বেলুড় মঠের শিল্পমন্দিরে পড়ানো হয় এমন যে কোনও বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন চাকুরিজীবী অথবা বাড়িতে বসে থাকা মহিলা বা পুরুষ। সে জন্য বিবেক ওয়েব স্কুল এর সুযোগ নিতে হবে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা www.vivekwebschool.org।

● **মডেল স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে চড়িয়ালে :**

বজবজ এলাকার চড়িয়ালের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মডেল করার কাজ শুরু করল বজবজ পুরসভা এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। পাশাপাশি কয়লা সড়কের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও সাজানোর কাজ চলছে। পুরসভা পরিচালিত মাতৃ সদনটিরও শয্যা বাড়ছে। অভিযোগ এখনও জেলা থেকে কারণে অকারণে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে 'রেফার' প্রবণতা রোধ করা যায়নি। তৃণমূল স্তরে পরিষেভার উন্নয়ন ঘটালেই সেই প্রবণতা রোখা সম্ভব বলে মত চিকিৎসকদের। সেই ভাবনা থেকেই বজবজ পুরসভা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ এই উদ্যোগ। প্রায় ৮০ হাজার জনসংখ্যার এই পুর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দু'টির সংস্কারে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ইতোমধ্যেই ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। বজবজ পুরসভা দিয়েছে আরও দু' লক্ষ টাকা। চড়িয়ালের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়িটি এখন একতলা। আরও বেশি রোগীকে চিকিৎসার সুবিধা পাইয়ে দিতে সেটি দোতলা হবে। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক থাকবেন সেখানে। বিনামূল্যে চিকিৎসাও পাওয়া যাবে। ওষুধও মিলবে নিখরচায়। তৈরি হচ্ছে পরীক্ষাগার। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া-সহ বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষাও হবে সেখানে। সম্ভবত আগস্টেই দু'টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হবে।

● **বাড়িতে বসেই টাটকা মাছ, পৌঁছে দেবে নিগম :**

বাঙালির পাতে এবার টাটকা মাছ তুলে দিতে এগিয়ে এল রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম। টাটকা মাছ বাড়ি বাড়ি পৌঁছনোর পাশাপাশি বেকার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে তাদের দিয়ে মাছ বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য মৎস্য দপ্তর। মহারাষ্ট্রের ধাঁচে এ রাজ্যে অত্যাধুনিক ব্যাটারিচালিত গাড়িতে মাছ বিক্রি করা হবে। মহারাষ্ট্র থেকে চারটি গাড়ি আনা হচ্ছে। প্রথমে কলকাতা ও শহরতলিতে দশটি গাড়িতে মাছ বিক্রি করা হবে। পরে তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে জেলায় জেলায়। নলবন, গোলতলা, রাজারহাটে অবস্থিত নিগমের জলাশয়গুলি থেকে নানা প্রজাতির টাটকা মাছ ন্যায্য মূল্যে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়াই নিগমের উদ্দেশ্য। নিগম ঠিক করেছে, মাসিক বেতনের ভিত্তিতে মহিলাদের নিয়োগ করা হবে। তিন চাকার গাড়ির পিছনে থাকবে রেফ্রিজারেটর-বক্স।

বছর দেড়েক আগে মুম্বই আইআইটি-র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কিশোর মুন্সির উদ্ভাবনায় তিন চাকার ব্যাটারিচালিত গাড়িটি প্রথম বাজারে আসে। সেই গাড়িতে করে ইতোমধ্যেই আনাজ, দুধ বিক্রি শুরু করেছেন মুম্বাই ও পুণের মহিলারা। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত তিন চাকার ব্যাটারিচালিত প্রতিটি গাড়ির দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। সকাল-বিকেল দু'টি শিফটে মাছ বিক্রি হবে। সকালে নিগমের জলাশয় থেকে জ্যান্ত মাছ ডেলিভারি করবেন যে মহিলারা, তারাই আবার বিকেলে বেরোবেন রান্না করা খাবার নিয়ে।

অর্থনীতি

➢ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় জমা পড়েছে ৫,০০০ কোটি কালো টাকা। নোট বাতিলের পরে গত ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার আওতায়

মার্চ পর্যন্ত কালো টাকা ঘোষণার সুযোগ ছিল। ওই টাকার ৪৯.৯ শতাংশ জমা দিতে হ'ত কর, জরিমানা এবং সারচার্জ হিসেবে। এর সঙ্গে ২৫ শতাংশ টাকা চার বছরের জন্য জমা রাখতে হ'ত বিনা সুদে। গত পয়লা জুন রাজস্ব সচিব হাসমুখ আঢিয়া জমার অঙ্কটি জানান।

● **দ্রুততম বৃদ্ধির দেশের আসন হারাল ভারত :**

বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বৃদ্ধির দেশের তকমা হারাল ভারত। গত ৩১ মে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬-'১৭ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি নেমেছ ৬.১ শতাংশে। সেই সূত্রে চিনের (৬.৯ শতাংশ) কাছে দ্রুততম বৃদ্ধির দেশের তকমা খুঁইয়েছে ভারত। পুরো অর্থবর্ষে বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.১ শতাংশ। জানুয়ারি থেকে মার্চের হিসেবে দেশের জাতীয় আয় বা জিডিপি বাড়ে ৬.১ শতাংশ হারে, যা গত দু' বছরের বেশি সময়ে সব চেয়ে কম। যে দেশটিকে হারিয়ে দুনিয়া জুড়ে আর্থিক বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান দখল করেছিল ভারত, সেই চিনের অর্থনীতি এই একই সময়ে এগিয়েছে ৬.৯ শতাংশ হারে। ২০১৫ সালে প্রথম বৃদ্ধির হারে চিনকে পিছনে ফেলে এই শিরোপা পায় ভারত। গোটা ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষ ধরলে বৃদ্ধি ৭.১ শতাংশ, তবে তাও ছুঁয়েছে গত তিন বছরের তলানি। গত বছরের হার ৮ শতাংশ। কিছুটা মুখরক্ষা করেছেন কৃষি। গত বছরে ভাল বর্ষার হাত ধরে ফলন বছরে বেড়েছে ৪.৯ শতাংশ হারে, জানুয়ারি-মার্চে ৫.২ শতাংশ। এপ্রিলে পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ২.৫ শতাংশ। ২০১৬-র এপ্রিলে যা ছিল ৮.৭ শতাংশ। কয়লা, অশোধিত তেল ও সিমেন্ট উৎপাদন কমায় ঢিমেতালে এগিয়েছে পরিকাঠামো শিল্প। গত অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতি অবশ্য বাজেটের হিসেবের সঙ্গে তাল রেখে দাঁড়িয়েছে জিডিপি-র ৩.৫ শতাংশ, জানিয়েছে কন্ট্রোলার জেনারেল অব অ্যাকাউন্টসের পরিসংখ্যান। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভিত্তিবর্ষ ২০০৪-'০৫ থেকে সরিয়ে এনে ২০১১-'১২ ধরা হয়।

● **তেল তোলায় আরও ন' মাস রাশ ওপেকের :**

অশোধিত তেলের উৎপাদনে আরও ন' মাস রাশ টেনে রাখার সিদ্ধান্ত নিল ওপেক। গত ২৪ মে ভিয়েনায় বৈঠকে বসেছিল তেল রপ্তানিকারী দেশগুলির এই সংগঠন। সেখানেই মার্চ পর্যন্ত উৎপাদন ছাঁটাই জারি রাখার কথা জানিয়েছে তারা। গত তিন বছর ধরেই বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের চাহিদা তলানিতে। ফলে এক সময়ে প্রতি ব্যারেলের দাম নেমে গিয়েছিল ৩০ ডলারের আশপাশে। তখনই উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় ওপেক। সেই দর বেড়ে এখন পৌঁছেছে ব্যারেলে ৫০ ডলারের উপরে। ভেনিজুয়েলা, রাশিয়া, সৌদি আরব, নাইজেরিয়ার মতো দেশে রাজকোষের অনেকটাই ভরে অশোধিত তেল বিক্রির টাকায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন তেলের দর বেড়ে ৫০ ডলারের উপরে উঠেছে ঠিকই। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে উৎপাদনে রাশ টেনে রাখা আছে বলেই। সমস্ত দেশ পুরোদমে তেল তুলতে শুরু করলে যে পরিমাণ উৎপাদন হবে, তা কেনার মতো চাহিদা বিশ্বে এখনও নেই। সে কথা আঁচ করেই ওপেক উৎপাদন কমিয়ে রাখার কৌশল জারি রাখল।

● **আইআরইডিএ-কে শেয়ার ছাড়তে সায় :**

তাপবিদ্যুতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দূষণমুক্ত জ্বালানি তৈরি বাড়ানোই লক্ষ্য কেন্দ্রের। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই রাষ্ট্রায়ত্ত অপ্রচলিত বিদ্যুৎ সংস্থাকে বাজারে শেয়ার ছেড়ে তহবিল তোলার অনুমতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ভারতের পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা বা ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবাল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (আইআরইডিএ)-কে ১৩.৯০ কোটি টাকার নতুন শেয়ার ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি। গত ৭ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে ১০ টাকা মূল দামের এই নতুন শেয়ার ছাড়ার ব্যাপারে সায় মিলেছে। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এর জেরে আইআরইডিএ-র ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা ৭৮.৪৬ কোটি থেকে বেড়ে হবে ৯২.৩০ কোটি।

আইআরইডিএ তার নতুন ইস্যুতে ছোটো লগ্নিকারী ও সংস্থার কর্মীদের ৫ শতাংশ কম দামে শেয়ার কেনার সুযোগ করে দেবে বলেও জানিয়েছে। চলতি আর্থিক বছরেই দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ তৈরি বাড়াতে ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে আইআরইডিএ। মূলত জোর দেওয়া হবে সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ তৈরিতে। বাড়তি ১৫ থেকে ১৬ গিগাওয়াট অপ্রচলিত বিদ্যুৎ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে কেন্দ্রীয় সরকারও। এর জন্য ঋণের অঙ্ক চলতি অর্থবর্ষে ৬৫ হাজার কোটি টাকা ছোঁবে। আইআরইডিএ ঋণ খাতে বরাদ্দ করেছে ৩৭ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে ২৮ হাজার কোটি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অপ্রচলিত বিদ্যুৎ সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে তারা। নতুন ইস্যুর পরে সংস্থার শেয়ার মূলধন বাড়লে ঋণও দিতে পারবে আইআরইডিএ।

● **মেয়েরা কাজ পেলে বৃদ্ধিও চাঙ্গা, সমীক্ষা বিশ্বব্যাংকের :**

বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা বলছে, কলেজের ডিগ্রি রয়েছে, এমন ৬৫ শতাংশ ভারতীয় মেয়েই অর্থকরী কাজের দুনিয়ায় অনুপস্থিত। মাধ্যমিকের চেয়ে বেশি শিক্ষাগতযোগ্যতা রয়েছে, এমন মেয়েদের মাত্র ৩৪ শতাংশ রয়েছে কর্মজগতে, বাকিরা এমনকী কাজ খুঁজছেনও না। আর মেয়েদের বেকার থাকার এই প্রবণতা দমিয়ে রাখছে আর্থিক বৃদ্ধিকেও, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দারিদ্র্য কমানোর পথে। ভারতের উন্নয়ন নিয়ে ২০১৭-র মে মাসে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা 'ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট' অর্থনীতির এই ছবিই তুলে ধরে উদ্বেগ জানিয়েছে। পাশাপাশি মেয়েদের জন্য নিরাপদ ও ভালো বেতনের কাজের সুযোগ বাড়ানোর দাওয়াই বাতলেছে। যার জেরে পুরো ১০০ বেসিস পয়েন্ট বাড়তে পারে বৃদ্ধিও। শুধু তাই নয়, ভারতে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জুনেদ আহমেদ বলেছেন, বৃদ্ধি ছুঁতে পারে ১০ শতাংশ। অথচ, কাজে মেয়েদের যোগ দেওয়া নিয়ে যে ১৩১-টি দেশ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ভারতের স্থান ১২০। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, ২০০৫ থেকে নামছে তাদের কাজে আসার হার।

গত কয়েক বছর ধরে ভারতে বৃদ্ধির হার ছিল বিশ্বে দ্রুততম। তার আর্থিক ভিতও শক্তিশালী। তার উপর পণ্য-পরিষেবা কর জিএসটি সময় মতো চালু হলে কর ব্যবস্থার দক্ষতা ও রাজস্ব, দুই-ই বাড়বে বলে ইঙ্গিত মিলেছে সমীক্ষায়। অর্থনীতির এই উজ্জ্বল ছবির পাশাপাশি মেয়েদের অর্থকরী কাজে পিছিয়ে থাকা নিয়ে পরিসংখ্যান দাখিল করেছে বিশ্বব্যাংক। ভারতে ২০০৫-২০১২ সালের মধ্যে প্রাপবয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ০.৯ শতাংশের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে। নিয়মিত বেতন মেলে, এমন কাজের বেশিরভাগই পেয়েছেন পুরুষরা। বাংলাদেশে শিল্পে মোট শ্রমিকের ৩৩ শতাংশ মহিলা। ভারতে তা ১৭

শতাংশ। স্নাতকদের মধ্যে দেশে ৬৫ শতাংশ বেকার। বাংলাদেশে যা ৪১ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিলে ২৫। বিশ্বব্যাংকের দাবি, বাংলাদেশ বা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এই ফারাক অর্ধেকও কমানো গেলে বৃদ্ধি ১০০ বেসিস পয়েন্ট ওঠা সম্ভব।

● **সেনসেক্স এই প্রথম ৩১ হাজারে :**

গত ২৭ মে নতুন ইতিহাস গড়ে ফেলল শেয়ার বাজার। ২৭৮.১৮ পয়েন্ট উঠে বিএসই-র সেনসেক্স এই প্রথম পেরিয়ে গেল ৩১ হাজারের মাইলফলক। দাঁড়াল ৩১,০২৮.২১ অঙ্কে। অন্যদিকে, আর এক সূচক ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফ্‌টি-ও ৮৫.৩৫ পয়েন্ট উঠে পা রাখল ৯,৫৯৫.১০ অঙ্কে। এ যাবৎ যা তারও নতুন শিখর। একই রকম ঝোঁক ছিল বিদেশি মুদ্রার বাজারেও। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম ওই দিন ১৮ পয়সা বাড়ে। দিনের শেষে এক ডলার দাঁড়ায় ৬৪.৪৪ টাকায়। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৪ সালের মে মাসে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেনসেক্স বেড়েছে ২৫.৫৩ শতাংশ আর নিফ্‌টি ৩০.৩৮ শতাংশ। আর ৩০ হাজার থেকে ৩১ হাজার, এই হাজার পয়েন্ট পেরোতে সেনসেক্স সময় নিল মাত্র ২১-টি লেনদেন। বাজার মহলের দাবি, সার্বিকভাবে লগ্নিতে উৎসাহী বাজারকে এগোতে ইন্ধন জুগিয়েছে চলতি বছরে ভাল বর্ষার পূর্বাভাস, জুনের আগাম লেনদেনের জন্য শেয়ার কিনে রাখা এবং বিশ্ব বাজারের ঊর্ধ্বমুখী গতিও। বিশেষ করে এর দিন দুয়েক আগেই যেখানে মার্কিন শেয়ার সূচক এসঅ্যান্ডপি ও ন্যাসড্যাক বাজার বন্ধের সময় রেকর্ড উচ্চতা ছুঁয়েছে। এছাড়া, জুলাই থেকে পণ্য-পরিষেবা কর চালুর সম্ভাবনা, ব্যাংকগুলির অনুৎপাদক সম্পদ সামলাতে কেন্দ্রের বাড়িত উদ্যোগ, বিভিন্ন সংস্থার ভাল আর্থিক ফল, অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার ইঙ্গিত—এ সবও বাজারকে উপরে তোলার ইন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

● **গ্রিসের জন্য আর্থিক ত্রাণ দাবি আইএমএফ-এর :**

গ্রিসকে পরবর্তী দফার আর্থিক ত্রাণ দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির কাছ থেকে বাড়তি অর্থ দাবি করল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। বিষয়টি নিয়ে এক বছর ধরে চলা টানাপোড়েনে ইতি টানতে ব্রাসেল্‌সে আইএমএফ-এর সঙ্গে বৈঠকে বসেন ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থমন্ত্রীরা। সেখানেই দীর্ঘ আলোচনা চললেও ঐকমত্য হয়নি। আইএমএফ-এর দাবি, প্রতিটি দেশ আলাদা আলাদা করে জানাক, কে কতটা দায় নিতে পারবে। তারা বাড়তি তহবিল জোগাতে রাজি হলে তবেই ত্রাণ খাতে পরবর্তী দফার অর্থ হাতে পাবে গ্রিস। জুলাইয়ে ৭০০ কোটি ইউরোর ধার শোধ করার জন্য ওই ত্রাণ গ্রিসের পক্ষে জরুরি। ত্রাণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই গ্রিস ফের ব্যয় সঙ্কোচের পথে হেঁটেছে। কর বাড়ানো ও পেনশন ছাঁটাই করে সরকারি খরচ কমানোর মতো অপ্রিয় সিদ্ধান্তে বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে এথেন্স। আইএমএফ-এর ইউরোপীয় দপ্তরের প্রধান পল টমসেন সংস্কারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

● **শেয়ারে মূলধনী লাভ-করে সুবিধা দিতে আইন বদল :**

শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে বেশকিছু ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ করে সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। ওই সব কেনাবেচায় সিকিউরিটিজ ট্রানজাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) বা শেয়ার লেনদেন বাবদ কর না দেওয়া থাকলেও লগ্নিকারীদের দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ কর লাগবে না। গত ৬ জুন কেন্দ্র জানিয়েছে, লগ্নিকারী কোনও সংস্থার নতুন শেয়ার (আইপিও) কিনলে, তার হাতে বোনাস শেয়ার এলে বা রাইট্‌স ইস্যুতে কেউ বিনিয়োগ করে থাকলে তাকে দীর্ঘ মেয়াদি মূলধনী লাভ কর দিতে হবে না। ওই বিনিয়োগের সময়ে এসটিটি না দেওয়া হলেও এই সুবিধা মিলবে। এ জন্য আয়কর আইনের ১০ (৩৮) ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে। ঘোষণায় আরও যেসব ক্ষেত্রে এসটিটি না দেওয়া সত্ত্বেও মূলধনী লাভ করে সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে : বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনাবাসী ভারতীয়দের লগ্নি বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের শেয়ারে বিনিয়োগ, এমপ্লয়িজ স্টক অপশন (ইসপ) প্রকল্পে কর্মীর হাতে আসা শেয়ার বা একটি সংস্থার সঙ্গে অন্যটি মিশে যাওয়ার সময়ে ইক্যুইটি বিনিময় প্রকল্পে পাওয়া শেয়ার।

পাশাপাশি ওই ঘোষণায় বলা হয়েছে যেসব লেনদেন ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর বা তার পরে হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে এসটিটি দেওয়া থাকলে তবেই মূলধনী লাভ করে সুবিধা মিলবে। উল্লেখ্য, ওই দিনের আগে এসটিটি-র অস্তিত্বই ছিল না। সংশয় যা নিয়ে ছিল তাহল, এসটিটি চালুর আগেও যারা শেয়ার কিনে রেখেছিলেন তারা এই সুবিধা পাবেন কি না। এবার স্পষ্ট হল, তারা সুবিধার আওতায় আসবেন। বর্তমান আইনে, এসটিটি দেওয়া থাকলে শেয়ার কিনে এক বছর ধরে রেখে বিক্রি করলে মুনাফায় মূলধনী লাভ কর লাগে না। তার আগে বিক্রি করলে ১৫ শতাংশ হারে এই কর দিতে হয়।

● **রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নীতি :**

বৃদ্ধির হার ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও আপাতত সুদ কমানোর পথে হাঁটল না রিজার্ভ ব্যাংক। কিন্তু গৃহ ঋণে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে তাতে সুদ কমানোর রাস্তা খুলে দিল। একই সঙ্গে, সরকারি ঋণপত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে যে টাকা বাধ্যতামূলকভাবে রাখতেই হয়, সেই বিধিসম্মত নগদ জমার অনুপাত (এসএলআর) ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক। ২০.৫ থেকে নামিয়ে এনেছে ২০ শতাংশে। যাতে বাজারে নগদের জোগান বাড়ে। গত ৭ জুন রেপো রেট (রিজার্ভ ব্যাংক যে সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে স্বল্প মেয়াদে ধার দেয়) এবং রিভার্স রেপো রেট (বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাছ থেকে শীর্ষ ব্যাংক যে সুদে ধার নেয়) অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঋণনীতি কমিটি।

এর পাশাপাশি ৩০ লক্ষ টাকার বেশি গৃহঋণে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। ৭৫ লক্ষের বেশি ধারে তা ৭৫ শতাংশ থেকে কমে হচ্ছে ৫০ শতাংশ। আর ৩০ থেকে ৭৫ লক্ষের গৃহঋণে তা নেমে আসছে ৩৫ শতাংশে। এতে সুদ কমানোর জন্য বাড়তি মূলধন আসবে ব্যাংকের হাতে। বৃদ্ধিকে চাঙ্গা করতে এটি রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্যোগ। এর ফলে গৃহঋণে সুদ কমলেও, তা নামছে না গাড়ি কিংবা শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে। রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়েছে, অর্থবর্ষের প্রথমভাগে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি দাঁড়াবে ২ থেকে ৩.৫ শতাংশ। আগে যা ছিল ৪.৫ শতাংশ। একইভাবে দ্বিতীয়ার্ধেও তা ৫ শতাংশ থেকে নেমে আসবে ৩.৫-৪.৫ শতাংশে। রিজার্ভ ব্যাংক আরও জানিয়েছে নোট নাকচের জেরে বৃদ্ধি ধাক্কা খায়নি। অর্থনীতির হাল টানল খেয়েছিল তার আগেই।

● **কর ফাঁকি বন্ধে চুক্তি ৬৮-টি দেশের :**

কৃত্রিমভাবে ভিন্ দেশে আর্থিক লেনদেন দেখিয়ে কর ফাঁকির সুযোগ নেওয়ার অভিযোগ অনেক বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে উঠেছে। যে দেশে কর নামমাত্র বা শূন্য, সেখানেই হিসেবের খাতায় মুনাফা

দেখায় তারা। এ ধরনের আইনি ফাঁকফোকর এড়াতে গত ৯ জুন চুক্তি সই করল ভারত-সহ ৬৮-টি দেশ। প্যারিসে কর ফাঁকি বাগে আনার এই বহুদেশীয় চুক্তিতে সই করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। রাষ্ট্রপুঞ্জের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত শাখা ওইসিডি এবং জি-২০ গোষ্ঠীর উদ্যোগে এই চুক্তি সম্ভব হয়েছে। চুক্তি অনুসারে ভারত থেকেই ব্যবসার সিংহভাগ লেনদেন হলে সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক সংস্থার 'স্থায়ী কেন্দ্র' বা 'পার্মানেন্ট এসট্যাবলিশমেন্ট' এ দেশেই বলে ধরা হবে। করও মেটাতে হবে ভারতে। এত দিন স্থায়ী কেন্দ্রের সংজ্ঞা ঢিলেঢালা ছিল বলেই যেখানে কর কম, সেখানে কৃত্রিমভাবে ব্যবসা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। সাধারণত বহুজাতিকরা নিজের দেশে কর কম থাকলে সেখানেই এই সুযোগ নিত। ভারত-সহ বিশ্ব জুড়ে ৬৮-টি দেশ এর বিরুদ্ধে লড়তেই চুক্তি করেছে। ফলে এবার থেকে ভারতে ব্যবসা থাকলে কেন্দ্রের ভাঁড়ারে কর জমা করতে হবে, লেনদেন বিদেশের মাটিতে হলেও। এদিকে সফ্‌টওয়্যার ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবায় একটি বহুজাতিকের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শাখার লেনদেনে (ট্রান্সফার প্রাইসিং) সর্বোচ্চ করের সীমা ২২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেনে তা খাটবে।

● **দৈনিক পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বদলানো শুরু হল :**

বিশ্ব বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ১৬ জুন থেকে সারা দেশে দৈনিক পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বদলানো শুরু হল। প্রতিদিন সকাল ৬-টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। ইন্ডিয়ান অয়েল-সহ তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা সূত্রে খবর, তেলের দৈনিক দাম জানাতে দেশের প্রায় সমস্ত পেট্রোল পাম্পে এলইডি স্ক্রিন রাখার ব্যবস্থা করার হয়েছে। এসএমএস, টোল-ফ্রি নম্বর, মোবাইল অ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রেতাদের কাছে বার্তা পৌঁছে যাবে। সমগ্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে দেশ জুড়ে ৮৭-টি কন্ট্রোল রুম খোলারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল। এছাড়া থাকছে ইন্ডিয়ান অয়েলের বিশেষ মোবাইল অ্যাপ। ফুয়েল@আইওসি (Fuel@IOC)। এই অ্যাপটি ডাউনলোড করলেই দেশের যে কোনও শহরে বসে সহজেই জেনে নেওয়া যাবে সে দিনের পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, ওই অ্যাপে একটি ট্যাব রয়েছে 'Locate Us'। ট্যাবটিতে ক্লিক করলেই একটি ম্যাপ খুলবে যার মারফত কাছাকাছি কোন পেট্রোল পাম্প রয়েছে তা সহজেই জানা যাবে। সেই সঙ্গে ওই পাম্পটিতে সে দিনের পেট্রোল-ডিজেলের দামও জেনে নেওয়া যাবে। এসএমএস-এর মাধ্যমেও ক্রেতারা দৈনন্দিন দাম জানতে পারেন। সে ক্ষেত্রে RSP>SPACE>DEALER CODE দিয়ে ৯২২৪৯-৯২২৪৯ এই নম্বরে এসএমএস পাঠালেই দাম জানা যাবে। ক্রেতারা যে পাম্প থেকে তেল ভরাবেন সেখানেই লেখা থাকবে ডিলার কোড। সংস্থা সূত্রে খবর, এবার থেকে রোজ রাত ৮-টায় পাম্পের ডিলারদের পরের দিনের দাম জানিয়ে দেবে তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাই। ক্রেতারা নতুন দাম সঠিক কি না, যাচাই করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট তেল সংস্থার দেওয়া নম্বরে এসএমএস করে জেনে নিতে পারবেন।

● **খুচরো দর কমল, সঙ্গে শিল্পোৎপাদনও :**

খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি নজির গড়ে মে মাসে নেমে এল ২.১৮ শতাংশে। তার মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর দাম সরাসরি পড়েছে ১.০৫ শতাংশ, বিশেষ করে কমেছে ডাল ও শাক-সব্জির দাম। তবে ১২ জুন প্রকাশিত সরকারি হিসাব অনুযায়ী কল-কারখানার উৎপাদন এপ্রিলে ৩.১ শতাংশে নেমে আসে, যা গত বছরের এপ্রিলের ৬.৫ শতাংশের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। মূলধনী পণ্যের উৎপাদন এপ্রিলে সরাসরি ১.৩ শতাংশ কমেছে। নতুন বিনিয়োগের মাপকাঠি হিসেবেই ধরা হয় মূলধনী পণ্য উৎপাদনকে। আগের বছর এপ্রিলে তা বেড়েছিল ৮.১ শতাংশ। পাশাপাশি, ফ্রিজ-টিভি-ওয়াশিং মেশিনের মতো দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও সরাসরি কমেছে ৬ শতাংশ, আগের বছর একই সময়ে যা বেড়েছিল ১৩.৮ শতাংশ হারে। গত ২০১২ সালে কেন্দ্র খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হিসেব জানানো শুরু করার পর থেকে তা ২০১৭-র মে মাসেই প্রথম এত নিচে নামল। ডাল ও শাক-সব্জির দাম কমার হাত ধরে তা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি সরকারি পরিসংখ্যানে। শাক-সব্জির দাম মে মাসে নেমেছে ১৩.৪৪ শতাংশ, ডাল ১৯.৪৫ শতাংশ। পোশাক, আবাসন, জ্বালানি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কমেছে মূল্যবৃদ্ধি। বস্তুত ২.১৮ শতাংশে নেমে আসা খুচরো মূল্যবৃদ্ধি রয়টার্সের পূর্বাভাস ২.৬০ শতাংশের চেয়েও কম। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস প্রকাশিত শিল্প বৃদ্ধির পরিসংখ্যানে এ দিন জানানো হয়েছে, উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধি গত বছরের ৫.৫ শতাংশ থেকে এক ধাক্কায় নেমেছে ২.৬ শতাংশে। উল্লেখ্য, শিল্প বৃদ্ধি হিসেব করায় উৎপাদন শিল্পের গুরুত্ব ৭৭.৬৩ শতাংশ। পাশাপাশি, খনন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ৪.২ শতাংশ (গত বছর ছিল ৬.৭ শতাংশ), বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫.৪ শতাংশ (গত বছর ১৪.৪ শতাংশ)।

● **আর্থিক সংস্থার সঙ্কট এড়াতে কেন্দ্রের বিল :**

শিল্প সংস্থার জন্য নতুন দেউলিয়া আইন আগেই তৈরি করেছে কেন্দ্র। এবার ব্যাংক, বিমা এবং অন্যান্য আইর্থক সংস্থায় দেউলিয়া ঘোষণার মতো সঙ্কট তৈরি হলে, দ্রুত তার মোকাবিলা করার পথ সহজ করতেও উদ্যোগী হল কেন্দ্র। এই লক্ষ্যে একটি আলাদা নিগম (রেজোলিউশন কর্পোরেশন) তৈরির জন্য বিল সংসদে আনার প্রস্তাবে ১৪ জুন ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সরকারি বিবৃতিতে দাবি, এই সঙ্কট সমাধান এবং জমার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিলের (ফাইন্যান্সিয়াল রেজোলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনশিওরেন্স বিল-২০১৭) মূল লক্ষ্য হবে আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানোর আরও কোনও সম্ভাবনা নেই, এমন ধুঁকতে থাকা আর্থিক সংস্থার পিছনে যাতে দেশের মানুষেটর টাকা জলে না যায়, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। কোনও ব্যাংক, বিমা কিংবা অন্য আর্থিক সংস্থা যদি দেউলিয়া ঘোষণার মতো পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করা হবে, তারও সার্বিক কাঠামো থাকবে প্রস্তাবিত এই বিলে। এই বিলটি সংসদে পেশ করার বিষয়েই সবুজ সঙ্কেত মিলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিল পাস হয়ে আইনে পরিণত হলে, দু'টি সুবিধা হবে। প্রথমত, কোনও ব্যাংক বা বিমা সংস্থা দেউলিয়া ঘোষণার মুখে দাঁড়ালে, সেখানে টাকা থাকা গ্রাহকের অন্তত পুরোটা যাতে জলে না যায়, তা নিশ্চিত করবে নিগম। দ্বিতীয়ত, শিল্প সংস্থার জন্য নতুন দেউলিয়া বিধি চালুর মূল লক্ষ্য, ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ সামনে খোলা না থাকলে, গোটানোর রাস্তা সহজ করা। যাতে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলে, সংস্থা দ্রুত তা পায়। আবার তা না থাকলে, ধারের টাকা তাড়াতাড়ি ফেরত পায় ঋণদাতারা।

● **এনপিএ নিয়ে বৈঠক শুরু ঋণদাতা ব্যাংকগুলির :**

বড়ো মাপের ব্যাংক ঋণ খেলাপি ১২-টি সংস্থাকে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই চিহ্নিত করেছে রিজার্ভ ব্যাংক। তার মধ্যে প্রথম দফায় ৬-টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে ১৯ জুন থেকেই বৈঠকে বসে বিভিন্ন ব্যাংক। দেউলিয়া আইএন এই সব সংস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নিতেই এই বৈঠক। ব্যাংকিং শিল্প সূত্রে খবর, এনসিএলটি-তে যাওয়ার আগে ওই ৬-টি ঋণ খেলাপি সংস্থার কাছ থেকে টাকা উদ্ধারের পথ ঠিক করতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিতে চান ব্যাংককর্তারা। এই ৬-টি ঋণ খেলাপি অ্যাকাউন্ট হল : ভূষণ স্টিল, এসার স্টিল, ভূষণ পাওয়ার অ্যান্ড স্টিল, অলক ইন্ডাস্ট্রিজ, মনেট ইস্পাত ও অ্যামটেক অটো। বিভিন্ন ব্যাংক মিলিয়ে এদের খাতায় জমা রয়েছে বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ। পেশাদার দেউলিয়া আইন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ নিয়েও কথা বলবেন ব্যাংককর্তারা। সেক্ষেত্রে তারাই ঋণ উদ্ধারের পরিকল্পনা তৈরি করে তা পেশ করবেন ব্যাংকগুলির কাছে। প্রসঙ্গত, আরবিআই যে ১২-টি বড়ো অঙ্কের ঋণ খেলাপি সংস্থাকে চিহ্নিত করেছে, তাদের বকেয়ার অঙ্ক ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। তাদের হাতেই রয়েছে ব্যাংকগুলির ঘাড়ে চাপা মোট অনুৎপাদক সম্পদের ২৫ শতাংশ। ব্যাংকিং শিল্প সূত্রে খবর, এর জেরে অনাদায়ী ঋণের বোঝায় জেরবার মূলত স্টেট ব্যাংক, পিএনবি, আইসিআইসিআই ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, আইডিবিআই ব্যাংক ও কর্পোরেশন ব্যাংক।

● **ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর পাঁচ বছর পর্যন্ত পদ পাবেন না :**

দীর্ঘ দিন লেনদেন হয়নি, এমন ভুয়ো সংস্থার পরিচালন পর্ষদে যারা ডিরেক্টর রয়েছেন, তারা পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনও নথিবদ্ধ বা 'রেজিস্টার্ড' সংস্থার ওই পদে বসার যোগ্যতা হারাতে পারেন। বেআইনিভাবে টাকা সরানোর উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া ওই সব সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্তের জাল ছড়াতে এই পথেই হাঁটছে কেন্দ্র। উদ্দেশ্য, একই সঙ্গে কালো টাকায় রাশ টানা। কারণ, এ ধরনের সংস্থাই অনেক ক্ষেত্রে বেআইনি লেনদেন এবং বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনে অর্থ জোগানোর মাধ্যম বলে অভিযোগ। কড়া ব্যবস্থা নিতে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ (আরওসি)-এ নথিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে সেগুলির নাম কেটে দেওয়া ও ডিরেক্টরদের উপর বিধি-নিষেধ আনতে চায় কেন্দ্র। কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক এ ধরনের সংস্থাকে নজরদারির জালে আনতে তথ্যভাণ্ডার তৈরি করছে। তার ভিত্তিতে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনে শাস্তির আওতায় আনা হবে ওই সব সংস্থার কর্তাদের। ওই আইনের ১৬৪ ধারায় ভুয়ো হিসেবে গণ্য করার বেশকিছু শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই রয়েছে এমন সংস্থা, যারা পর পর তিন বছর আর্থিক ফল সংক্রান্ত বিবৃতি বা বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেনি। কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক ইতোমধ্যেই এমন ২.৯৬ লক্ষ সংস্থার হদিস পেয়েছে। তারা একটানা তিন বছর না হলেও দু' বছর বার্ষিক রিটার্ন জমা দেয়নি। প্রাথমিক অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে, ওই সব সংস্থা আদৌ কোনও ব্যবসা করেনি। কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক ইতোমধ্যে এই সব সংস্থাকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়েছে।

● **নতুন দেউলিয়া আইনে ১০০-র বেশি সংস্থা ট্রাইব্যুনালে :**

নতুন দেউলিয়া আইন বা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি অ্যাক্ট-এর আওতায় নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যেই ১০০-টির বেশি সংস্থা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি)-এর কাছে আবেদন করেছে। সম্প্রতি এ কথা জানিয়েছেন ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এম এস সাহু। গত ২০ মে আইনটি চালু হওয়ার পরে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই সারা দেশে ১১০-টি সংস্থা এনসিএলটি-র কাছে আবেদন করেছে। প্রসঙ্গত, দেউলিয়া আইন কার্যকর করা এনসিএলটি-র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাদের কাছেই সংস্থা পুনরুজ্জীবন বা গুটিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারী সংস্থাটিকে চাঙ্গা করা বা সেটির ঝাঁপ বন্ধ করার ব্যাপারে এনসিএলটি-ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

কিছু সংস্থার ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে এনসিএলটি-কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যাংকরাপসি বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে। দেউলিয়া আইনটি চালু হওয়ার সময়ে বলা হয়েছিল, ১৮০ দিনের মধ্যে এনসিএলটি-কে সংস্থা চাঙ্গা করা বা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ৯০ দিনে যেসব ধরনের সংস্থার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও ছোট সংস্থা, যেগুলির মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার কম এবং বছরে মোট আয় ২ কোটি টাকার নিচে। এছাড়া ওই তালিকায় রয়েছে সেই সব সংস্থা, যেগুলি শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত নয় এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকার কম। ৫ বছরের কম পুরোনো এবং বছরে মোট আয় ২৫ কোটি টাকার নিচে, এমন স্টার্ট-আপ সংস্থার ক্ষেত্রেও ৯০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এনসিএলটি-কে।

● **নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে প্যানের সঙ্গে আধার বাধ্যতামূলক :**

আধার নম্বর যাদের রয়েছে, তাদের ৩০ জুনের মধ্যে তা প্যানের সঙ্গে জুড়তে ইতোমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। গত ১৬ জুন ব্যাংকের নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতেও প্যানের (বা ফর্ম-৬০) সঙ্গে আধার জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করল তারা। আধার লাগবে ৫০ হাজার টাকা বা তার বেশি অঙ্কের যে কোনও লেনদেনেও। যাদের পুরোনো অ্যাকাউন্ট রয়েছে কিন্তু আধার জমা দেওয়া হয়নি, তাদেরও তা করতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নইলে বন্ধ হবে সেই অ্যাকাউন্টের লেনদেন। এখনও পর্যন্ত আধার হাতে না পেলেও ছাড় নেই। অ্যাকাউন্ট খুলতে জমা দিতে হবে তার জন্য আবেদনের প্রমাণ। কড়াকড়ি করা হয়েছে ছোটো অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও। যা খুলতে কেওয়াইসি লাগে না, তেমনই জমা দেওয়া যায় না ৫০ হাজারের বেশিও। প্রসঙ্গত, আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য আধার বাধ্যতামূলক করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু তা নিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। শেষমেশ শীর্ষ আদালত বলে, আধার থাকলে তা জমা দিতে হবে চলতি মাসেই। না থাকলে ওই তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক নয়।

● **দেশে এফ-১৬ তৈরি করতে চুক্তি টাটাদের :**

গত ১৯ জুন এফ-১৬ যুদ্ধ বিমানের উন্নততম সংস্করণ 'ব্লক ৭০' তৈরির জন্য মার্কিন সংস্থা লকহিজ মার্টিনের সঙ্গে চুক্তি করল টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস। সেই এফ-১৬, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে যা নিয়ে গল্প এক সময়ে মুখে মুখে ফিরেছিল। নিজেদের আকাশ রক্ষায় এই বিমান ব্যবহার করে পাকিস্তান, ইরাক-সহ ২৬-টি দেশ। প্রতিরক্ষায় আমদানি নির্ভরতা কমাতে ভারতেই উন্নত প্রযুক্তির প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিরও এটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিশেষত, মার্কিন সংস্থাটি যেভাবে টেক্সাসে নিজেদের ফোর্ট ওয়ার্থ কারখানার কাজ ভারতের মাটিতে নিয়ে

আসার কথা বলেছে, তা বড়ো বিনিয়োগের ইঙ্গিত দেয়। আসতে পারে আধুনিক প্রযুক্তিও। তবে এই যুদ্ধ বিমান ভারতীয় বিমানবাহিনীকে ব্যবহার করতে হবে বলে আগেই বলে রেখেছে মার্কিন সংস্থাটি। পাশাপাশি, রাস্তা খোলা থাকছে এ দেশে তা তৈরি করে রপ্তানিরও।

খেলা

- মহিলাদের ওয়ান ডে-তে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হিসাবে রেকর্ড কায়েম করলেন "চাকদহ এক্সপ্রেস"। সম্প্রতি পনেরো বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনে ১৮৫ ওয়ান ডে উইকেট নেওয়ার সুবাদে এই নজির গড়েছেন মেয়েদের ক্রিকেটে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী।
- পাঁচ বছর পর ফের লা লিগা চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। গত ২১ মে মালাগাকে ২-০ গোলে হারিয়ে লা লিগা জয় করেছে রোনাল্ডোরা। মালাগার বিরুদ্ধে শুরুতে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। তা নিয়ে শেষ ন' ম্যাচে চোদ্দো গোল করেন তিনি। লা লিগায় ২৯ ম্যাচে মোট ২৫ গোল। রিয়ালের এই সাফল্যে কোচ জিদান কৃতিত্ব দিচ্ছেন তার খেলোয়াড়দের।
- এশিয়ান কাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচে কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্ত বাঁধা টপকাল ভারত। কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীর গোলে ১-০ জিতল স্টিভন কনস্ট্যান্টাইনের দল। গত ১৩ জুন কেরিয়ারের ৯৪তম ম্যাচে ৫৪তম গোল করেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। এই জয়ের ফলে টানা আট ম্যাচে জিতল ভারত। যার দরুন ছ'পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষেই রইল ভারত। ভারতের পরের ম্যাচ ৫ সেপ্টেম্বর ম্যাকাও-এর বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের চেয়ে ৩২ ধাপ পিছিয়ে রয়েছে কিরঘিজ প্রজাতন্ত্র।
- ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ২৫তম মরসুমের চ্যাম্পিয়ন লন্ডনের ক্লাব চেলসি। মরসুম শুরু হয় ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট ও শেষ হয় গত ২১ মে। তবে, ম্যাঞ্চেস্টার এরিনায় কনসার্টে জঙ্গি হানায় বাইশ জনের মৃত্যুর রেশ এসে পড়ে ফুটবল টিমের উৎসবেও। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব কাটছাট করে চেলসি। প্রসঙ্গত, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সূচনা হয় ১৯৯২ সালে।
- নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম ঘোষণা করল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) কর্তৃপক্ষ। জেএসডব্লিউ গ্রুপের বেঙ্গালুরু এফসি এবং টাটা গ্রুপের জামশেদপুর। কলকাতা, মুম্বই, নথ-ইস্টের মতো দলগুলির সঙ্গে আইএসএল-এর চতুর্থ সংস্করণে এবার দেখা যাবে এই দুই দলকে। গত মে মাসের ১২-২৫ তারিখের মধ্যে আইএসএল-এর জন্য দরপত্র চেয়ে দেশের দশটি শহর থেকে টেন্ডার ডেকেছিল ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল)। বেঙ্গালুরু, জামশেদপুর ছাড়াও টেন্ডার ডাকা হয়েছিল কটক, আমেদাবাদ, দুর্গাপুর, হায়দরাবাদ, রাঁচী, শিলিগুড়ি, তিরুঅনন্তপুরম এবং কলকাতা থেকেও।
- ২০১৭-এ এই প্রথম ট্র্যাকে নামলেন বোল্ট। জামাইকার মাটিতে এটাই তার শেষ ১০০ মিটার। আর জিতেই ইতি টানলেন। ঠিক যেখান থেকে উসেইন বোল্ট তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ২০০২ সালে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখানে গত ১১ জুন তাকে বিদায় জানাতে হাজির ছিল ৩০ হাজার সমর্থক। বিশ্বের এই ৩০ বছর বয়সী দ্রুততম পুরুষ নিজের রেকর্ডের থেকে পিছিয়েই, ১০.০৩ সেকেন্ড নিয়ে শেষ করলেন। আগস্টে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের পরই ১০০ মিটার থেকে অবসর নেওয়ার কথা তার।
- বিসিসিআই-এর লোগো নিয়ে এবার প্রশ্ন ওঠাল সেন্ট্রাল ইনফর্মেশন কমিশন। কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, বিসিসিআই যে প্রতীক ব্যবহার করে তা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশদের সব থেকে পছন্দের রাজাকে দেওয়া 'স্টার অফ ইন্ডিয়া' সম্মানের লোগোর মতোই দেখতে। কেন এখনও ব্রিটিশদের তৈরি লোগো ব্যবহার করছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড? যে লোগো তৈরি করা হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সিআইইস আরও প্রশ্ন তোলে, কেন সরকার এই লোগো পরিবর্তন করে পুরোপুরি ভারতীয় লোগো তৈরি করেনি? সেখানে কেন পতাকার রঙ বা অশোকচক্রের মতো লোগো করা হল না?
- ১০-১৬ বছরের ক্যান্সার জয়ী ১৪ জন খুদেকে বেছে নিয়ে রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত অষ্টম 'ওয়ার্ল্ড চিল্ড্রেন উইনার গেমস্'-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করে মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রাজ্য থেকে খড়্গপুরের মঙ্গলদীপ মিত্র ও চিত্তরঞ্জনের চিদাগ্নি পাণ্ডে মস্কোতে গিয়েছিল। প্রতিযোগিতায় দাবাতে রুপো পেয়েছে মঙ্গলদীপ। চিদাগ্নি ফুটবল, দৌড়ে সোনা ও দাবায় রুপোর পদক পেয়েছে। গত ১-৬ জুন মস্কোর একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন 'গিফট অফ লাইফ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় ১৬-টি দেশের প্রায় ৬০০ জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিল। ফুটবল, দৌড়, টেবিল টেনিস, দাবা ও সাঁতার এই পাঁচটি ইভেন্টে খেলা হয় প্রতিযোগিতায়। ভারতের মোট ১৪ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৬-টি পদক পেয়েছেন।

● **ওয়ার্ল্ড হকি লিগের সেমিফাইনালে জয় ভারতের :**

গত ১৮ জুন পাকিস্তানকে ৭-১ গোলে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড হকি লিগের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত (হরমনপ্রীত ২, তলবিন্দর ২, আকাশদীপ ২, পরদীপ ১)। পাকিস্তানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মহম্মদ উমর। বিশ্ব হকি লিগে শুরু থেকেই দুরন্ত ফর্মে ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেও কানাডার বিরুদ্ধে সহজেই জেতেন তারা।

FIH Hockey World League (HWL) হল মহিলা ও পুরুষদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা। আয়োজক International Hockey Federation (FIH)। দু' বছর ধরে চলা এই প্রতিযোগিতাকে হকি বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক্স-এর qualifier হিসেবে গণ্য করা হয়। চলতি মরসুম ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয় সিঙ্গাপুরে। এ বছর ডিসেম্বরে ভুবনেশ্বরে ফাইনাল হবে।

● **আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানের দখলে :**

ভারতকে ১৮০ রানে হারিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে আরও একবার নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিল পাকিস্তান। দীর্ঘ ৮ বছর পর আইসিসি-এর কোনও টুর্নামেন্টে জয়ের ধ্বজা ওড়াল পাকিস্তান। ২০০৯ ওয়ার্ল্ড টি-২০-এর পর ২০১৭ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে নিল সরফরাজ আহমেদ

অ্যান্ড কোম্পানি। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দেখতে গেলে হিসেবটা আরও তাক লাগিয়ে দেবে ক্রিকেট প্রেমীদের। ১৯৯২ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর আইসিসি-এর ৫০ ওভারের ক্রিকেটে এটাই প্রথম ট্রফি পাকিস্তানের। শুধু তাই নয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসেও এটিই প্রথম ট্রফি পাকিস্তানের।

এর আগেও আইইসসি ইভেন্টে ভারত-পাকিস্তান দু' দলই বহুবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। তবে, অধিকাংশ সময়ই ভারতের কাছে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে পাকিস্তানকে। এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে ছ'বার ভারতের মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু ছ'বারের চেষ্টায় একবারও হারাতে পারেনি ভারতকে। এমনকি ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ী ইমরান খানের পাকিস্তানও হারাতে ব্যর্থ হয় ভারতকে। ১৯৯২-এর পর ১৯৯৬-তেও ভারতের কাছে পর্যুদস্ত হয় পাকিস্তান। এর পর আর কখনই ভারতকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান। ১৯৯৯, ২০০৩, ২০১১, ২০১৫ প্রতিটি বিশ্বকাপেই ভারতের মুখোমুখি হলেও হারের মুখ দেখতে হয়েছে প্রতিবেশি এই রাষ্ট্রটিকে। শুধু বিশ্বকাপই নয় টি-২০ বিশ্বকাপেও চারবার পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। ২০০৭ সালে পাকিস্তানকে হারিয়েই প্রথমবারের জন্য টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ধোনির ভারত। এর পর ২০১২ এবং ২০১৪-তেও ভারতের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় পাকিস্তানকে।

বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের কাছে বারবার ঠোক্কর খেতে হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের ফলাফল তুলনামূলক ভালো। আইসিসি-র এই ইভেন্টে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছে এর আগে চারবার। যার মধ্যে ভারত জিতেছে ২-টি এবং পাকিস্তান ২-টি। ২০০৪ সালে ইংল্যান্ডে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০০৯-এ সেঞ্চুরিয়ানে। কিন্তু এর পর থেকে ধীরে ধীরে পরিসংখ্যানে উন্নতি ঘটায় টিম ইন্ডিয়া। ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ডার্ক-ওয়াথ লুইস পদ্ধতিতে পাকিস্তানকে দু' উইকেটে হারিয়ে দেয় ধোনির ভারত। সাম্প্রতিকতম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ৪ জুনের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে পাকিস্তানকে হার স্বীকার করতে হয় ভারতের সামনে।

□ যুবরাজের তিনশোতম এক দিনের ম্যাচ :

তিনশোতম এক দিনের ম্যাচের বিরল মাইলস্টোন ছুঁলেন তিনি। সেই উপলক্ষ্যে যুবরাজ সিংহকে বিশেষ সংবর্ধনা দিল ভারতীয় দল এবং ভারতীয় বোর্ড। সংবর্ধনা দেওয়া হল যুবরাজের প্রথম ক্যাপ্টেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফের কমেন্ট্রি বক্সে ফিরেছেন সৌরভ। যুবরাজের সংবর্ধনার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। বিশেষ স্মারক তুলে দেওয়া হয় যুবরাজের হাতে।

নাইরোবিতে সৌরভের অধিনায়কত্বে এই টুর্নামেন্টেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল যুবরাজের। প্রথমে যা চালু হয়েছিল মিনি বিশ্বকাপ নামে। নাইরোবির সময় নামকরণ করা হয় আইসিসি নক-আউট ট্রফি। সৌরভের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দলের হয়ে দুরন্ত আবির্ভাব ঘটেছিল যুবরাজ ও জাহির খানের। ভারতের মাত্র পাঁচ জন ক্রিকেটার তিনশো ওয়ান ডে খেলেছে। যুবি তার মধ্যে এক জন। অন্য যে চার জন তিনশো এক দিনের ম্যাচের মাইলস্টোন পেরিয়েছেন, তার মধ্যে সৌরভ নিজে রয়েছেন। বাকিরা শচীন তেণ্ডুলকর, মহম্মদ আজহারউদ্দিন এবং রাহুল দ্রাবিড়। তবে যুবরাজের মতো কেউ দীর্ঘ চার বছর বাইরে থাকার পর বিশ্ব মানের টুর্নামেন্টে সুযোগ পাননি। এত দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার পর দলে ফিরে বিশ্ব মানের টুর্নামেন্টে খেলাটা সেরা রূপকথা।

□ বিরাটের দ্রুততম আট হাজার রান :

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে নতুন মাইলস্টোন ভারত অধিনায়কের। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে অপরাজিত ৯৬ রান। তার সঙ্গে করে ফেললেন একদিনের ক্রিকেটে ৮০০০ রান। শুধু তাই নয়। দ্রুততম ৮০০০ রানের নতুন মাইলস্টোন তৈরি করলেন তিনি। এতদিন জায়গাটা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়াসের দখলে। তিনি এই রানে পৌঁছেছিলেন ১৮২-টি ইনিংস খেলে। বিরাট পৌঁছলেন ১৭৫ ইনিংসে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় করেছিলেন ২০০ ইনিংসে। শচীন তেণ্ডুলকর ২১০ ইনিংসে। এই ম্যাচ খেলতে যখন নেমেছিলেন তখন ৮০০০ রানের মাইনস্টোন পেতে বিরাটের দরকার ছিল ৮৮। সাব্বির রহমানের বলে সিঙ্গল নিয়েই লক্ষ্য ছুঁলেন তিনি।

□ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শচীন ও সৌরভের রেকর্ড ভাঙলেন ধবন :

যেদিন যুবরাজ সিংহের ৩০০তম ম্যাচে বিরাট কোহালি দ্রুততম ৮০০০ রানের মালিক হলেন সেদিনই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের রেকর্ড ভাঙলেন শিখর ধবন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রান লেখা হল তার নামের পাশে। করলেন ৬৮০ রান। এর পর ফাইনালে করেন আরও ২১ রান। আগে এই জায়গার দখল ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তার রান ৬৬৫। ধবন ন' ম্যাচে এই রেকর্ড-ভাঙ্গা রান করলেন। দু'টো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তার দখলে রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি। সঙ্গে একাধিক হাফ সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় সৌরভ। তৃতীয় রাহুল দ্রাবির (৬২৭), শচীন তেণ্ডুলকর (৪৪১)। ধবন সৌরভকে ছাপিয়ে গেলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে। এছাড়া তিনি দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান যিনি দু'টো আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৩০০-র উপর রান করলেন। ২০১৩-তে পাঁচ ম্যাচে ৩৬৩ রান করে টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছিলেন। আর এই চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত চার ম্যাচে ধবনের রান ছিল ৩১৭। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ধবনের সর্বোচ্চ রান ১২৫। যেটা তিনি এবার করেছেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে তিনি ভাঙলেন শচীনের অন্য রেকর্ডও। আইসিসি ওয়ান ডে আন্তর্জাতিকে দ্রুততম ১০০০ রানও এল তার ব্যাট থেকে। ১৬ ম্যাচে এই মাইলস্টোন ছুঁলেন তিনি। শচীন তেণ্ডুলকরের ছিল ১৮ ম্যাচে ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল ২০ ম্যাচে।

● ফরাসি ওপেন, ২০১৭ :

নিজের দশম গ্র্যান্ড স্ল্যামটি শেষপর্যন্ত পেয়েই গেলেন রাফায়েল নাদাল। ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারালেন স্টান ওয়ারিঙ্কাকে। খেলার ফল রাফার পক্ষে ৬-২, ৬-৩, ৬-১। রোলাঁ গ্যারোয় এই লড়াই যে রাফার জন্য এত সহজ হয়ে যাবে তা ওয়ারিঙ্কার পুরো টুর্নামেন্টের ফর্ম দেখে বোঝা যায়নি। কিন্তু ম্যাচ শুরু হতেই ক্রমশ রাফা নামের চাপে হারিয়ে যেতে শুরু করেন সেমিফাইনালে অ্যান্ডি মারেকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছন স্টান ওয়ারিঙ্কা। এই নিয়ে ২২-টি স্ল্যাম ফাইনাল খেললেন রাফায়েল নাদাল। ওয়ারিঙ্কার চতুর্থ। রোলাঁ গ্যারোর গত ৪৪ বছরের মধ্যে এই প্রথম পুরুষদের সিঙ্গলসে এমন দুই ফাইনালিস্ট, যাদের বয়স ৩০ বছরের উপরে।

মেয়েদের সিঙ্গলসে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন অবাছাই জেলেনা অস্টাপেঙ্কো। তৃতীয় বাছাই রোমানিয়ার সিমোনা হালেপকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩ হারিয়ে রোলাঁ গ্যারোয় সুজান লেংলেন ট্রফি ঘরে তুললেন। ১১৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও অবাছাই খেলোয়াড় ফরাসি ওপেন জিতলেন। লাতভিয়ার প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে এই নজির গড়লেন ২০ বছরের অস্টাপেঙ্কো। গত জুনে মেগা ফাইনালে ফেভারিট হিসাবেই কোর্টে নেমেছিলেন হেলেপ। কিন্তু, কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে শুরু থেকেই বদ্ধপরিকর ছিলেন এই লাতভিয়ান খেলোয়াড়।

প্রথমবারের জন্য গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন ভারতীয় টেনিস নক্ষত্র রোহন বোপন্না। ফরাসি ওপেনের মিক্সড ডবলসের ফাইনালে কানাডিয়ান তারকা গেব্রিয়েলা ডাবরস্কিকে সঙ্গে নিয়ে রোঁলা গারোয় বোপন্না হারালেন জার্মান-কলম্বিয়ান জুটিকে। অন্না-লিনা-গ্রোনিফিল্ড এবং রবার্ট ফারার মতো বিশ্ব টেনিসের অন্যতম সেরা তারকাদের ৮ জুন রোঁলা গারোয় কার্যত দাঁড়াতেই দেননি রোহনরা। তবে, এই ম্যাচের শুরুতে ছবিটা কিন্তু মোটেও ইন্দো-কানাডিয়ান জুটির পক্ষে ছিল না। ম্যাচের প্রথম সেটেই ২-৬ ব্যবধানে হেরে বসে বোপন্না-গেব্রিয়ালা জুটি। কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত রোহন বোপান্না। উল্লেখ্য, বিগত সাত বছরে এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছন রোহন। কিংবদন্তী লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি এবং সানিয়া মির্জার পর চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন রোহন বোপান্না।

● **ফের ইউরোপ সেরা মেসি :**

আরও একবার সেরার শিরোপা আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা নক্ষত্র লিওনেল মেসির মাথায়। গত ৫ জুন ফুটবল কেরিয়ারে চতুর্থবারের জন্য 'ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু'-এ নিজের নাম লেখালেন আর্জেন্তাইন এই মহাতারকা। এর আগে ২০১০, ২০১২ ও ২০১৩-তে এই অনন্য সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডোকে পিছনে ফেলে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে এই সম্মান আবার ফিরে এল এলএম১০-এর কাছে। মেসি অপ্রতিরোধ্য হলেও কোপা ডেল রে এবং সুপার কোপা ডি এস্পানা ছাড়া আর কোনও ট্রফিই ঢোকেনি ন্যু-ক্যাম্পে। লা-লিগায়ও শেষ করতে হয়েছে রানার্স হয়েই। তবে, দলের এই পারফরম্যান্সের মধ্যেও ধ্রুব তারার মত উজ্জ্বল ছিলেন বিশ্ব ফুটবলের এই 'ওয়ান্ডার ম্যান'। এই মরশুমে লা-লিগায় মেসির গোল সংখ্যা ৩৭। দীর্ঘ তিন বছর পর আবারও ইউএরাপের সেরা হতে পেরে খুশি মেসিও। লিও ছাড়াও গোল্ডেন শুয়ের লড়াইয়ে ছিলেন দোস্ত (৬৮), অউবার্মিয়াং (৬২), লেবানডোস্কি (৬০)।

● **চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল :**

রিয়েল মাদ্রিদ ৪ : য়ুভেন্তাস ১। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো মাদ্রিদের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদকে এনে দিলেন ১২ নম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা দু'বার এই ট্রফি জিতল কোনও ক্লাব। রিয়ালের এই 'ডুয়ো ডেসিমা'-র জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে ডাগআউটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রিয়াল ম্যানেজার জিনেদিন জিদানকেও। এক বছর আগে ক্লাবের দায়িত্ব নেওয়ার পর গত বছরই ক্লাবকে এগানো নম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতান জিদান। গত ৩ জুন কার্ডিফে রিয়ালকে ১২ নম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি এনে দিয়ে নজির গড়লেন টানা দু'বার ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর।

ফাইনালের জন্য য়ুভেন্তাসের ভরসার ছিল বিবিসি। অর্থাৎ বোনুচ্চি-বারজাগলি-কিয়েল্লিনি-র আঁটসাঁট ত্রয়ী। জিদান কাফ মাসলে চোট সারিয়ে সদ্য ফিরে আসা আনফিট বেলের বদলে ইস্কোকেই বেছেছিলেন। প্রথম গোলটা করে রিয়াল। সিআর-সেভেনের বুদ্ধিদীপ্ত ফিনিশিংয়ের সৌজন্যে রিয়াল ১-০-এ এগোয়। কিছুক্ষণ পরেই সমতা ফেরান মান্দজুকিচ। এর পর জিদানের দলের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা কাসোমরো পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে গোলে শট নেন। যা য়ুভেন্তাস ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে ঢুকে যায় তুরিনের দলটির গোলে। মিনিটখানেক পরেই ফের রোনাল্ডো তার দ্বিতীয় গোলটি করেন। ম্যাচের ক্লাইম্যাক্সে আসেনসিওর গোলে স্মরণীয় ৪-১ জয় পেল জিদানের রিয়াল।

● **কোপা দেল রে জয়ের হ্যাটট্রিক বার্সেলোনার :**

আলাভেজ-কে উড়িয়ে দিয়ে ২৯তম কোপা দেল রে জয় বার্সেলোনার। গত ২৭ মে মাদ্রিদের ভিসেন্তে কালদেরন স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই বিপর্যয় নেমে আসে বার্সা শিবিরে। ১১ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে যান হাভিয়ার মাসচেরানো। বার্সা ঘুরে দাঁড়ায় লিওলেন মেসি-র দুরন্ত গোলে। ৩০ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে বিশ্বমানের গোল করেন তিনি। সেই সঙ্গে স্পর্শ করেন তেলমো জারা-র টানা চারটি কোপা দেল রে ফাইনালে গোল করার রেকর্ডও। তিন মিনিটের মধ্যেই অবশ্য আলাভেজের থিও হানান্দেজ গোল করে সমতা ফেরান। বার্সাকে দ্বিতীয়বার ম্যাচে ফেরান নেমার দ্য সিলভা স্যান্টেস জুনিয়র ও পাকো আলকাজার। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করেন তারা। এই নিয়ে তিনটি কোপা দেল রে ফাইনালে গোল করলেন নেইমার। স্পর্শ করলেন কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসের টানা তিনটি কোপা দেল রে ফাইনালে গোল করার নজিরকে। লা লিগায় রানার্স। কোয়ার্টার ফাইনালে য়ুভেন্তাসের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে কোপা দেল রে ফাইনালই ছিল এই মরশুমে বার্সার সামনে ট্রফি জয়ের শেষ সুযোগ।

● **টানা ছ'বার লিগ চ্যাম্পিয়ন য়ুভেন্তাস :**

ইতালিয়ান সেরি আ-তে য়ুভেন্তাসের ডাবল হ্যাটট্রিক। ক্রোটোনে-কে ৩-০-এ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন য়ুভেন্তাস। বর্তমানের য়ুভেন্তাস হয়ে উঠেছে ইউরোপের সেরা দলগুলোর অন্যতম। যারা এ বছর ইতালীয় ত্রিমুকুট জেতার আশায় রয়েছে। কোপা ইতালিয়া জেতার কয়েক দিনের মধ্যে লিগ খেতাবও ঢুকে গেল য়ুভেন্তাসের ক্যাবিনেটে। হিসেবটা খুব সহজ ছিল। গত ২১ মে ক্রোতোন-কে হারাতে পারলেই লিগ চ্যাম্পিয়ন হতো য়ুভেন্তাস। হল ঠিক তাই। ক্রোতোন-কে হারিয়ে শেষ ম্যাচের আগেই সেরি আ জেতার ডাবল হ্যাটট্রিক করল মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রির দল। দুর্দান্ত আক্রমণাত্মক পারফরম্যান্সের সৌজন্য টানা ছ'বার সেরি আ চ্যাম্পিয়ন য়ুভেন্তাস।

● **ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের উন্নতি :**

ভালো সময় অব্যাহত ভারতীয় ফুটবল দলের। কিছু দিন আগেই ফিফার প্রকাশিত ক্রমতালিকায় সেরা ১০০-এর মধ্যে জায়গা করে নেয় ইন্ডিয়ান টিম। পাশাপাশি সদ্য প্রকাশিত এএফসি মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন র‍্যাঙ্কিংয়েও চার ধাপ উঠে এল ভারতীয় ফুটবল দল। গত ৫ জুন প্রকাশিত এই তালিকা অনুযায়ী ভারতের স্থান ১৫। ২৭.০৮৩ পয়েন্ট

নিয়ে এই স্থানে আছে ভারত। ২৭.৭৯০ পয়েন্ট নিয়ে ভারতের আগে সিরিয়া। এএফসি-র এই র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রত্যাশিতভাবেই শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে আরব আমিরশাহী। তাদের পয়েন্ট ৯৫.৪২৮। এছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে আছে কোরিয়া রিপাবলিক, কাতার এবং চিন। ৭৮.০১৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ষষ্ঠ স্থানে জায়গা পেয়েছে জাপান। জাপানের ঠিক আগেই ৮০.৪৮৪ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে সৌদি আরব।

● **তাইল্যান্ড গ্রঁ প্রি চ্যাম্পিয়ন প্রণীত :**

তাইল্যান্ডে কেরিয়ারের প্রথম গ্রঁ প্রি খেতাব মুঠোর পুরলেন বি সাই প্রণীত। সেমিফাইনালে সাইনা নেহওয়াল ছিটকে যাওয়ায় ভারতীয় সমর্থকদের যাবতীয় আশা টিকে ছিল প্রণীতের উপরে। টুর্নামেন্টের চতুর্থ বাছাই ইন্দোনেশিয়ার জোনাতান ক্রিস্টিকে ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১৯ হারান বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ নম্বরে থাকা ভারতীয় তারকা। ইন্দোনেশিয়ার এই খেলোয়াড়ের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ২৭। এক ঘণ্টা এগারো মিনিটের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত খেতাব নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে ছ' সপ্তাহের মধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জিতলেন তিনি। পুল্লেলা গোপীচন্দ অ্যাকাডেমির ছাত্রের দুরন্ত প্রতিভা থাকলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেন না আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে এটা বলাবলি হ'ত। দৃশ্যটা পাল্টে যায় গত বছর জুলাইয়ে প্রণীতের কানাডা ওপেন জেতার পরে। এপ্রিলে সিঙ্গাপুর ওপেন খেতাব জেতার আগে জানুয়ারিতে সৈয়দ মোদী গ্রঁ প্রি-তেও ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু চূড়ান্ত যুদ্ধে হেরে যান সমীর বর্মার কাছে।

● **ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়, এবার মাঠে নামবে উইন্ডিজ দল :**

এবার থেকে ক্রিকেট সার্কিটে আর পাওয়া যাবে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামে কোনও দলকে। গত ৩১ মে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের তরফ থেকে চিফ এগ্‌জিকিউটিভ জনি গ্রোভ সরকারিভাবে এ কথা জানিয়ে দেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়, এবার থেকে উইন্ডিজ নামের ছাতার তলায় দেখা যাবে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের। শুধু দলের নামই নয়, ইতোমধ্যে বোর্ডেরও নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ৯১ বছর পর বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে তা হল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নতুন ওয়েবসাইটের ফলে স্পনসরদের সঙ্গে এবং শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করতে আরও সুবিধা হবে বলেন ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রেসিডেন্ট ডেভ ক্যামেরন। এখন দেখার, দলের ও বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে পুরনো গরিমা ফিরিয়ে আনতে পারে কি না তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

● **এএফসি কাপের নকআউট পর্ব :**

প্রত্যাশা মতোই এএফসি কাপের নকআউট পর্বে গেল গতবারের রার্নাস বেঙ্গালুরু এফসি। ঘরের মাঠ কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীর গোলে মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশনকে; অন্যদিকে, বৃষ্টিবিঘ্নিত ঢাকায় মরসুমের শেষ ম্যাচে আবাহনীর সঙ্গে ১-১-এ ড্র করে মরসুম শেষ করল মোহনবাগান। এক গোলে পিছিয়ে থেকে ম্যাচের শেষ লগ্নে পেনাল্টি করে সঞ্জয় সেনের দলের হয়ে সমতা ফেরান ইউসা কাতসুমি। টানা তিন বছর এএফসি কাপের নক আউটে যেতে গেলে এ দিন মাজিয়াকে হারাতেই হ'ত বেঙ্গালুরুর। ফেডারেশন কাপে পেশির চোটে না খেলতেও পারলেও গত ৩০ মে বেঙ্গালুরুর স্প্যানিশ কোচ আলবের্তো রোকা আভাস দিয়েছিলেন চোট সারিয়ে এএফসি কাপে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের জন্য তৈরি তার অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফ্রি-কিক থেকে বেঙ্গালুরুকে জয়ের গোল উপহার দেন ছেত্রীই। এই জয়ের ফলে বেঙ্গালুরু এবং মাজিয়া দু' দলেরই পয়েন্ট দাঁড়ায় ১২। কিন্তু মাজিয়ার বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে দু' পর্বে জেতার সুবাদেই নকআউটে চলে গেল বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-আবাহনী ম্যাচ ড্রয়ের ফলে 'ই' গ্রুপে তৃতীয় হয়ে শেষ করল মোহনবাগান। আবাহনী চতুর্থ।

● **আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে ভারত :**

গত মে মাসের শেষে আইসিসি-র প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (ওডিআই) বিশ্বের সেরা দশ ব্যাটসম্যানের মধ্যে ভারত থেকে একমাত্র জায়গা পেলেন বিরাট কোহালি। ৮৫২ পয়েন্ট পেয়ে তিন নম্বর স্থান ধরে রাখলেন ভারত অধিনায়ক। ৮৭৪ পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন এবি ডেভিলিয়াস। দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ান ডেভিড ওয়ার্নার (৮৭১)। ভারতের মতো পাকিস্তানেরও একমাত্র বাবর আজম (৭৬২) ছাড়া আর কারও জায়গা হয়নি সেরা দশে। তবে সেরা পনেরোয় জায়গা করে নিয়েছেন রোহিত শর্মা (১২), এমএস ধোনি (১৩) এবং শিখর ধবন (১৫)। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭২৪ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে আছেন কার্গিসো রাবাডা। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে রাবাডার ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন আর এক দক্ষিণ আফ্রিকান ইমরানে তাহির (৭২২)। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচের স্টার্ক (৭০১)। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সব থেকে ভালো জায়গায় আছেন অক্ষর পটেল। ১১ নম্বর স্থানে আছেন এই অফস্পিনার। পটেলের ঠিক দু' ধাপ নিচে অমিত মিশ্রা। ৫৭৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৮তম স্থানে আছেন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সেরা কুড়ির মধ্যে জায়গা হয়নি রবীন্দ্র জাদেজা, উমেশ যাদব, মহম্মদ সামি এবং ভুবনেশ্বর কুমারের। অন্যদিকে, টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে স্বস্তিতে নেই ভারত। একদিনের ক্রিকেটে সেরা দলের শিরোপা পেয়েছেন সাউথ আফ্রিকা (৫৭১১), দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া (৫৪৪২) এবং ভারত (৩৬৩২)।

● **টি-২০-তে ডিআরএস-এর পক্ষে আইসিসি ক্রিকেট কমিটি :**

গত ২৫ মে আইসিসি ক্রিকেট কমিটির মিটিংয়ের মূল বিষয় ছিল ডিআরএস পদ্ধতি। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ অনিল কুম্বলে। কমিটি দাবি জানায় আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচেও আনা হোক ডিআরএস পদ্ধতি। এলবিডব্লিউ আউট নিয়েও যাতে প্লেয়াররা রিভিউ নিতে পারে তারও দাবি পেশ করা হয়। ছিল ক্রিকেটকে অলিম্পিক্সের মতো বড়ো ইভেন্টে রাখার দাবিও। আইসিসি-র নতুন আইন নিয়েও কথা হয় মিটিংয়ে। ব্যাটের ডাইমেনশন বেঁধে দিতে চায় আইসিসি। আইসিসি যদি সব দাবি মেনে নেয় ও তা কার্যকরী করে তা হলে পয়লা অক্টোবর থেকে দ্রুততা প্রযোজ্য হবে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন রাহুল দ্রাবিড়, আদ্রিয়ান গ্রিফিথস, মাহেলা জয়বর্ধনে, ডেভিড কেনডিক্স, রিচার্ড কেটেলবোরো, ড্যারেন লেম্যান, রঞ্জন মাদুগালে, টিম মে, কেভিন ও'ব্রায়ান, শন পোলোক, জন স্টিফেনসন, অ্যান্ড্রু স্ট্রস, ডেভিড হোয়াইট।

● **বিশ্ব ক্রিকেটে সেরার শিরোপা অশ্বিনের :**

চলতি বছরে সেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারতীয় অফ-স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। 'সিয়েট ক্রিকেট রেটিংয়ের'-রে পক্ষ থেকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে অশ্বিনকে। চলতি বছরের প্রতি বিভাগে সফল ক্রিকেটারদের সম্মানিত করা হয়। সেখানেই ভারতের অন্যতম সফল এই স্পিনারের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কর এবং পুণে সুপারজায়েন্টের কর্ণধার হর্ষ গোয়েঙ্কা। প্রসঙ্গত, চলতি মরসুমে অশ্বিনের ভেলকির উপর নির্ভর করেই কার্যত দেশের মাটিতে ২০১৬-'১৭ মরসুমে একের পর এক জয় তুলে আনে ভারত। বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৩-টি টেস্ট খেলে ভারত জেতে ১০-টিতে। বিগত ১২ মাসে অশ্বিনের সংগ্রহ ৯৯-টি উইকেট। অন্যদিকে অশ্বিন ছাড়াও সম্মানিত করা হয় অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলের সদস্য শুভমান গিলকে। ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য গিলকে সম্মানিত করে সিয়েট।

● **১৩ মাসের মধ্যে ১৫-টি আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলবে ভারত :**

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএই)-এর তরফে ২৩ মে সূচি প্রকাশ করে জানানো হয় আগামী ১৩ মাসে ১৫-টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। এর মধ্যে ৮-টি ম্যাচ হবে ভারতে। গত ৬ জুন আন্ধেরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নেপালের বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি দিয়ে এই ফিক্সচারের খেলা শুরু করবে ভারত। এর ঠিক ৭ দিন পরেই এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে কিরঘিজস্তানের মুখোমুখি হয় সুনীল ছেত্রীর দল। এর পর ২০১৭-এ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের আসরে অংশ নেবে স্টিফেন কন্সাটটাইনের ছেলেরা। চ্যাম্পিয়ন্স কাপের পর আবারও এএফসি এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে অংশ নেবেন রবীন সিংহ-জেজে লালপেখলুহারা। আগামী ১০ অক্টোবর ম্যাকাও এবং ১৪ নভেম্বর মায়ানমারের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় দল। অ্যাওয়ে ফিক্সচারে এএফসি এশিয়ানের যোগ্যতা নির্ণয়ে শেষ ম্যাচটি ভারত খেলবে কিরঘিজস্তানের বিপক্ষে। কোয়ালিফায়ারের পাশাপাশি ৪ অক্টোবর, ৮ নভেম্বর ও ২২ মার্চ তিনটি ফ্রেন্ডলিতেও অংশ নেবেন সুনীল ছেত্রীরা।

● **ফোর্বসের দামি অ্যাথলিট তালিকা :**

বার্ষিক ৯৩ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে ফোর্বসের পক্ষ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত সেরা ১০০ দামি অ্যাথিলিটের তালিকার ১ নম্বরে রয়েছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো। টানা দু' বছর প্রথম স্থান ধরে রাখলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। গত ১২ মাসে তিনি আয় করেছেন ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার। ৮ লক্ষ মার্কিন ডলার উপার্জন করে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন লিওনেল মেসি। বার্সেলোনা তারকার মোট আয় ৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার। চতুর্থ স্থান পেয়েছেন সুইস টেনিস তারকা রজার ফেডেরার। ২০১৬ সালে তার বার্ষিক আয় বলছে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার।

বিশ্বের মোট ২১-টি দেশের ১১-টি ক্রীড়ার তারকাদের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে জায়গা পেয়েছেন বিরাট কোহলি। এক বছরে ২ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করে বিরাট রয়েছেন ৮৯তম স্থানে। এর মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ মার্কিন ডলার এসেছে পারিশ্রমিক ও জয়ের পুরস্কার হিসেবে। বাকি ১৯ লক্ষ মার্কিন ডলার আয়ের উৎস বিভিন্ন এনডসমেন্ট।

□ **সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের তালিকায় একমাত্র মহিলা সেরেনা :**

২০১৬ সালের ফোর্বসের ওয়ার্ল্ড'স ১০০ হাইয়েস্ট পেড অ্যাথলিটদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, ১০০ জনের সেই তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র একজন মহিলার। তিনি সেরেনা উইলিয়ামস। গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা ২৩। সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা, কিংবদন্তীর সম্মান পাওয়ার পরও বার্ষিক আয়ের নিরিখে প্রথম ৫০ জনের মধ্যে জায়গা পাননি সেরেনা। মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে অন্যান্য বছরগুলোয় সেরেনার উপরেই থাকেন মারিয়া শারাপোভা। ডোপিং-এর অপরাধে ১৫ মাস নিষিদ্ধ থাকার কারণে এ বছর ১০০ জনের তালিকা থেকে ছিটকে গিয়েছেন শারাপোভা। ২০১৬ সালের ২ কোটি ৭০ লক্ষ মার্কিন ডলার উপার্জন করে তালিকার ৫১তম স্থানে রয়েছেন সেরেনা।

● **তিরন্দাজির বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে সোনা ভারতের :**

বিশ্বের সেরা টিম যুক্তরাষ্ট্রকে সেমিফাইনালে হারানোর পর চিনের সাংহাইতে তিরন্দাজির বিশ্বকাপে সোনা জিতেছে ভারতীয় দল। গত ২০ মে তীরন্দাজি বিশ্বকাপের স্টেজ ওয়ানের ফাইনালে কলম্বিয়াকে পরাজিত করে সোনা জেতে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন অভিষেক বর্মা, চিন্না রাজু শ্রীথর এবং পাঞ্জাবের অমরজিৎ সিংহ। অমরজিতের এটা প্রথম বিশ্বকাপ। রিও অলিম্পিক্সে ব্যর্থ হয়েছিলেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। তিন পুরুষ তিরন্দাজের বিশ্ব মঞ্চে সেরা হওয়াটা তাই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অলিম্পিক্সে তিরন্দাজির কম্পাউন্ড ইভেন্ট নেই। তবে এশিয়াড, কমনওয়েলথ-সহ অন্য সব বড়ো টুর্নামেন্টে আছে। সেখানেও অভিষেকরা পদক পেয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকাপে সেটা অধরা ছিল। প্রসঙ্গত, সব মিলিয়ে ফাইনালের আগে চারটি রাউন্ডে (leg) বিশ্বকাপ হয় তিরন্দাজির। চিনে ১৬-২১ মে প্রথম পর্বের পর ৬-১১ জুন তুরস্ক ও ২০-২৫ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত পর্বগুলিতে সাফল্য আসেনি ভারতের ঝুলিতে। পরবর্তী তথা সর্বশেষ পর্ব ৮-১৩ আগস্ট জার্মানির বার্লিনে। আর ফাইনাল হবে রোমে (২-৩ সেপ্টেম্বর)।

● **ইন্দোনেশিয়া ওপেন জয় শ্রীকান্তের :**

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস রচনা করলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। স্ট্রেট সেটে হারালেন কাজুমাসা সাকাইকে। গত ১৮ জুন ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার সিরিজের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন এই ভারতীয় বিশ্বের এক নম্বর ওয়ান-হোকে হারিয়ে। প্রত্যাশা টিকিয়ে রেখে ভারতের এই ব্যাডমিন্টন তারকা ফাইনালে সরাসরি সেটে ওড়ান প্রতিপক্ষকে। মাত্র ৩৭ মিনিট সময়ব্রনেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত কেরিয়ারের তৃতীয় সুপার সিরিজ খেতাব জিততে। ফাইনালে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২২ নম্বরে থাকা শ্রীকান্তের চ্যালেঞ্জ ছিল বিশ্বের ৪৭ নম্বর কাজুমাসা সাকাইয়ের বিরুদ্ধে। স্ট্রেট গেমে ম্যাচ জিতে নেন শ্রীকান্ত ২১-১১, ২১-১৯। সোনার পদকের সঙ্গে পেলেন ৭৫ হাজার ডলারও। ইন্দোনেশিয়া ওপেন জিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন।

● **শুটিং বিশ্বকাপে সোনা হিনা-জিতু জুটির :**

ভারতের হয়ে সোনা জিতলেন হিনা-জিতু জুটি। আইএসএসএফ (ইন্টারন্যাশনাল শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশন) বিশ্বকাপে ১০ মিটার

এয়ার পিস্তলের মিক্সড ডবলসে ভারতের হয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন জিতু রাই ও হিনা সিধু। গত ১২ জুন আজারবাইজানের গাবালায় বিশ্বকাপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ডবলসের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও রাশিয়া। রাশিয়াকে ৭-৬ ব্যবধানে হারিয়ে দেশকে বহু কাঙ্ক্ষিত সোনা এনে দেন তারা। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে এই বছরের শুরুতে হওয়া আইএসএসএফ-এর টুর্নামেন্টেও সোনা জিতেছিল এই জুটি।

● **বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়াম তৈরি :**

কাতার বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও বাকি প্রায় ২০০০ দিন। এদিকে ২০১৮-র রাশিয়া বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালের মাঠ সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে তুলল কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। খালিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামকে বিশ্বকাপের জন্য সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। এটিই বিশ্বের সম্পূর্ণভাবে শীত নিয়ন্ত্রিত প্রথম ফুটবল স্টেডিয়াম।

১৯৭৬ সালে কাতার সরকার ও কাতার ফুটবল অ্যাসোশিয়েসানের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় এই স্টেডিয়ামটি। ২০২২ বিশ্বকাপের শুধু ফাইনালই নয়, ৪০ হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালেরও বেশকিছু ম্যাচ খেলা হবে। নতুন প্রযুক্তি আমদানি করে এই স্টেডিয়ামটিকে সাজাতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে কাতার। গত ফেব্রুয়ারিতেই কাতারের অর্থমন্ত্রী আলি সারেফ আল ইমাদি জানিয়েছিলেন স্টেডিয়ামকে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে হচ্ছে তাদের।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরল আমেরিকা :**

বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন)-এর মাত্র তিন দিন আগে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে পুরোপুরি সরে এল আমেরিকা। গত ২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি বয়কট করার কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি, এর দায়ভার চাপিয়ে দেন ভারত ও চিনের কাঁধে। জলবায়ু চুক্তিতে পুরো ফায়দাই লুটে নিচ্ছে এই দু'টি দেশ, এমনই দাবি ট্রাম্প প্রশাসনের। চুক্তি অনুযায়ী শরিক দেশগুলির যে ব্যয়ভার বহণ করার কথা, ভারত বা চিনের মতো দেশগুলো তা করছে না বলে অভিযোগ ট্রাম্পের। সঙ্গে যোগ করেন, চুক্তি থেকে যদি মার্কিন অর্থনীতির উন্নতি হয় এবং দেশে কর্মসংস্থান তৈরি হয়, তবেই আমেরিকা এই আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলতে পারে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে ১৯৫-টি দেশ ১৩ দিন ধরে আলোচনা করে একটি খসড়া তৈরি করে। খসড়ার মূল কথা ছিল, চলতি শতকের শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা যেন প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি কোনও ভাবেই না বাড়ে, সেটা নিশ্চিত করা। তবে লক্ষ্য থাকবে তা দেড় ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখা। উষ্ণায়ন থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে এটাই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক খসড়া, যাতে সায় দিয়েছিল আমেরিকা, ভারত, চিন-সহ জি-৭৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা। যার প্রভাব পড়ছে জলবায়ুতে। মেরু অঞ্চলে দ্রুত হারে গলছে হিমবাহ স্তর। সমুদ্রপৃষ্ঠে জল স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্র লাগোয়া দেশ ও শহরগুলি। এই চুক্তির মূল লক্ষ্যই ছিল বিশ্বের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। প্যারিস চুক্তি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই কোনও দেশের। পৃথিবীর ভবিষ্যতের স্বার্থে, বা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে, দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই এই চুক্তিতে একমত হয় এতগুলি দেশ।

এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যে বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে তার বিবরণ দেওয়া হয় ওই চুক্তিতে। প্রথমেই রয়েছে শিল্প নিগমণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাহলেই বাতাস কমবে গ্রিন হাউস গ্যাস— কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ও জলীয় বাষ্প। এই গ্যাসগুলিই প্রধানত বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য দায়ি। পাশাপাশি কয়লার বদলে শক্তির বিকল্প উৎসের কথাও ভাবা হয়েছে। চুক্তির মূল শর্তই হল জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং গ্রিন হাউস গ্যাস ও কার্বনের নিগর্মণের হার কমানো। বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য মূলত দায়ি উন্নত দেশগুলি। কিন্তু এর প্রভাব অনেক বেশি পড়ে গরিব ও অনুন্নত দেশগুলির মানুষের উপর। তাই চুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, আমেরিকার মত ধনী দেশ গরিব দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য দেবে। ২০২০-র মধ্য আমেরিকার এই সাহায্য বা অনুদান দেওয়ার কথা ৩০০ কোটি ডলারের। যার মধ্যে ওবামা জমানায় ১০০ কোটি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও, ২০০৫-এ গ্রিন হাউস গ্যাস নিগর্মণের যা মাত্রা ছিল, ২০২৫-এর মধ্যে তা ২৬-২৮ শতাংশ কমানোর কথা আমেরিকার। ট্রাম্পের প্রবল আপত্তি এই জোড়া শর্ত নিয়েই।

● **পরিবেশের স্বার্থে রেলের পদক্ষেপ :**

গাছ লাগিয়ে, জল বাঁচিয়ে, ট্রেনে বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করে পরিবেশ বাঁচানোর কাজে এগিয়ে আসছে ভারতীয় রেল। এবার পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্বন নির্গমণ কমানোর প্রকল্প হাতে নিল তারা। শুধু জ্বালানির ব্যবহারে তারতম্য ঘটিয়েই কয়েক বছরে ৩৩ শতাংশ কার্বন নির্গমণ কমানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য আনা হচ্ছে পরিচ্ছন্ন ডিজেল। বাড়ানো হচ্ছে সৌর বিদ্যুৎ এবং বায়ো ডিজেলের ব্যবহারও। ট্রেনের ব্রেকিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটিয়েও কমানো হচ্ছে কার্বন নির্গমণ। অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে দু'টি সৌর বিদুৎকেন্দ্র তৈরি করছে রেল। স্টেশন এবং রেল ওয়ার্কশপের ছাদে বসানো সৌর প্যানেলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ মূল গ্রিডে পাঠানো হচ্ছে। জলের পুনর্ব্যবহারও শুরু করেছে রেল। রেলের জমিতে যেসব জলা রয়েছে তা বাঁচাতে নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে। বহু স্টেশনে জলশোধন প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে। দূষণ কমাতে ট্রেনের কামরায় প্রায় দেড় লক্ষ বায়ো টয়লেট বসানো হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষে আরও এক লক্ষ বায়ো টয়লেট বসানো হবে। পরিবেশ বাঁচাতে এ বছর দেড় কোটি চারা লাগানো হয়েছে রেলের জমিতে। পরিবেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে রেলের বর্জ্য থেকে বিদুৎ তৈরিরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেভাবে কাজ চলছে, তাতে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ১০ বছরে রেলের দূষণ প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যাবে বলে আশা রেলকর্তাদের।

● **রাস্তা পোক্ত করতে এবার পাটতন্তু :**

পিচ, পাথরকুচি তো থাকছেই। এবার পাটও বড়ো ভূমিকা নেবে রাস্তা তৈরিতে। তাতে একসঙ্গে দু'টি কাজ হবে। প্রথমত, পাটতন্তু

ব্যবহার করলে রাস্তা হবে পোক্ত আর টেঁকসই। দ্বিতীয়ত, এতে পাটচাষিরা ন্যায্য দাম পাবেন। এতে পশ্চিমবঙ্গের মতো পাট উৎপাদক রাজ্যই আখেরে লাভবান হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে অবশেষে রাস্তা তৈরিতে পাট ব্যবহারে সম্প্রতি সম্মতি দিয়েছে রাস্তা তৈরির প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস। ফলে প্রতিটি রাজ্যেই প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মতো প্রকল্পে রাস্তা তৈরির সময়ে পাটের ব্যবহার বাড়বে। গত ১২ জুন কলকাতায় 'টেক্সটাইল ইন্ডিয়া-২০১৭' নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুব্রত গুপ্ত একথা জানান। এত দিন কয়েকটি রাজ্য রাস্তা তৈরিতে পাটের বিশেষ তন্তু ব্যবহার করত। কিন্তু ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসের সম্মতি না থাকায় বিষয়টি থমকেই ছিল। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় এ পর্যন্ত সারা দেশে ৬৫-টি রাস্তায় পাটতন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও পাট ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার রাস্তায়। বস্ত্র মন্ত্রকের কর্তাদের দাবি, রাস্তা তৈরির একটি বিশেষ পর্বে পাটতন্তু ব্যবহার করলে রাস্তা পোক্ত হয়, টেঁকেও দীর্ঘদিন।

● **কৃত্রিম উপায়ে ময়ালের ৫৪-টি বাচ্চা আলিপুরে :**

চিড়িয়াখানার কাঠের বাক্সে এখন কিলবিল করছে চুয়ান্নটি ময়ালের বাচ্চা। এর মধ্যে কুড়িটি বিশ্বের সব থেকে লম্বা সাপ বলে চিহ্নিত 'রেটিকুলেটেড পাইথন'-এর। বাকি ৩৪-টি 'বার্মিজ পাইথন'। ডিম পাড়ার পরে মায়েরা ফিরে তাকায়নি। সেই 'অনাথ' ডিম থেকেই কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চার জন্ম দিয়েছেন আলিপুর চিড়িয়াখানার কর্মীরা। চিড়িয়াখানার আলিপুরে এই প্রথম রেটিকুলেটেড ও বার্মিজ পাইথনের প্রজনন হল। গত বছর 'ইন্ডিয়ান রক পাইথন'-এর ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দেওয়া হয়েছিল। চিড়িয়াখানা সূত্রের খবর, ভারতীয় বন্যপ্রাণ আইনের প্রথম তপসিলে থাকা তিনটি প্রজাতির ময়ালের (রেটিকুলেটেড, বার্মিজ এবং রক) ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা জন্ম দেওয়া আলিপুরের মুকুটে নতুন পালক যেমন জুড়ল, তেমনই চিড়িয়াখানার 'সম্পদ' হিসেবেও কাজে লাগতে পারে এরা। স্টেট জ্যু অথরিটির সদস্য-সচিব বিনোদকুমার যাদব জানান, এই সাপগুলিকে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে। বিনিময়ে সেখান থেকে কোনও প্রাণী আলিপুরে নিয়ে আসা হতে পারে। এই দফায় চিড়িয়াখনায় জন্মেছে দুই প্রজাতির গোসাপের (ইয়েলো মনিটর লিজার্ড এবং ওয়াটার মনিটর লিজার্ড) বাচ্চাও। গোসাপের ক্ষেত্রেও আলিপুরে এই প্রথম প্রজনন ঘটল। মার্চের শেষে রেটিকুলেটেড পাইথন ডিম পেয়েছিল। কিন্তু মা ময়ালটি সেভাবে তা দিচ্ছিল না। তাই ২ এপ্রিল ডিমগুলি সংগ্রহ করা হয়। কৃত্রিমভাবে ডিম ফোটানোর জন্য সরীসৃপ-বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ চৌধুরী এবং তিন জন প্রাণীবিজ্ঞানী নিয়ে দল গঠন করা হয়। দলে রাখা হয়েছিল সাপের ঘরের তিন কিপারকেও। এপ্রিলের গোড়ায় বামিজ পাইথন ডিম পাড়লে সেগুলিও সরিয়ে আনা হয়। এর পরে ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সেগুলি রাখা হয়েছিল। ৩১ মে প্রথম বামিজ পাইথনের ডিম ফুটে বাচ্চা জন্মায়। ৩ জুন রেটিকুলেটেড পাইথনের প্রথম ডিম ফোটে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

● **সর্বোচ্চ ফরাসি সম্মান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে :**

তিরিশ বছর পর ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লেজিয়ঁ দ' নর'-এ ভূষিত বাঙালি। ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরঁ কলকাতায় এসে সত্যজিৎ রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই সম্মান। সেই 'লেজিয়ঁ দ' নর' এবার পেতে চলেছেন সত্যজিতের প্রিয় নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এর আগে ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রকের 'অফিসিয়ে দে' জার এ মেত্রিয়ে' শিরোপায় সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। এবার ১৮০২ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিন বোনাপার্টের চালু করা সম্মানও তার হাতে এল। এই পুরস্কার এর আগেও রবিশঙ্কর, মৃণাল সেন প্রমুখ বাঙালিকে বিভিন্ন স্তরে ছুঁয়ে গিয়েছে। আমাদের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের মতো এই ফরাসি সম্মানও নাইট, অফিসার, কম্যান্ডার, গ্র্যান্ড ক্রস ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সত্যজিতের অপু আগেই অফিসার হিসেবে সম্মানিত ছিলেন, এবার কম্যান্ডার! এটিই ফ্রান্সে কোনও শিল্পীর জন্য সর্বোচ্চ সম্মান। সৌমিত্রই প্রথম ভারতীয় অভিনেতা, যিনি ভূষিত হলেন সর্বোচ্চ ফরাসি শিল্পী-সম্মানে।

● **দঙ্গল ও বাহুবলী ২-র আন্তর্জাতিক সাফল্য :**

ভারতে বক্স অফিসে তুমুল সাফল্য পেয়েছিল আমির খানের 'দঙ্গল'। চিনেও এক হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করে ফেলেছে ছবিটি। এবার নতুন একটি মাইলস্টোন। ফোর্বসের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইংরেজি ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সিনেমায় আয়ের নিরিখে 'দঙ্গল' রয়েছে পঞ্চম স্থানে। এই তালিকার প্রথমে রয়েছে ২০১৬-এ মুক্তিপ্রাপ্ত চিনা ছবি 'দ্য মারমেড'। যার আয় ছিল ৫৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে ২০১২-এ মুক্তি পাওয়া ফরাসি ছবি 'দ্য ইনটাচেবেলস'। ৪২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ২০১৫-এ মুক্তি পেয়েছিল চিনা ছবি 'মনস্টার হান্ট'। ৩৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আয় করে এই তালিকায় ছবিটি রয়েছে তৃতীয় স্থানে। জাপানি ছবি 'ইয়োর নেম' আয় করেছিল ৩৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। ২০১৬-এ মুক্তি পাওয়া ছবিটি রয়েছে তালিকার চতুর্থ স্থানে। এখনও পর্যন্ত ৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা আয় করে 'দঙ্গল' তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

এদিকে ভারতের বক্স অফিসে এত দিনের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ১৮০০ কোটির ব্যবসা করেছে এস. এস. রাজামৌলির 'বাহুবলী ২ : দ্য কনক্লুশন'। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের ড্রাগনের দেশে এক সঙ্গে ৪০০০-টি স্ক্রিনে মুক্তি পেতে চলেছে 'বাহুবলী ২ : দ্য কনক্লুশন'। এখনও পর্যন্ত বিশ্বে বাহুবলী ২-র গ্রস রোজগার ৩০০০ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সারা বিশ্বকে যেভাবে মাতিয়ে রেখেছে বাহুবলী, তাতে চিনেও তার ব্যতিক্রম হবে না। চিনের পাশাপাশি এই বছরের শেষের দিকে জাপান, কোরিয়া ও তাইওয়ানেও মুক্তি পাওয়ার কথা এই ছবির।

● **মুক্তির আগেই বাহুবলীর রেকর্ড ভাঙল রজনীকান্তের ২.০ :**

একের পর এক রেকর্ড ভেঙে ভারতীয় ছবির জগতে ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছে রাজামৌলির 'বাহুবলী ২ : দ্য কনক্লুশন'। এমনকী দেশের বাইরেও বিদেশি ছবিগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাল ব্যবসা করে গিয়েছে এই ছবি। কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই বাহুবলীর একটি রেকর্ড ভেঙে দিল রজনীকান্ত-অক্ষয় কুমারের '২.০'। সারা দেশে ১৫-টি ভাষায় ৭ হাজার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে রজনীকান্তের '২.০'। যেখানে 'বাহুবলী ২' মুক্তি পেয়েছিল ৬,৫০০-টি প্রেক্ষাগৃহে। রজনীকান্তের এই ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে সবে, তারই আগে নয়া রেকর্ড। '২.০' ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে আগামী বছরের ২৫

জানুয়ারি। বাজেট ৪৫০ কোটি টাকা। রজনীকান্তের সঙ্গে এতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমারও খলনায়কের ভূমিকায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **হাজার দিন পার করল মঙ্গলযান :**

আয়ু ধরা হয়েছিল ছ' মাস। কিন্তু লাল গ্রহের পরিক্রমায় ১৯ জুন হাজার দিন পারকরে ফেলল ভারতের মঙ্গলযান বা Mars Orbiter Mission (MOM)। এখনও কাজ করে চলেছে। মঙ্গলকে এ পর্যন্ত ৩৮৮ বার পরিক্রমা করেছে যানটি। তাতে পৃথিবীর হিসেবে হাজার দিন লাগলেও মঙ্গলের হিসেবে অবশ্য সময়টা ৯৭৩.২৪ দিন। পিএসএলভি রকেটে চেপে শ্রীহরিকোটা থেকে মঙ্গলযানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৩-র ৫ নভেম্বর। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে মঙ্গলের দিকে রওনা দেয় ১ ডিসেম্বর। ৯ মাসের যাত্রা শেষে ২০১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এটিকে প্রতিবেশী গ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা খরচ করে প্রথম চেষ্টাতেই সফলভাবে মঙ্গলে যান পাঠিয়ে গোটা বিশ্বের নজর কাড়ে ভারত। সে সময় ইসরো জানিয়েছিল, ছ' মাস ধরে মঙ্গলের আকাশে পাক খাবে, ছবি তুলে পাঠাবে তা। ২০১৫-এর মার্চে ইসরো জানায় এখনও যথেষ্ট জ্বালানি রয়েছে, বাড়তি ছ' মাস কাজ করতে পারবে। তিন মাস পরে আবার ইসরোর চেয়ারম্যান এ. এস. কিরণ কুমার ঘোষণা করেন, কয়েক বছর চলার মতো জ্বালানি রয়েছে মঙ্গলযানের। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পৌনে তিন বছর পরেও ঠিকঠাক তথ্য ও ছবি পাঠিয়ে যাচ্ছে এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ৫-টি যন্ত্র ও ক্যামেরা। রঙিন ছবি তোলার এই ক্যামেরাটি এখনও পর্যন্ত ৭১৫-টি ছবি পাঠিয়েছে। পৃথিবীতে সেগুলি বিশ্লেষণের কাজ চলছে।

তবে ব্যাঘাত যে একেবারে ঘটেনি তা অবশ্য নয়। ২০১৫-র ২ জুন থেকে ২ জুলাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝে সূর্য চলে আসায়। এর পরে ২০১৬-র ১৮ থেকে ৩০ মে যানটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়নি তীব্র সৌর বিকিরণের কারণে। সেবার পৃথিবী ছিল সূর্য ও মঙ্গলের মাঝখানে। গ্রহণের সময় যানটি যাতে দীর্ঘক্ষণ আড়ালে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে, তার জন্য এর কক্ষপথে সামান্য বদলও ঘটানো হয় এর পরে।

● **ভারতের সবচেয়ে ভারী ও শক্তিশালী রকেট :**

মহাকাশে পাড়ি দিল ভারতের সবচেয়ে ভারী ও শক্তিশালী রকেট। জিএফএলভি-মার্ক-৩ রকেট। মাথায় চাপিয়ে নিয়ে গেল ৩,১৩৬ কিলোগ্রাম ওজনের জিস্যাট-১৯ উপগ্রহকে। এই শক্তিশালী রকেট জিএফএলভি-মার্ক-৩ রকেটে চাপিয়েই আগামী দিনে ভারতীয় মহাকাশচারী পাঠাবে ইসরো। গত ৫ জুন বিকেল ৫টা ২৮ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে এই দানবীয় রকেট পাড়ি জমাল মহাকাশে। মিশন রেডিনেস রিভিউ কমিটি এবং লঞ্চ অথরাইজেশন বোর্ডের থেকে সবুজ সঙ্কেত দিলেই তা উৎক্ষেপণ করা হয়। ২,৩০০ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাতে হলে এতদিন ইসরোকে বিদেশি স্যাটেলাইট কেরিয়ার বা রকেটের সাহায্য নিতে হ'ত। জিএসএলভি মার্ক-৩ লো আর্থ অরবিটে ১০,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত এবং জিওসিক্রোনমাস ট্রান্সফার অরবিটে (জিটিও) ৪,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনের স্যাটেলাইট বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। পরে এই রকেটে করেই মহাকাশচারীদের পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, এই জিস্যাট-১৯ স্যাটেলাইট জিওস্টেশনারি রেডিয়েসন স্পেক্ট্রোমিটার রয়েছে যা স্যাটেলাইট ও তার ইলেক্ট্রনিক উপাদানের উপরে স্পেস রেডিয়েশনের প্রভাব এবং চার্জড পার্টিকেলের গতিবিধির উপরে নজর রাখবে। জিস্যাট-১৯ স্যাটেলাইটের শক্তির উৎস লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি। যা সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি।

● **আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে সংশয় কাটালো অ্যাস্ট্রোস্যাট :**

ইসরোর পাঠানো উপগ্রহ 'অ্যাস্ট্রোস্যাট' জানিয়ে দিল, মহাকাশে শক্তিশালী আলোর ঝলসানিটা আদতে গামা রে' বাস্ট (জিআরবি) এবং আলোর ওই ঝলসানির পেছনে রয়েছে কোনও মহাজাগতিক ঘটনার জের। 'অ্যাস্ট্রোস্যাট'-এর যাবতীয় সায়েন্স অপারেশনের প্রধান পুণের 'আয়ুকা'-র জ্যোতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, লাইগোর দু'টি ডিটেক্টরের পাওয়া তথ্যের সঙ্গে 'অ্যাস্ট্রোস্যাট'-এর পাওয়া সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি দেওয়া-নেওয়া করার জন্য একটি 'মউ' রয়েছে। তবে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭, এই সময়ে আইনস্টাইনকে তিন তিনবার পরীক্ষায় পাস করালো যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, তা একই সঙ্গে যেমন ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ জানার জন্য আমাদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন একটা জানলা খুলে দিল, তেমনই তুলে দিল কিছু প্রশ্নও।

এতদিন আলোকতরঙ্গকে (দৃশ্যমান, অতিবেগুনি ও ইনফ্রারেড, এদেরই মধ্যে পড়ে এক্স-রে ও গামা রে) 'হাতিয়ার' করেই ব্রহ্মাণ্ডের অজানা, অচেনা বস্তু খুঁজে বেড়াতাম আমরা। কোন উৎস থেকে সেই আলো বেরিয়ে আসছে, তারই পথ ধরে খুঁজে নিতাম তা ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক কতটা দূরত্বে ঘটছে, ব্যাং-এর ঠিক কত দিন পর সেই সব ঘটনা ঘটেছিল ব্রহ্মাণ্ডে। কিন্তু ব্ল্যাক হোল বা নিউট্রন নক্ষত্রের মতো মহাজাগতিক বস্তুগুলি কবে, কখন তৈরি হয়েছে, কত কোটি বছর আগে তাদের শরীর কীভাবে গড়ে উঠেছিল, তার কিছুই আমরা খুব সঠিকভাবে বলতে পারতাম না। কারণ, অসম্ভব জোরালো অভিকর্ষ বলের জন্য ব্ল্যাক হোল থেকে তেমনভাবে কোনও আলোই বেরিয়ে আসে না। যেটুকু আলো বেরিয়ে আসে, তা আসে ব্ল্যাক হোলের অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে। তারই সূত্র ধরে মেলে ব্ল্যাক হোলের হদিশ।

● **যক্ষ্মার বিরুদ্ধে হলুদকণা হাতিয়ার, বিজ্ঞানীদের দাবি :**

ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার বিরুদ্ধে এবার লড়াইয়ে নামলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। তবে নতুন কোনও অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে নয়, যক্ষ্মার জীবাণু মারতে বিজ্ঞানীরা বেছে নিয়েছেন ভারতীয় হেঁশেলের অতি পরিচিত উপাদান হলুদকে। হলুদে থাকা কারকুমিনের অতি সূক্ষ্ম কণা ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা আক্রান্ত ইঁদুরের শরীরে ঢুকিয়ে বিজ্ঞানীরা সাফল্য পেয়েছেন বলে ফ্রন্টিয়ার্স জার্নালে প্রকাশের জন্য গৃহীত একটি গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের দাবি, কারকুমিনের সূক্ষ্ম কণা এক দিকে যেমন যক্ষ্মার জীবাণুকে পুরোপুরি কাবু করে ফেলে, তেমনই ভবিষ্যতে তা যাতে আর আক্রমণ করতে না পারে, শরীরের মধ্যে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতাও তৈরি করে। পাশাপাশি, যক্ষ্মায় বিভিন্ন কোষে যে প্রদাহ (ফুলে গিয়ে জ্বালা) তৈরি হয়, কারকুমিন তা

প্রতিহতও করে। ওই গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন পাঁচটি গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে চারটি এ দেশের (নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশ্যাল সেন্টার ফর মলিকিউলার মেডিসিন এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, ওডিশার কেআইআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বায়োটেকনোলজি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ)। পঞ্চমটি আমেরিকার ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজি-মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। তারা এই গবেষণায় প্রযুক্তিগত সাহায্য করেছে। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা মারাত্মকভাবে ছড়াচ্ছে। যেসব যক্ষ্মা রোগী ওষুধ খেতে খেতে মাঝপথে ছেড়ে দেন, মূলত তাদের শরীরেই এই যক্ষ্মা বাসা বাঁধে। ২০১৫ সালের হিসেব অনুযায়ী, ভারতবর্ষে ২২ লক্ষ যক্ষ্মা রোগীর মধ্যে ৭ লক্ষই ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মায় ভুগছেন। একদিকে যেমন নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রেখে জীবাণুরাও নিজেদের চরিত্র বদলাচ্ছে। ফলে নতুন ওষুধ কাজ করছে না। এখন যক্ষ্মা নিরাময়ে যে ওষুধটি ব্যবহার করা হয় তার বিষক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, যক্ষ্মা নিরাময়ে এখন যে সর্বোচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে সেগুলির যেমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, তেমনই তা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও নষ্ট করে দেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীরে ফের যক্ষ্মা সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। তখন তার শরীরে প্রচলিত ওষুধ কাজ করে না। অর্থাৎ, যক্ষ্মার জীবাণু ওষুধ প্রতিরোধী ক্ষমতা পেয়ে যায়। কারকুমিনের কণা মানুষের শরীরের ভিতরে তিনভাবে কাজ করে। তারা লিভারের বিষক্রিয়া এবং ক্ষয় রোধ করে, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে পরবর্তী সংক্রমণ আটকে দেয়, শরীরের মধ্যে ঢোকা যক্ষ্মার জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। মানুষের উপরে পরীক্ষার পরেই ওই কারকুমিন থেকে যক্ষ্মার ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

প্রয়াণ

● **পি. এন. ভগবতী :**

মৌলিক অধিকারের বিষয়ে আদালতে যেতে হলে আবেদনকারীকে বাদী বা বিবাদী পক্ষ হতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই বলে মনে করতেন। সেই ধারণা থেকেই জনস্বার্থ মামলার প্রবর্তন করেন। এ দেশে জনস্বার্থ মামলার প্রবক্তা, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি প্রফুল্লচন্দ্র নটবরলাল (পি. এন.) ভগবতী প্রয়াত হয়েছেন। গত ১৫ জুন দিল্লির বাড়িতে মারা যান বিচারপতি ভগবতী। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। ১৯৮৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৯৭৩ সালে গুজরাত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব ছেড়ে সুপ্রিম কোর্টে যোগ দেন তিনি। জনস্বার্থ মামলার প্রবর্তন ছাড়াও তার বিভিন্ন রায়ে বিচারপতি ভগবতী বন্দিদের মৌলিক অধিকার রক্ষার বিষয়টিও স্পষ্ট করেছিলেন। মানবাধিকার রক্ষার জন্য সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন বিচারপতি ভগবতী। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের জন্যও প্রচুর কাজ করেছেন। বিচারপতিদের নীতি-আদর্শ কী হবে, সেই বিষয়েও বিচারপতি ভগবতীর কাজ অমর হয়ে থাকবে। ৩২-টি দেশের বিচারপতিদের নিয়ে যে, 'ব্যাঙ্গালোর প্রিন্সিপল্‌স' তৈরি হয়েছিল, তাতে বিচারপতি পি. এন. ভাগবতীর বিশেষ অবদান ছিল।

● **স্বামী আত্মস্থানন্দ :**

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চদশ অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দের দেহাবসান হয়েছে। গত ১৮ জুন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। পরের দিন বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে তার অন্তিম সংস্কার হয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। মাদার টেরিজার পরে এই প্রথম কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্তিম সংস্কার হয়েছে। তার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই মৃত্যু তার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষতি। জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় তিনি স্বামী আত্মস্থানন্দের সঙ্গে কাটিয়েছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। ১৯১৯-এর ২১ মে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের সাবাজপুরে জন্ম সত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের। কলেজ-জীবনে তিনি যুক্ত হন দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে। পরে বেলুড় মঠে যোগদান। ১৯৪৯-এর ১ মার্চ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজির কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে সত্যকৃষ্ণই হন স্বামী আত্মস্থানন্দ। ২০০৭ সালে মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন তিনি।

● **রজার মুর :**

প্রয়াত হয়েছেন জেমস বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির শৃঙ্গে পৌঁছনো ব্রিটিশ অভিনেতা স্যার রজার মুর। গত ২৩ মে ৮৯ বছর বয়সে সুইজারল্যান্ডে জীবনাবসান হয়েছে তার। রজারের পরিবারের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। জন্ম ১৯২৭ সালের ১৪ অক্টোবর লন্ডনে। বাবা জর্জ অ্যালফ্রেড মুর ছিলেন পুলিসে। মা লিলিয়ান পোপ (যার জন্ম হয়েছিল কলকাতায়)। তাদের একমাত্র সন্তান রজার মডেল হিসেবে কেরিয়ার শুরু করলেও পরে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। টিভি সিরিজে তার কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে। যেমন, The Persuaders!-এ লর্ড ব্রেট সিন্‌ক্লেয়ার এবং The Saint-এ সাইমন টেমপ্লারের চরিত্র। ১৯৭৩ সালে Live and Let Die দিয়ে জেমস বন্ড হিসেবে তার যাত্রা শুরু। তারপর—The Man with the Golden Gun (১৯৭৪), The Spy Who Loved Me (১৯৭৭), Moonraker (১৯৭৯), For Your Eyes Only (১৯৮১), Octopussy (১৯৮৩) ও A View to a Kill (১৯৮৫)। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৫-র মধ্যে মোট সাতটি ছবিতে 007-এর চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। রজার মুর ছাড়া এ পর্যন্ত শুধু শন কনারিকে এতবার বন্ডের চরিত্রে বড়ো পর্দায় দেখা গেছে। তবে একটানা ১২ বছর এই চরিত্রে অভিনয় করার রেকর্ড একমাত্র মুরেরই। বয়সের নিরিখেও রেকর্ড গড়েছেন তিনি—বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করা প্রবীণতম অভিনেতা। প্রথম 007 ছবি Live and Let Die করেন ৪৫ বছর বয়সে আর ১৯৮৫ সালের ৩ ডিসেম্বর অবসরকালে তার বয়স ছিল ৫৮। তাকে UNICEF Goodwill Ambassador নিযুক্ত করা হয় ১৯৯১-এ। সমাজসেবার জন্য ২০০৩ সালে নাইট উপাধি পান তিনি। ছোটো ও বড়ো পর্দায় তার অবদানের জন্য ২০০৭ সালে তিনি Hollywood Walk of Fame-এ একটা star পান। ২০০৮ সালে ফ্রান্স সরকার তাকে Ordre des Arts et des Lettres-এর এক Commander হিসেবে নিযুক্ত করে।

● **মাথুন্নি ম্যাথিউজ :**

চলে গেলেন মাথুন্নি ম্যাথিউজ, বাস্তবের 'এয়ারলিফ্ট'-এর আসল নায়ক। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গত ২১ মে, কুয়েতে তার মৃত্যু হয়। আগস্ট, ১৯৯০-এ কুয়েতে হামলা চালায় ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের সেনা। হামলা চালানোর কিছুদিন আগেই কুয়েতকে ইরাকের উনিশতম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন সাদ্দাম। বিশ্বের আর পাঁচটা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কুয়েতের। যুদ্ধ বিধ্বস্ত কুয়েতে আটকে পড়েন প্রায় ১,৭০,০০০ ভারতীয়। ১৯৯০-এর ১৩ আগস্ট থেকে ১১ অক্টোবর অবধি ইরাক ও কুয়েতের বিভিন্ন অংশ থেকে নিরাপদে স্থানান্তর করা হয় প্রায় দেড় লক্ষ ভারতীয়কে। কোনও অসামরিক বিমান পরিষেবার মাধ্যমে এত বড়ো স্থানান্তর পর্বের নজির আর নেই। আর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন মাথুন্নি ম্যাথিউজ। ১৯৫৬ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কর্মসূত্রে কুয়েতে গিয়েছিলেন মাথুন্নি। চরম বিপদের সময় তিনিই হয়ে উঠেছিলেন কুয়েতে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রধান মুখ। উল্লেখ্য, ১৯৯০-এর সেই ঐতিহাসিক 'লার্জেস্ট সিভিলিয়ান ইভ্যাকুয়েশন' নিয়েই তৈরি হয় বলিউডের বিখ্যাত ছবি 'এয়ারলিফ্ট'। যে ছবিতে মাথুন্নি ম্যাথিউজের ভূমিকায় দেখা যায় অক্ষয় কুমারকে। বলিউডি ফিল্মের দৌলতে সে সময়ের সেই ঘটনাটি আম দেশবাসীর স্মরণে এলেও বরাবরই প্রচারের আড়ালেই থেকে গিয়েছিলেন মাথুন্নি।

● **এস. এস. খাপলাং :**

নাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধানপুরুষ এস. এস. খাপলাং ১০ জুন মায়ানমারের টাগায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে মায়ানমারের পাংসাউ পাসের কাছে ওয়াকথাম গ্রামে তার জন্ম। তাই তাকে মায়ানমারের নাগা হিসেবে মানতো সে দেশের সরকার। সেই সুবাদে এনএসসিএন খাপলাং বাহিনী সে দেশে নিরাপদ আশ্রয় ও স্বশাসিত এলাকার সুবিধে পেয়েছে। ২০১৫ সালে তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি ভঙ্গ করেন। খাপলাং বর্তমানে উত্তর-পূর্বের জঙ্গি সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ ইউএনএলএফডব্লু-র প্রধান ছিলেন। ১৯৬৪ সালে 'নাগা ডিফেন্স ফোর্স' তৈরি করেন খাপলাং। পরে হন 'ইস্টার্ন নাগা রেভেলিউশনারি কাউন্সিল'-এর সভাপতি। নাগা আন্দোলনের জনক এ. জেড. ফিজোর অধীনে 'এনএনসি'-তে যোগ দেন খাপলাং। তিনি, ইসাক চিসি সু ও থুইংলেন মুইভা পরে প্রশিক্ষণ নিতে চিনে যান। কিন্তু ১৯৭৫ সালে এনএনসি ভারত সরকারের সঙ্গে শিলং চুক্তি করলে সেই চুক্তির প্রতিবাদে সু, খাপলাং ও মুইভা দলত্যাগ করে ১৯৮০ সালে 'এনএসসিএন' গড়েন। ১৯৮৮ সালের এপ্রিলে খাপলাং পন্থী ও মুইভা পন্থীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের পরে এনএসসিএন দু'ভাগ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে নিজের গড়া দল থেকেই খাপলাংকে 'বহিষ্কার' করে দেন তার দুই অনুগামী খুলে কন্যাক ও কিতোভি জিমোমি। তখন থেকেই পুরোদস্তুর মায়ানমারের টাগায় শিবির করেন খাপলাং। ওই শিবিরেই আশ্রয় নেন আলফা স্বাধীন নেতা পরেশ বরুয়া। পরে কেএলও, এনডিএফবি-রও প্রধান ঘাঁটি হয় টাগা। জন্মস্থান মায়ানমারের ওয়াংখাম গ্রামে খাপলাংয়ের শেষকৃত্য হয়।

উল্লেখ্য, খাপলাংয়ের মায়ানমারে জন্মের সূত্রে মায়ানমার সরকার তার সংগঠনকে আশ্রয় দিলেও তিনি মারা যাওয়ার পরে সে দেশের সেনা ভারতীয় জঙ্গিদের উৎখাত করতে পারে। কারণ খাপলাং না থাকলে 'তাতমাদাও' বা বর্মি সেনার সঙ্গে তার চুক্তিও থাকছে না।

● **সুব্রত রায়চৌধুরী :**

গত ২২ মে ৭৫ বছর বয়সে বার্লিনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যর মধ্যে সঠিক মেলবন্ধন ঘটানো শিল্পী-দার্শনিক। শুধুমাত্র বিখ্যাত সেতারবাদক বা সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে নয়, শিল্পের জগতে দু'টি দুনিয়াকে মেলানোর জন্য ভক্তরা মনে রাখবেন সুব্রত রায়চৌধুরীকে। জন্ম ১৯৪২-র ২৯ জানুয়ারি, কলকাতায়। ১৪ বছর বয়সে গুরু শ্রী নির্মল চক্রবর্তীর কাছে সেতারে হাতেখড়ি। মিশনারি স্কুলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুব্রতর সঙ্গীতশিক্ষা চলেছিল প্রাচীন বৈদিক ধারায়। প্রাচ্য দর্শনচিন্তার সঙ্গে স্বাভাবিক পাশ্চাত্য যুক্তিবোধ মিলিত হয়ে তার সঙ্গীত এক অনন্য মাত্রা পায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মেলানো এই বিশ্বদর্শনই ছিল তার সঙ্গীতের মূল ধারা।

ছয়ের দশকের শুরুতে কলকাতায় প্রথমবার শ্রোতাদের সামনে সেতার ধরেন সুব্রতবাবু। সাতের দশকে শুরু হয় বিদেশে সঙ্গীত সফর। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি দেশের রেডিও স্টেশনগুলিতে বেজে ওঠে তার সেতার। বেশকিছু জ্যাজ অনুষ্ঠানেও সুব্রতবাবু নিমন্ত্রিত হন। বাজিয়েছেন সোপরানো স্যাক্সোফোনিস্ট স্টিভ লেসির সঙ্গে। তার অ্যালবাম 'এক্সপ্লোরেশন' ফিউশন সঙ্গীতে খুবই জনপ্রিয়। জার্মানিতে রবিশঙ্করের পরে প্রথম সেতারবাদক হিসেবে তার অনুষ্ঠান ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীদের জন্য পথ খুলে দেয়। ইন্ডিয়া আর্কাইভ মিউজিক থেকে তার অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বসঙ্গীত বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতীয়। ভারত ছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে সেতারবাদন পরিবেশন করেছেন সুব্রতবাবু। বক্তৃতা দিয়েছেন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতা, বার্লিন ও নিউ ইয়র্কের স্টুডিয়োতে কাজ করেছেন প্রচুর শিক্ষার্থীকে নিয়ে। প্রকাশিত হয়েছে তার বই 'দ্য সাউন্ড অব সিতার'।

বিবিধ

- দু'টি ডানার মধ্যে দৈর্ঘ্য ৩৮৫ ফুট। যা ছাড়িয়ে যাবে একটি ফুটবল মাঠকেও। পেটের মধ্যে রয়েছে দু'টি ককপিট। দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন পাশাপাশি রাখা দু'টো বিমানকে যোগ করা হয়েছে একটি ডানার মধ্যে। স্ট্র্যাটোলঞ্চ। এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বিমান। মাইক্রোসফ্টের কো-ফাউন্ডার পল অ্যালেনের 'অ্যানেল'স এরোস্পেস ফার্ম'-এর হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করল স্ট্র্যাটোলঞ্চ।
- রাকেশ শর্মা, কল্পনা চাওলা ও সুনীতা উইলিয়ামসের পর আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে মহাকাশচারী হিসেবে বেছে নিল নাসা। ৩৯ বছর বয়সী রাজা চারি। তার বাবা ভারতীয়। রাজা মার্কিন বিমানবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে কর্মরত। নাসার মহাকাশচারী হওয়ার জন্য প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল, তার মধ্যে থেকে রাজাকে বেছে নিয়েছে নাসা। আমেরিকার ন্যাভাল টেস্ট পাইলট স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তর পাস করেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে।
- চলন্ত ট্রেন হোক বা রেললাইন। রেলের যে কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে সেলফি তুললে এবার থেকে শুধু জরিমানা নয়, যেতে হতে

পারে জেলেও। সেলফি জ্বরে আক্রান্ত দেশজুড়ে একের পর এক দুর্ঘটনা রুখতে এবার এমনই কড়া নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে শ্রীলঙ্কার রেলমন্ত্রক। সেলফি দুর্ঘটনা ঠেকাতে তৈরি হয়েছে বিশেষ টিমও। পরিসংখ্যান বলছে, শুধুমাত্র চলতি বছরেই রেল লাইনে সেলফি তুলতে গিয়ে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সংখ্যাটা সব থেকে বেশি কলম্বোয়।

● **বিমান দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু নেতাজির, জানাল কেন্দ্র :**

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে এবার সরাসরি মুখ খুলল কেন্দ্রীয় সরকার। তথ্যের অধিকার আইনে একটি প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ১৯৪৫ সালে ১৮ আগস্ট তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্য হয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতার বাসিন্দা সায়ক সেনের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানায়, শাহনওয়াজ কমিটি, বিচারপতি জি. ডি. খোসলা কমিশন ও বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্টগুলি বিবেচনার পরে সরকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, ১৯৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল। আরও জানানো হয়েছে, গুমনামি বাবা যে আদৌ নেতাজি নন— মুখোপাধ্যায় কমিশনই সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।

● **অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়াবে :**

ইতিহাসের পাঠ্যক্রম বদলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের অন্যতম প্রচীন এবং ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তিন বছরের স্নাতক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের এখন এমন একটি পেপারে পরীক্ষা দিতে হবে যাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস, গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে থাকবে ষাটের দশকে মার্টিন লুথার কিংয়ের সিভিল রাইটস মুভমেন্টের ইতিহাসও। আগামী সেমেস্টারেই (অটাম সেমেস্টার) শুরু হতে চলেছে এই নতুন পাঠ্যক্রম। কয়েক বছর ধরেই 'হোয়াই ইজ মাই কারিকুলাম হোয়াইট' নামে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে অক্সফোর্ড-সহ ব্রিটেনের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অক্সফোর্ডেরই ওরিয়েল কলেজ কর্তৃপক্ষ একবার সেসিল রোডসের একটি মূর্তি সরাতে অস্বীকার করে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা আর সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক রোডসের মূর্তি কেন সরানো হবে না, সে নিয়ে আন্দোলন শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। পড়ুয়াদের একাংশ প্রশ্ন তোলে, 'হোয়াই ইজ মাই কারিকুলাম হোয়াইট'। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে শুধুই কেন ঔপনিবেশিক আর সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস পড়ানো হয়? 'রোডস মাস্ট ফল' নামে প্রতিবাদ কর্মসূচিও গড়ে তোলে তারা। সেই আন্দোলনের প্রভাবেই অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বদল বলে মনে করা হচ্ছে।

● **দৌড় শুরু তেজসের :**

ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস থেকে গোয়ার কারমালি, দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার যাত্রাপথে গত ২২ মে বিকেল ৩.২৫ মিনিটে সিএসটি থেকে রওনা দিল তেজস। প্রায় ন' ঘণ্টার যাত্রায় মাত্র পাঁচটি স্টেশনে হল্ট করবে ট্রেনটি। ভারতীয় রেলের সুপার ফেসিলিটি এই ট্রেনটির প্রত্যেকটি কোচ অত্যাধুনিক জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরি। এক একটি কোচ তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৩.২৫ কোটি টাকা। এলইডি স্ক্রিন, কফি মেশিন ও ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা, ধোঁয়া শনাক্তকারী যন্ত্র। ট্রেনের সব দরজাই স্বয়ংক্রিয়। তবে, প্রায় ৯ ঘণ্টার তেজস সফরে যে ভাড়া যাত্রীদের গুনতে হবে, তা শতাব্দীর প্রাথমিক ভাড়া থেকে ২০ শতাংশ বেশি। ১৩-টি কামরাবিশিষ্ট ট্রেনটিতে রয়েছে একটি এগজিকিউটিভ কোচ। এগজিকিউটিভ ক্লাসে খাবার ছাড়া ভাড়া হল ২৫৪০ টাকা এবং তা নিয়ে ভাড়া দাঁড়াবে ২৯৪০ টাকা। চেয়ার কারে খাবার নিয়ে ভাড়া ১৮৫০ টাকা এবং খাবার ছাড়া ১২২০ টাকা। ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগে চলা তেজসকে বিমানের সঙ্গে তুলনা করছেন অনেকেই। নাম দিয়েছেন, "এয়ারোপ্লেন অন ট্র্যাক"।

● **বিশ্বের অন্যতম বড়ো রেট্রো ফিটমেন্ট প্রজেক্ট ভারতীয় রেলের :**

রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ট্যুইট করে জানান, রেলের ৪০ হাজার পুরোনো কোচ ফের নতুন করে সাজানো হচ্ছে। অ্যান্টি গ্রাফিতি রং, ভেনেটিয়ান ব্লাইন্ডস, এলইডি লাইট, ধোঁয়া সনাক্তকরণ যন্ত্র-সহ একাধিক অত্যাধুনিক জিনিস লাগিয়ে নতুন রূপ দেওয়া হবে পরিত্যক্ত কোচগুলিকে। এই প্রজেক্টের নাম দেওয়া হয়েছে, 'মিশন রেট্রো-ফিটমেন্ট'। ১৩ জুন এই প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৪০ হাজার পুরোনো কোচ এই প্রজেক্টের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এর মধ্যে ৬ হাজার ৭০০ কোচ সাজানোর জন্য নতুন করে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই ভোপালের রেল ওয়ার্কশপে ৫৭-টি কোচ নতুন করে সাজিয়ে বারাণসী-নিউদিল্লি মহামান্য এক্সপ্রেসে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। রেলের এই প্রজেক্টে খরচ হবে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। ২০২২-'২৩ সালের মধ্যে 'মিশন রেট্রো-ফিটমেন্ট' প্রজেক্ট শেষ করা হবে।

● **কেরলে মেট্রোর উদ্বোধন :**

১৯৮৪-তে কলকাতা দিয়ে শুরু। ৩৩ বছরে মেট্রো রেল এখন দেশের ৮-টি শহরে ছড়িয়েছে। কোচিতে যাত্রা শুরু করল দেশের অষ্টম মেট্রো। গত ১৭ জুন সকাল সাড়ে ১০-টা নাগাদ কোচির পালারিভাট্টম স্টেশনে উদ্বোধনের পর মেট্রোয় সওয়ার হন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন কেরলের রাজ্যপাল পি. সদাশিবম, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নায়ডু। কোচি মেট্রো একটি যৌথ প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকার এই মেট্রো প্রকল্পের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা অনুদান দেয়। পাশাপাশি এতে সমান অর্থ দিয়েছে রাজ্যও। সরকার ও এক জার্মান সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সম্পূর্ণ পিপিপি মডেলে এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আলুভা থেকে পলারিভাট্টম পর্যন্ত মোট ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেট্রো যাত্রায় রয়েছে ২২-টি স্টেশন। এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ৪ বছর ১০ দিনে। যা একটি জাতীয় রেকর্ড। আরও কয়েকটি দিক থেকে অভিনব, কোচি মেট্রোর সৌজন্যেই দেশের মধ্যে প্রথম 'ওয়াটার মেট্রো' চালু হল। গত বছর কোচিতে ওয়াটার প্রকল্প চালু হয়েছিল। এবার সেই জলপথ পরিষেবার মেট্রো প্রকল্প দশটি দ্বীপকে জুড়ল। এই মেট্রো চলাচলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার হবে, তার ২৫ শতাংশ সৌর বিদ্যুৎ। এছাড়াও কোচি মেট্রোতে কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ২৫ জন রূপান্তরকামী। এর আগে দেশের কোনও মেট্রোতে কর্মী হিসাবে রূপান্তরকামীদের নিয়োগ করা হয়নি। পাশাপাশি ১ হাজার মহিলা কর্মী নিয়োগ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

WBCS-এ অ্যাকাডেমিকের আবার দুর্দান্ত রেজাল্ট

WBCS-2015 : A, B, C এবং D গ্রুপে মোট সফল ১২০ জনেরও অধিক

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ

-SOUVIK GHOSH
EXE. (Rank-1), WBCS - 2015

ACADEMIC's hand of co-operation helped me to achieve the ultimate goal.

This long journey was quite difficult without the help of Academic Association which is the pioneer Institution for many WBCS aspirants like me. Their valuable study materials, Mock Interview classes, guidance and hand of Co-operation helped me to overcome the hurdles & to achieve the ultimate goal.

-Moumita Sengupta
CTO (Rank-1), WBCS - 2015

WBCS 2018 নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। ক্লাস নেবেন WBCS অফিসাররা।

প্রস্তুতির জন্য সামিম স্যারের সম্পাদিত 'WBCS SCANNER' বইটি দেখে অনুশীলন করেছিলাম

ইন্টারভিউ-এসফল হওয়ার জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর মক ইন্টারভিউ এবং গ্রুমিং ক্লাস অত্যন্ত ফলদায়ক। এখানে অভিজ্ঞ টিচার দ্বারা যে ভাবে ইন্টারভিউ ক্লাস নেওয়া হয় তা এককথায় অনবদ্য। আমার মতো ইন্টারভিউ এর সম্পর্কে যারা ভীত তাদের কাছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল আদর্শ স্থান। সামিম স্যারের বিশেষ ট্রেনিং-এ আমার এই সাফল্য।

-Habibur Rahaman, Excise Service, (Gr-A) WBCS - 2015

প্রকাশিত হল

WBCS SCANNER Third Edition

'এখন আরোও বেশী তথ্য, আরোও বেশি পৃষ্ঠা, আরোও বেশি কমন'

বইটিতে থাকবে — ●১৯ বছরের প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান
●২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ মেন প্রশ্নপত্রের সমাধান

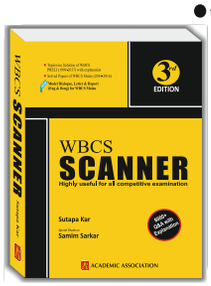

নতুন সংযোজন

বাংলা এবং ইংরেজী (কম্পালসারি) বিষয়ের নমুনা ডায়লগ, পত্রলিখন, রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন

প্রাপ্তিস্থান ঃ স্টল নং - ১০ (১৪এ সূর্যসেন স্ট্রীটের বিপরীতে), কলেজ স্ট্রীট

ফোন - 7031842001 / 9038786000

MOCK TEST FOR PRELIM-2018

● ১৫টি মকটেস্ট ● ৫০টি ক্লাসটেস্ট ● কোয়েশ্চন ব্যাঙ্ক
● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্

মকটেস্ট শুরু ২৭ শে আগষ্ট, ২০১৭ থেকে

Contact : 8599955633 / 9038786000

DATE OF VSTS	VST	TIME	MARKS
27.08.17	VST - 1	2 PM - 4PM	200
10.09.17	VST - 2	2 PM - 4PM	200
24.09.17	VST - 3	2 PM - 4PM	200
08.10.17	VST - 4	2 PM - 4PM	200
22.10.17	VST - 5	2 PM - 4PM	200
05.11.17	VST - 6	2 PM - 4PM	200
12.11.17	VST - 7	2 PM - 4PM	200
19.11.17	VST - 8	2 PM - 4PM	200
26.11.17	VST - 9	2 PM - 4PM	200
03.12.17	VST - 10	2 PM - 4PM	200
10.12.17	VST - 11	2 PM - 4PM	200
17.12.17	VST - 12	2 PM - 4PM	200
24.12.17	VST - 13	2 PM - 4PM	200
31.12.17	VST - 14	2 PM - 4PM	200
07.01.18	VST - 15	2 PM - 4PM	200

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in ✹ Barasat-9073587432 ✹ Uluberia-9051392240
✹ Siliguri-9474764635 ✹ Birati-9674447451 ✹ Darjeeling-9832041123

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

July, 2017
R.N.I. No. 19740/69

**"Give a book instead of bouquet....
Such a move can make a big difference"**

– Hon'ble Prime Minister

Publications Division has rich repository of a range of books
from Art & Culture, Freedom Struggle, History, Biographies and Gandhian Literature
...to Children's Books

Gift our books
To your dear ones....
because

"There is no **friend** as loyal as a **book**"

Publications Division
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

For purchase of books, find details at **publicationsdivision.nic.in**
To buy eBooks visit **kobo.com, play.google.com, amazon.in**

More than 200 eBooks of Publications Division

Now available online

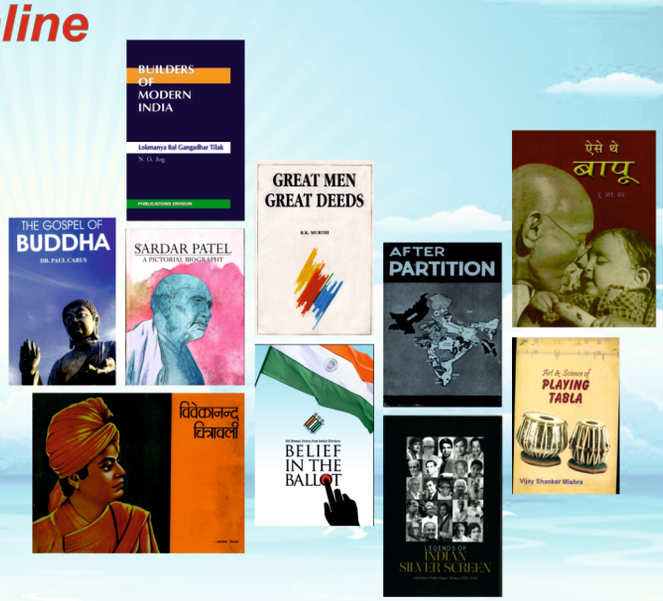

Purchase at :
play.google.com
kobo.com
amazon.in
with cross platform compatibility in
Android, iOS, Kindle, Kobo etc

Publications Division
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

For complete list of eBooks please visit: **publicationsdivision.nic.in**

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।